আচার্য্যের উপদেশ।

নববিধানাচার্য্য

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন।

ষষ্ঠ খণ্ড।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।

ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটী।

৭৮নং অপার সারকিউলার রোড।

১৮৩৯ শক—১৯১৮ খৃষ্টাব্দ।

[মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

আচার্য্যের উপদেশ।

নববিধানাচার্য্য

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন।

ষষ্ঠ খণ্ড।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।

ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটী।

৭৮নং অপার সার্‌কিউলার রোড।

১৮৩৯ শক—১৯১৮ খৃষ্টাব্দ।

 [মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

ভূমিকা।

আচার্য্যের উপদেশ ষষ্ঠ খণ্ড নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহাতে একান্নটী উপদেশ সন্নিবিষ্ট হইল। পূর্ব্বে পুস্তকাকারে প্রকাশিত আচার্য্যের উপদেশ তৃতীয় খণ্ড, চতুর্থ খণ্ড, পঞ্চম খণ্ড এবং সপ্তম খণ্ডে যে সমুদয় উপদেশ বিক্ষিপ্ত ভাবে এখানে সেখানে ছিল, সেই সমুদয় ধারাবাহিক তারিখ অনুযায়ী এক স্থানে পরে পরে প্রকাশিত হইল। ষ্টারমার্কযুক্ত উপদেশগুলি নূতন—অপ্রকাশিত। পূর্ব্বে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। প্রত্যেক উপদেশে ইংরাজী ও বাঙ্গালা তারিখ দেওয়া হইয়াছে, এবং পাঠের সুবিধার জন্য প্যারা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বে যে পাঁচ খণ্ড আচার্য্যের উপদেশ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও উল্লিখিত পরিবর্ত্তন সমূহ হইয়াছে। ১৬১ পৃষ্ঠায় "ব্রহ্মস্পর্শ" শীর্ষক উপদেশ নূতন, উহাতে ষ্টারমার্ক দিতে ভুল হইয়াছে।

১লা মার্চ্চ, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ।
১৭ই ফাল্গুন, ১৮৩৯ শক।

গণেশ প্রসাদ।

64(b)

সূচীপত্র।

বিষয়।		পৃষ্ঠা।

আচার্য্যের উপদেশ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

সম্মুখে আলোকময় ভবিষ্যৎ।

রবিবার, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৬ শক; ১৭ই মে, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

ভূতকালের দেবপ্রসাদ মনুষ্যকে আশ্চর্য্য করে; কিন্তু ভবিষ্যতের দেবপ্রসাদ মনুষ্যকে অবাক্ করে। ঈশ্বরের দয়া যতটুকু সম্ভোগ করা হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়; কিন্তু ভবিষ্যতের মধ্যে তাঁহার যে অনন্ত দয়া লুকায়িত রহিয়াছে, তাহা ভাবিলে আর বাক্য সরে না। সাধক ভিন্ন তাহা আর কেহ জানে না। কেবল সাধকেরাই বিশ্বাস এবং আশা-নয়নে তাহা দেখিয়া পুলকিত হন। ভূতকালে ঈশ্বরের যতটুকু দয়া আমাদের জীবনে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আমরা সকলেই জানি। ঈশ্বর আমাদের জীবনে অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল সম্পাদন করিয়াছেন, আমাদের এই চর্ম্ম চক্ষের সমক্ষে সুন্দর ঘটনা সকল ঘটাইয়া দিয়াছেন। সে সকল দেখিয়া আমরা কতবার বলিয়াছি, কি আশ্চর্য্য! পামরের প্রতি ঈশ্বরের এত দয়া! ধন্য দয়াময়ের অশেষ করুণা! পাপীদের

মুখে চিরকাল এই কথা শুনিয়া আসিতেছি, ইহা পাপী জগতের সমস্ত পরীক্ষার ফল। কিন্তু ঈশ্বরের দয়ায় মোহিত হইয়া পাপী যখন এই কথা বলে যে, ঈশ্বরের কি অশেষ করুণা, তাহার অর্থ এই নহে যে পাপী তাহার দয়ার শেষ দেখিয়াছে। ঈশ্বরের অশেষ দয়ার ত শেষ নাই। যাহা দেখিয়াছি সেটুকু যে অতি অল্প দয়া। যদিও সেই এক বিন্দু সিন্ধুর সমান, কিন্তু তাহা ত অনন্ত নহে; সেই করুণাসিন্ধুর এক বিন্দুতেই প্রাণ শীতল হইয়াছে; ভক্তের ক্ষুদ্র হৃদয় সেই এক বিন্দুর ভারই বহন করিতে পারে না। সেই এক বিন্দু পাইয়াই ভক্ত উন্মত্ত। ব্রহ্মভক্ত, তুমি এমন কি পুষ্পের সৌরভ পাইয়াছ, যাহা আর ছাড়িতে পার না? এমন কি অমৃত পাইয়াছ, যাহা তোমার ক্ষুদ্র পাত্র ভেদ করিয়া দিবারাত্র বাহির হইয়া পড়িতেছে? ঈশ্বরের অল্প পরিমাণ দয়া তোমার জীবনকে অধিকার করিয়াছে ইহাতেই তোমার এত আহ্লাদ, এত উন্মত্ততা। পূর্ণ প্রেম ত এখনও দেখ নাই, যে করুণা দেখিয়াছ তাহা সীমাবিশিষ্ট, তবে কেন বল ঈশ্বরের অশেষ দয়া দেখিয়া অবাক হইয়াছ।

বাস্তবিক এক বিন্দু করুণা সিন্ধুপ্রায় হয়, কেবল অলঙ্কার অথবা সুললিত ভাষার অনুরোধে সাধক এ কথা বলেন না; কিন্তু স্বর্গ হইতে এক বিন্দু প্রেম প্রসাদ, এক বিন্দু শান্তি এবং একটী সামান্য পুণ্য-কিরণ আসিয়া পাপীকে এত দূর উন্মত্ত করে যে, আর সে আপনাকে ধারণ করিতে পারে না। এত যে ফল কোন্ বৃক্ষ হইতে প্রসূত হইল? এত প্রেমের তরঙ্গ, ভাবের প্রসঙ্গ কোথা হইতে আসিতেছে? হায়! পাপী, তুমি এই একটু সামান্য করুণা দেখিয়া এত আহ্লাদিত হইলে, না জানি ভবিষ্যতে তোমার কি হইবে?

সেই কথা ভাবিলে আর কথা সরে না, ঈশ্বরের সেই অনন্ত করুণা স্মরণ করিলে কে না অবাক হয়? ঈশ্বর যখন সম্মুখে দাঁড়াইয়া সুখের পর সুখ, স্বর্গের পর স্বর্গ এবং শান্তির পর শান্তি দিবেন, তখন ভক্ত এই কথা বলিবেন না, পিতা, তোমার দয়া আর বহন করিতে পারি না? বন্ধুগণ, ভবিষ্যতের দিকে যে কত আলোক, কত সুখ, তাহার কথা কি বলিব, ভবিষ্যতের দিকে যে কত বড় ব্যাপার রহিয়াছে এবং তাহা যে কত আশাপ্রদ, কত প্রফুল্লকর, এবং কত সৌন্দর্য্য লাবণ্যযুক্ত তাহা কথায় কে বলিতে পারে? যদি ভবিষ্যৎ দেখি আর ভূত দেখিতে ইচ্ছা হয় না। ভাল, ব্রাহ্ম, তুমি মনে করিয়া দেখ দেখি ঈশ্বর তোমাকে এখন একটু সুখ দিয়াছেন; কিন্তু ভবিষ্যতে পাছে তোমার একটু দুঃখ হয়, যখন এইজন্য দিবারাত্রি তোমার কাছে বসিয়া ক্রমাগত তোমার দুঃখ দূর করিবেন, তখন তোমার কি অবস্থা হইবে?

চিরকাল মনুষ্য নিরাশার কথা বলিয়া আসিতেছে, কেন না তাহারা ভূতকালের সন্তান; কিন্তু সাধক ভবিষ্যতে গৃহ নির্ম্মাণ করেন। ভূতকালের পাপ দুঃখ স্মরণ করিয়া মনুষ্য সুখের মধ্যেও দুঃখ আনয়ন করে। যদি ঈশ্বরের অনুকম্পায় এক্ষণে ভবিষ্যতে জীবনের গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পার, তবে আর এই চক্ষু পাপ, অভদ্র দর্শন করিতে পারিবে না, পুণ্যের ক্ষমতা সহস্র গুণে প্রবর্দ্ধিত হইবে। অতএব, বন্ধুগণ, তোমরা সকলেই অমরত্ব যে দিকে সেই পথে অগ্রসর হও। আশার শাস্ত্র যদি অধ্যয়ন করিতে চাও তবে পশ্চাৎ দেখিও না; কিন্তু সম্মুখে তোমাদের জন্য ঈশ্বর কেমন সুন্দর ভবিষ্যৎ রাখিয়াছেন তাহা দেখ। নিশ্চিত স্বর্গ যেখানে,

যাহা ভবিষ্যতে হইবেই হইবে তাহার দিকে দেখ। আর কেহই ভূতকালের অন্ধকার বিষাদের ঘন মেঘে আচ্ছন্ন থাকিও না। ঈশ্বরের যে ঘরে চিরদিনের জন্য স্থান পাইয়া সুখী হইবে তাহা দেখ। যাহারা চিরদিন গৃহহীন, বন্ধুহীন হইয়া শ্মশানে, অরণ্যে ভ্রমণ করিয়াছে, সে সকল দুঃখী গরিবদিগকে ডাকিয়া যে ঘরে পিতা তাহাদিগকে সুখ মর্য্যাদা দিতেছেন, সেই সুন্দর গৃহের দিকে দৃষ্টি কর। প্রত্যেক সন্তানের জন্য যাহা স্থিরীকৃত হইয়া রহিয়াছে তাহা ভাব। এই নিশ্চিত স্বর্গ ভবিষ্যতে রহিয়াছে, বিশ্বাসীরা ইহা সাধন করিতেছেন।

হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে, পুরাকালে অনেক তপস্যার পর যখন সাধকেরা তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় ইষ্ট দেবতার দর্শন পাইতেন, সে সকল দেবতারা তখন তাঁহাদিগকে বর দিতেন। সেইরূপ আমাদের ঈশ্বর যখন প্রকাশিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, ব্রহ্ম-সন্তান, তুমি কি বর চাও? কি প্রার্থনা কর? যিনি যথার্থ ব্রাহ্ম তিনি বলিবেন, প্রভু, যদি প্রসন্ন হইয়া বর দিবে, তবে আমাকে অমর কর। এই আশীর্ব্বাদ কর আর যেন পাপে মরিতে না হয়। আমাদের প্রতিজনের জন্য ভবিষ্যতে অমরত্ব রহিয়াছে, চিরকালের সম্ভোগের ব্যাপার পাইয়াছি, এই কথা মনে করিয়া যেন চিরদিন আহ্লাদিত থাকি। ক্ষণকালের জন্য আমরা ঈশ্বরের অতি আশ্চর্য্য, সুন্দর এবং সুমিষ্ট দর্শন পাইয়াছি, ক্ষণকালের জন্য উচ্চ হইতে উচ্চতর স্বর্গ সম্ভোগ করিয়াছি। এ সকল পাইয়াছি বলিয়াই এখন গালে হাত দিয়া ভাবিতেছি—যখন একবার ঈশ্বরের প্রেমে এত সুখ হইয়াছে তখন ভবিষ্যতে যখন গভীর হইতে গভীরতর প্রেমতরঙ্গে

ভাসিব, তখন না জানি কি সুখের অবস্থা হইবে। এখন পাঁচ বৎসর রিপুর সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া ব্রাহ্ম অবসন্ন হইয়া বলেন, বুঝি এ জীবনে, আমার পরিত্রাণ হইল না, এ পাপী আর বাঁচিল না। সেই সময় যদি সেই নিরাশ ব্যক্তি এই কথা শুনে, মহাপাতকী, উঠ, তোমার জন্য স্বর্গ হইতে শুভ্র বসন আসিয়াছে এবং ঈশ্বর তোমার জন্য প্রেম-পুষ্পের রথ পাঠাইয়াছেন, তাহা হইলে তাহার কত আহ্লাদ হয়।

অনেক দিন দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া যদি একদিন প্রেমতরঙ্গে ভাসি তাহাতেই কত আনন্দ হয়। পাঁচ বৎসর কষ্ট যন্ত্রণার পর এক নিমেষ ঈশ্বর-দর্শনে যদি এত সুখ হয়, তবে ভবিষ্যতে শত নয়, সহস্র বৎসর নয়, কিন্তু যখন ক্রমাগত অনন্তকাল ঈশ্বর-দর্শনের সুখ সম্ভোগ করিব, ইহা ভাবিলে কে না আনন্দে অবাক্ হয়। পাঁচ বৎসরের পর একবার ঈশ্বরের প্রেমমুখ দেখিয়া এত সুখ, কিন্তু পাঁচ সহস্র বৎসর যখন ক্রমাগত সেই সুন্দর সুনির্ম্মল প্রেমানন দেখিব, তখন ঈশ্বরকে কি বলিব? তখন আর তাঁহার কাছে কি ভিক্ষা করিব? সর্ব্বদাই যখন তাঁহার প্রেমমুখ দেখিব, তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে যখন অমর হইব, যখন মৃত্যু আর হবে না, পাপ করা কি, যখন একেবারে ভুলিয়া যাইব, তখন আর তাঁহার কাছে কিসের জন্য প্রার্থনা করিব? তখন মন যে কত প্রশান্ত, এবং জীবন কত উচ্চ হইবে তাহা ভাবিতে পারি না। এখন কেবল এই পর্য্যন্ত জানা ভাল যে, ভবিষ্যতে ঈশ্বর আমাদের জন্য এত প্রেম, এবং এত আহ্লাদ লুকাইয়া রাখিয়াছেন যে, তাহার কোটী অংশের একাংশ এখন পর্য্যন্ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সাধকও লাভ করিতে পারেন নাই।

ঈশ্বর অনন্ত ইহা তোমরা জান, যখন ঈশ্বর অনন্ত, তখন

তাঁহার প্রেম এবং সুখের ভাণ্ডারও অনন্ত, ইহাও মানিতে হইবে। আবার ভাবিয়া দেখ, যদি সন্তানদের জন্য নহে, তবে সেই ভাণ্ডার কাহাদের জন্য? আমাদিগকে সুখী করিবেন এইজন্য রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন। পিতা, এত প্রেম, এত আনন্দ আনিয়া দিবেন যে, তাহা ধারণ করিতে পারিব না। এত উচ্চ-আশার কথা শুনিয়া আর কাহারও মুখে হৃদয়বিদারক নিরাশার কথা শুনিতে চাই না। তোমার জন্য, আমার জন্য এবং সকলের জন্য ঈশ্বর ভবিষ্যতে অনন্ত সুখের ভাণ্ডার লুকাইয়া রাখিয়াছেন, আর কেন তবে ভূতকালের অন্ধকার বিষাদ দেখিয়া ভয় করিব? কোটী কোটী প্রেমের সূর্য্য সম্মুখে উজ্জ্বলরূপে দেখা দিতেছে। ভবিষ্যতে অমৃতের সাগর, শান্তির অগাধ মহাসমুদ্র। বড় দুঃখ পাইয়াছ, পথিক, ইহা মানিলাম; কিন্তু যখন ঐ সম্মুখের সুন্দর ঘরে প্রবেশ করিবে, তখন কত সুখী হইবে, একবার ভাবিয়া দেখ। যখন সেই ঘরে ভক্তেরা আসিয়া হাত ধরিয়া তোমাকে পিতার কাছে লইয়া যাইবেন, তখনকার আনন্দ একবার বিশ্বাস এবং আশা-নয়নে দর্শন কর। আমাদের ভূতকাল যত কেন দুঃখময় হউক না, আমাদের ভয় নাই, কেন না আমাদের ভবিষ্যৎ শান্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। ধন্য পিতার করুণা! তাঁহার প্রেম চিরকাল জয়যুক্ত হউক।

কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ।

একাদশ সাম্বৎসরিক উৎসব।

ব্রহ্ম-দর্শনে ব্রাহ্মত্ব।

বৃহস্পতিবার, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮৯৬ শক ; ২৮শে মে, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

আকার দেখিতে চাও, কি নিরাকার দেখিতে চাও, এই কথা যদি ঈশ্বর ভক্তকে জিজ্ঞাসা করেন, ব্রহ্মভক্ত ইহার কি উত্তর দিবেন? যথার্থ ভক্ত ব্রহ্মকে সাকার না নিরাকার দেখিতে ইচ্ছা করেন? সমুদয় ভক্তেরা এক বাক্য হইয়া এই কথা বলিবেন, আমরা সকলেই নিরাকার ব্রহ্মদর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল। সাধকের কথনই এ ইচ্ছা হইতে পারে না যে, তিনি ব্রহ্মের মধ্যেও বাহিরের সেই অস্থায়ী জড় পদার্থের আকারের ন্যায় কোন রূপ দর্শন করেন। ঈশ্বর ত জড় হইতে পারেন না ; আবার ভক্তেরাও ব্রহ্মকে সাকার দেখিতে চান না। কেন না যে চক্ষে ব্রহ্মদর্শন হয় তাহা আকার দেখিতে পায় না। সাধকের যে বিশ্বাস, যে প্রেম, এবং যে ধ্যান দ্বারা ঈশ্বর ধৃত হন, তাহা কোন প্রকার বাহিরের রূপ কিম্বা বাহ্যিক আকার গ্রহণ করিতে পারে না। যে রাজ্যে নানা প্রকার রূপ এবং আকার দৃষ্ট হয় সাধক কথনই সেখানে বাস করেন না। পুরাকালে ঋষিদিগের ভক্তি এবং ধ্যান-চক্ষু কি কথনও বহির্বিষয়ে বিচরণ করিত? প্রাচীনকালে যেমন এখনও তেমনই। যদি ঈশ্বরের

কাছে উপস্থিত হইতে চাও, তবে তাঁহাকে নিরাকার ভাবে দেখিতে হইবে। যাই ভক্ত বহির্বিষয়ে অবতরণ করেন, তৎক্ষণাৎ ধ্যান অসম্ভব হয়। এইজন্য চিরকাল সাধক, ঋষি এবং জগতের সমুদয় বিশ্বাসী ভক্তেরা এই প্রার্থনা করিয়াছেন "ঈশ্বর! আমরা তোমার আকার কিম্বা রূপ দেখিতে চাই না; কিন্তু তুমি অতীন্দ্রিয় হইয়া অন্তরে দেখা দিয়া আমাদের আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর কর।"

সন্তান জল চাহিলে পিতা কি তাহাকে প্রস্তর দিতে পারেন? প্রাণ চায় যে সন্তান, তাহাকে কি তিনি বিনাশ করিবেন? অসীম অনন্ত ঈশ্বরকে আমরা চাই। সীমাবদ্ধ, পরিমিত আকার কিম্বা রূপ কি আমাদের আত্মাকে চরিতার্থ করিতে পারে? ঈশ্বর স্বয়ং যেমন অনন্ত নিরাকার তাঁহার সেই ভাবে তিনি সন্তানদিগকে দেখা দিবেন, এইজন্যই তিনি আমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন। তিনি যেমন, যদি যথার্থ সেই ভাবে আমরা তাঁহার সাক্ষাৎ না পাই, তবে আমাদের পশু, পক্ষী, জলের মৎস্য অথবা অপর কোন নিকৃষ্ট জন্তু হওয়া ছিল ভাল। ঈশ্বর যদি দেখা না দিবেন, তবে কি জন্য তিনি মনুষ্যকে পৃথিবীতে পাঠাইলেন? যদি ঈশ্বর-দর্শন অসম্ভব হয়, তবে পৃথিবীর এত প্রকার উপাসনাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল কেন? শ্রবণ, মনন, এবং নিদিধ্যাসন দ্বারা যে ব্রহ্মকে ধারণ করিতে হইবে, তাঁহার আকারের প্রয়োজন কি? আমাদের অন্তরের বিশ্বাস, প্রেম, ভক্তি এবং আত্মার অন্যান্য উচ্চতম বৃত্তি সকল অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম এবং অনন্ত পুণ্য অন্বেষণ করিতেছে। যেখানে অনন্তের জন্য তীক্ষ্ণ ক্ষুধা এবং ব্যাকুলতা, সেখানে ক্ষুদ্র পরিমিত বস্তু কি করিতে পারে? কোথায় অনন্ত? কোথায় অনন্ত জ্যোতি, কোথায় অমৃতসাগর?

এই বলিয়া অমরাত্মা সকল কাঁদিতেছে। কোথায় তাঁর অন্ত? কোথায় তাঁর অন্ত? এ সকল কথা বলিয়া চিরকাল মনুষ্যমণ্ডলী হইতে স্তব স্তুতি উঠিতেছে। অনন্ত সৌন্দর্য্য দেখিব, অনন্তকালের জন্য অনন্তের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিব, এইজন্য আমরা জন্মধারণ করিয়াছি। অমৃতের অধিকারী করিয়া ঈশ্বর আমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন।

এই অনন্ত সৌন্দর্য্য যিনি দেখিতে পান, ঈশ্বরের উপাসনা কেমন সুমিষ্ট তিনিই তাহা আস্বাদ করিতে পারেন। কেমন করিয়া নিরাকার ঈশ্বরকে দেখিব, কিরূপে তাঁহার ধ্যান করিব, চক্ষু মুদ্রিত করিলে কিছুই দেখিতে পাই না, কত লোকে বারম্বার এই সকল প্রশ্ন উত্থাপিত করে, এবং ইহারই জন্য পৃথিবীতে জড়পূজার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কিন্তু নিরাকার ব্রহ্ম-দর্শনে মনুষ্যের মন মোহিত হইতে পারে, আর কিছুতেই তেমন হয় না। যদি নিরাকার ঈশ্বরের দিকে তাকাইয়া গভীর আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন না হইলাম, তবে অনন্তের পূজা হইল কৈ? ব্রাহ্ম হওয়া অতি কঠিন ব্রত। নিরাকার ব্রহ্ম-দর্শন অতি উচ্চ ব্যাপার। সকলের ইহাতে শীঘ্র এবং অনায়াসে অধিকার জন্মে না। বাস্তবিক ঈশ্বর-দর্শন, এবং ঈশ্বর মুখে তাঁহার অভ্রান্ত বেদবাক্য শ্রবণ অতি উচ্চ ব্যাপার। ব্রাহ্ম কে? যিনি ব্রহ্মকে দর্শন করেন। তোমাদিগকে আমি দেখিতেছি, আমাকে তোমরা দেখিতেছ, ইহাতে যেমন সন্দেহ নাই, এইরূপ সহজ ভাবে যিনি ব্রহ্মকে দেখিতে পান তিনিই যথার্থ ব্রাহ্ম। কতকগুলি স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিলে ব্রাহ্ম হওয়া হয় না। যদি সকলেই ব্রহ্মকে দেখিত, প্রত্যেক ব্যক্তি ব্রাহ্ম নাম গ্রহণ করিত, এবং সমস্ত

মনুষ্যজাতি একটী ব্রাহ্মমণ্ডলী হইয়া পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যের পরিচয় দিত। সমস্ত জগৎ ব্রাহ্ম হয় নাই এইজন্য নহে যে, সকলের ব্রাহ্মনামে ঘৃণা আছে; কিন্তু ইহাই যথার্থ কথা যে মনুষ্য ব্রহ্মকে দেখিল না।

নিমীলিত নয়নে অন্ধকার মধ্যে করতল ন্যস্ত বস্তুর ন্যায় ঈশ্বরকে স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা কি সহজ ব্যাপার? হৃদয়ের মধ্যে নিরাকার অনন্ত ব্রহ্মকে না দেখিয়া ভ্রান্ত মনুষ্য পৃথিবীর নিম্ন ভূমিতে, পর্ব্বতে, কোথায় ঈশ্বর, কোথায় ঈশ্বর বলিয়া ধাবিত হইল। যাঁহার হস্ত, পদ এবং কোন অবয়ব নাই তাঁহাকে অতি সহজ এবং উজ্জ্বল ভাবে দেখা নিতান্ত সামান্য ব্যাপার নহে। যতই বয়োবৃদ্ধি হইতেছে ততই বুঝিতেছি, ব্রহ্মসাধন কি জন্য পূর্ব্বতম ঋষিরা কঠিন বলিতেন। যেখানে কেবল আত্মা আর পরমাত্মার সম্পর্ক, সেখানে দিবারাত্র নিতান্ত নিগূঢ় সাধন আবশ্যক। কিন্তু যতই গূঢ়ভাবে ব্রহ্মস্বরূপের মধ্যে প্রবেশ করিবে ততই দেখিবে তাঁহার মধ্যে কেমন নব নব সুন্দর মনোহর ভাব সকল সন্নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। ব্রাহ্মগণ, যাহারা তোমাদের বিরোধী, যাহারা ঈশ্বরকে দুষ্প্রাপ্য মনে করে, যাহারা কেবলই সংসারের নিম্নভূমিতে বিচরণ করিয়া অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরকে দেখিতে অক্ষম, তাহাদিগকে একবার দেখাও—নিরাকার ঈশ্বরকে দেখিলে দেহ মন কেমন রোমাঞ্চিত হয়। ব্রহ্ম-দর্শনে কত সুখ তোমরা পাঁচজন দেখাও, দেখি ভারত টলমল করে কি না। পিতা মাতা, ভাই ভগ্নী এবং আত্মীয় বন্ধুদিগকে ব্রহ্ম-দর্শনে কত সুখ এবং ব্রহ্মোপাসনার কত মধুরতা দেখাও। যে প্রকারে হউক পিতার মনে কষ্ট দিয়াও কেবল ঐহিক সুখ লাভ করিতে পারিলেই হইল, এই প্রকার নীচ অভিসন্ধি দূর কর। উপাসনাতে মত্ত হইয়া কত

সুখী হইতে পার জগৎকে ইহা দেখাও। বুদ্ধি কিম্বা তর্কে নহে, কিন্তু তোমাদের জীবন-শাস্ত্র দেখিয়া সকলে নিরাকার ব্রহ্ম-দর্শনের জন্য লালায়িত হইবে। একবার যাঁহাকে দেখিলে আর প্রাণের মধ্যে সন্তাপ থাকে না, তোমরা সকলে তাঁহাকে দেখিয়া ধন্য হও। সকলের কাছে গিয়া প্রণয়ের সহিত এই কথা বল—যাঁহার উপাসনা করিলে প্রাণ প্রফুল্ল হয়, কেন তোমরা তাঁহার কাছে আসিবে না? ব্রহ্মকৃপাতে ব্রহ্মকে দেখিবে এবং ব্রহ্মকে দেখাইবে, এই সঙ্কল্প কর। আশু তোমাদের বিশুদ্ধ কামনা সকল চরিতার্থ হইবে, দেশের দুঃখ দূর হইবে, এবং পৃথিবী স্বর্গধাম হইবে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

প্রাণ-দুর্গ।

রবিবার, ১১ই শ্রাবণ, ১৭৯৬ শক; ২৬শে জুলাই, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

সহস্র অভেদ্য প্রস্তরময় প্রাচীরের মধ্যে প্রাণের দুর্গ। সেই দুর্গের মধ্যে ঈশ্বর আপনার আশ্রিত সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছেন। ব্রহ্মমন্দির বল, আশ্রম বল, স্বর্গরাজ্য বল, সকলই সেই দুর্গের মধ্যে; যে মনুষ্য-সন্তান সেই দুর্গের মধ্যে বাস করে তাহার ভয় কি? সহস্র অভেদ্য প্রাচীর মধ্যে শত্রুরা বাণাঘাত করে; যে ব্যক্তি প্রাচীরের বাহিরে বাস করে সুতরাং দুর্গের মধ্যস্থ ঈশ্বরের প্রেমমুখ দেখিতে পায় না, সেই ব্যক্তিই ভীত হয়। সামান্য

বিভীষিকা দেখিয়া তাহারই প্রাণ অস্থির হয়। ঈশ্বরের সঙ্গে যে, সে ব্যক্তি কখনও থাকে না তাহা আমি বলি না, সে সময়ে সময়ে ঈশ্বরের কাছে থাকে, এবং ঈশ্বরের পূজা করে; কিন্তু সে ঈশ্বরের নহে। এইজন্য সাধককে সম্পূর্ণরূপে আপনার করিয়া লইবার নিমিত্তই ঈশ্বর পৃথিবীতে বিপদ প্রেরণ করেন। যে ব্যক্তি কেবল উপাসনার সময় ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হয়, এবং অবশিষ্ট সমস্ত সময় প্রাচীরের বাহিরে বাস করে, তাহার দুঃখের সীমা নাই। সামান্য বিপদ আসিল, মেঘ উঠিল, তরঙ্গ সকল দেখা দিল, তাহার ঈশ্বর হৃদয় হইতে চলিয়া গেল; কেন না যথার্থ জীবনের ঈশ্বরের সঙ্গে তাহার পরিচয় হয় নাই। ঈশ্বর কেন এই বিপদ এবং এত অন্ধকার প্রেরণ করিলেন এই বলিয়া সে ক্রন্দন করে। কিন্তু যদি হৃদয়ের মধ্যে যথার্থ বিশ্বাস থাকে, বিপদে ঈশ্বরের সঙ্গে বিশ্বাসীর যোগ গূঢ়তর এবং ঘনিষ্ঠতর হয়। বাহিরে অন্ধকার দেখিয়া ঈশ্বরসন্তান সেই সহস্র অভেদ্য প্রচীরের প্রথম প্রাচীরের মধ্যে গিয়া আপনাকে নিরাপদ মনে করেন। সেখানে যখন সুখ সম্পদ আসিল, আবার বিপদের প্রয়োজন হইল, সেখানেও বিপদে আক্রান্ত হইয়া, সেই ব্যক্তির মনে এই হইল, আরও নিরাপদ স্থানে না গেলে নির্ব্বিঘ্ন হইতে পারি না। তখন সে দ্বিতীয় প্রাচীরের দ্বারে আঘাত করিল, দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, দ্বিতীয় প্রাচীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সাধক আবার আপনাকে নিরাপদ মনে করিল, কিন্তু সে ব্যক্তি জানিত না যে, সেখানেও তাহার নিস্তার নাই।

বিশ্বাসী মনুষ্য যখন এইরূপে বিপদের পর বিপদে আক্রান্ত হইয়া, সেই শত সহস্র প্রাচীর ভেদ করিয়া সেই দুর্গ মধ্যে

প্রবেশ করে, তখনই সে অভয় পদ লাভ করে। অতএব পৃথিবীতে যদি রাশি রাশি বিঘ্ন বিপদ না থাকিত, ঈশ্বরের মূল্য কি মনুষ্য বুঝিত? সেই দুর্গের মধ্যে বসিয়া যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রেমমুখ দর্শন করে এবং তাঁহাকে পূর্ণ অবিভক্ত প্রেম দান করিয়া, তাঁহার শান্তিপূর্ণ সহবাস সম্ভোগ করে, সেই ব্যক্তিই কেবল রাশি রাশি বিঘ্ন বিপদ দেখিয়া উপহাস করিতে পারে? বিঘ্ন বিপদ আছে বলিয়াই ঈশ্বরের অভয় পদের এত আদর। মৃত্যুকালে যখন মৃত্যুঞ্জয়ের দর্শন পাইয়া মৃত্যুকে জয় করিতে পারি, ঘোর বিপদের মধ্যে যখন হৃদয়-কন্দরে ঈশ্বর-হস্ত-নির্ম্মিত সেই প্রাণ-দুর্গ মধ্যে তাঁহার সুন্দর প্রেমমুখ দেখি, তখন অন্তরে কত উৎসাহ, কত প্রেম, কত বল এবং কত সুখের উদয় হয়। বল, ব্রাহ্ম, কত সুখ। বিপদের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিয়া তুমি যদি সুখী না হও তবে পৃথিবীতে বাস্তবিক সুখী কেহই নহে। প্রাণ-দুর্গের ভিতরে বসিয়া প্রাণেশ্বরকে দেখিতেছি, সহস্র বিপদ আক্রমণ করিতে আসিতেছে, ভয় নাই অভয়দাতা অভয় দান করিতেছেন; যতই বিপদ ভয় দেখাইতেছে, ততই ঈশ্বর তোমাদিগকে আরও তাঁহার নিকটে ডাকিতেছেন, ইহা অপেক্ষা আর সৌভাগ্যের অবস্থা কি? চিরদিন যন্ত্রণার অনলে প্রাণ দগ্ধ হইতেছিল, কিন্তু ব্রহ্মসহবাসে প্রাণ শীতল হইয়াছে। এক্ষণে যতই বিঘ্ন বিপদে আক্রান্ত হইতেছি, ততই গূঢ়তর ব্রহ্মসহবাসে অন্তরের প্রফুল্লতা বাড়িতেছে। বিপদ বন্ধু হইয়া আমাদিগকে ঈশ্বরের অব্যবহিত সন্নিধানে লইয়া যাইতেছে, অতএব যিনি বিপদকে ঈশ্বরের রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দেন, তিনি ধর্ম্মজগতের অর্দ্ধেক বিশ্বাস করেন, পূর্ণ বিশ্বাস তাঁহার হয় নাই।

প্রত্যেক বিপদের অগ্নির মধ্যে মনুষ্য-সন্তান বিশ্বাস পুণ্যে পরিবর্দ্ধিত হয়। বিপদের মধ্যে ব্রাহ্মের হৃদয়ের প্রসন্নতা সহস্র গুণে বৃদ্ধি হয়। বিপদ তাঁহার পরম বন্ধু। বিপদকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিতেছি কেন? এইজন্য যে আমরা প্রাচীরের বাহিরে ছিলাম, বিপদ আমাদিগকে প্রহার করিতে করিতে সেই দুর্গের মধ্যে লইয়া আসিয়াছে। দুঃখের মধ্যে থাকিয়া যাহারা ঈশ্বরকে নিকট দেখে তাহারাই জানে দুঃখ বিপদের কত মূল্য। বিপদের সময় যে ঈশ্বরকে দেখি, তিনি সেই সম্পদেরই ঈশ্বর, সেই একই ঈশ্বর; কিন্তু সৌন্দর্য্য তাঁহার মুখে কত। পূর্ব্বে যে মেঘ তাঁহার মুখ আচ্ছন্ন করিয়াছিল, এখন আর সেই মেঘ নাই। বিপদের সময় ঈশ্বরকে দেখিলে যেমন প্রফুল্লতা ও সাহস হয় তেমন আর কখনও হয় না। জল ত সর্ব্বদাই দেখি; কিন্তু তৃষ্ণার পর যে জল পান করি, তখন জলের কত সৌন্দর্য্য। সেইরূপ আত্মার তৃষ্ণার পর যখন তাঁহার চরণারবিন্দের শান্তিবারি পান করি তখনই বুঝিতে পারি ব্রহ্মকৃপা কত মধুর। দুঃখের পর ঈশ্বর-দর্শন অতি অপূর্ব্ব। যখন প্রাণ-দুর্গের মধ্যে প্রাণেশ্বরকে দেখি, তখন বলি, মৃত্যু, কোথায় তোমার ভয়ানক মূর্ত্তি, এবং কোথায় তোমার যন্ত্রণা দিবার ক্ষমতা? এই পৃথিবীর মধ্যে অনেক বিপদ অনেক শত্রু। সর্ব্বদাই একটী না একটী বিপদ কণ্টকের মত আমাদিগকে বিদ্ধ করিতেছে; কিন্তু এ সমুদয় বাণ যদি আমাদিগকে ব্যথিত না করিত, তবে ত প্রাণেশ্বর কত মধুময় আমরা বুঝিতে পারিতাম না!

ব্রাহ্মগণ, বিপদ দেখিয়া ভীত হইও না। যখন ক্রমাগত এই চল্লিশ বৎসর বিপদের পর বিপদ, রাশি রাশি বিপদ ব্রাহ্মসমাজের মস্তকের

উপর চলিয়া গিয়াছে, এবং প্রত্যেক বিপদে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি হইয়াছে, তখন বিপদকে ঈশ্বরের বিধানের বহির্ভূত মনে করিও না। যখনই বিপদ আসিবে বিশ্বাস করিও, তোমাদের উপাসনা, ধ্যান আরও ভাল হইবে। ঈশ্বরের রাজ্যে বিপদ না থাকিলে ব্রাহ্মসমাজ মরিত। বিপদ-কণ্টক স্বর্গ হইতে অমৃত লইয়া উপস্থিত হয়। বিপদের শত্রুতার মধ্যে স্বর্গীয় মিত্রতা রহিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজে যত বিপদ ঘটিয়াছে, তাহারা সকলে একত্র হইয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ-পথে লইয়া যাইতেছে। বিপদ আসে আসুক, ইহা ঈশ্বর-সন্তানকে আরও বিশ্বাসী করিয়া যাইবে। ঈশ্বরের সঙ্গে কিছুমাত্র বিচ্ছেদ থাকিতে দিবে না। যদি আরও বিপদ আসে ঈশ্বরের মূল্য আরও বুঝিতে পারিব। বিপদ দেখিয়া থাক, ভয় নাই, ঈশ্বরকে প্রাণমন্দিরে নিকটস্থ দেখিয়া, তাঁহার জয়ধ্বনি করিতে করিতে সকল বিপদ শত্রুকে পরাস্ত কর। আমাদের পৌত্তলিক ভ্রাতৃগণ ঈশ্বরের অনেক প্রকার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে কতকগুলি সুন্দর এবং অবশিষ্টগুলি ভয়ঙ্কর। কিন্তু বাণবিদ্ধ ঈশ্বর শরশয্যায় শয়ান, কোন কবি কি কল্পনা করিয়াছে? আমরা মূর্ত্তি পূজা করি না; কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ ঈশ্বরকে আমরা যেরূপ অবিশ্বাস এবং অপমান করি এবং সমস্ত পাপীজগৎ একত্র হইয়া তাঁহার প্রতি দিন দিন যেরূপ রাশি রাশি বাণ নিক্ষেপ করে, তাঁহার যদি শরীর থাকিত, তাহা হইলে দেখিতাম, বাণে বিদ্ধ হইয়া তাঁহার সমস্ত শরীরে ক্রমাগত রক্ত পড়িতেছে। মূর্ত্তির ভাব পরিত্যাগ কর; কিন্তু যথার্থ ঈশ্বর যিনি তিনি আমাদের এই জগতে অপমানিত ঈশ্বর। সমস্ত জগৎ তাঁহার নিন্দা অপমান করিতেছে। তবে ব্রহ্মসন্তান, তুমি কেন

এই পৃথিবীতে গৌরব আকাঙ্ক্ষা করিতেছ? পৃথিবী সহস্র তীক্ষ্ণ-বাণ তোমাকে বিদ্ধ করে করুক, তুমি কেবল পৃথিবীকে এই বলিবে, ঐ দেখ আমার পিতা যিনি নিষ্কলঙ্ক ঈশ্বর, তিনি স্বয়ং তোমার সহস্র বাণে বিদ্ধ হইয়া শরশয্যায় শয়ান।

আমার স্বর্গীয় প্রভু যাঁহার স্বভাবে কোন কলঙ্ক নাই, যখন তাঁহার এত অপমান, তখন আমি যে কত মহাপাপে কলঙ্কিত, আমাকে যে, লোকে অপমান করিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যে শরশয্যায় আমি শয়ন করিতেছি, ইহারই পার্শ্বে আমার স্বর্গীয় পিতার শরশয্যা। পিতার কাছে পুত্র, পুত্রের ভয় কি? যাঁহার চরিত্রে কোন দোষ নাই, পূর্ণ পবিত্রতা যাঁহার স্বরূপ, তাঁহাকেই যখন পৃথিবী অবিশ্বাস এবং অপমান করিল, তখন আমি কোথায় রহিলাম? কিন্তু ভয় নাই, কেন না ন্যায়বান্ ঈশ্বরের রাজ্যে ব্রহ্মসন্তানগণ অকারণে কখনই অপরাধী হইবে না, যাহারা জঘন্য, কলঙ্কিত, তাহারাই স্বর্গের দণ্ড পাইবে; কিন্তু যাহারা নিরপরাধ, সমস্ত পৃথিবী বিরোধী হইলেও, তাহাদের বিন্দুমাত্র শান্তি হরণ করিতে পারিবে না। প্রচারকগণ, তোমাদের নিন্দা হইয়াছে, আমার নিন্দা হইয়াছে, ব্রহ্মমন্দিরের বেদীর নিন্দা হইয়াছে। সকল কুৎসা ঈশ্বর শুনিয়াছেন, সকলই তিনি জানিতেছেন। আমাদের বিরুদ্ধে, তাল বৃক্ষ সমান বিপদ তরঙ্গ উত্থিত হয় হউক; কিন্তু বল, সমুদয় আন্দোলনের মধ্যে এই স্বর্গীয় আহ্বান শুনিতেছ কি না, এই সমাচার পাইতেছ কি না যে, ঈশ্বর তোমাদিগকে তাঁহার আরও নিকটে লইয়া গিয়া পৃথিবীতে বিশ্বাসের পরাক্রম এবং ব্রাহ্মের বীরত্ব প্রকাশ করিবেন? দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিয়া বলিতেছি, এই বিপদের পর ব্রাহ্মসমাজের

মধ্যে পবিত্রতা কি, ভক্তি কি, স্বর্গীয় উন্মত্ততা কি, অচিরে প্রকাশিত হইবে। অতএব পৃথিবীতে যাহারা তোমাদের নিন্দা করে তাহাদিগকে শত্রু বলিও না। কেন না তাহারাই তোমাদিগকে মিত্রের ন্যায় ঈশ্বরের আশ্রয়ে লইয়া যাইতেছে। বল, মিত্রেরা এস, তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ, অস্ত্র সকল লইয়া এস, কেন না যতই তোমাদের বাণে আমাদের জীবনের রক্তপাত হইবে, ততই আমাদের গূঢ়তর প্রাণের মধ্যে স্বর্গীয় প্রসন্নতা আসিবে। ঈশ্বরের অন্নে জীবিত থাকিয়া যদি কিছু দেখাইতে চাও, দেখাও বিশ্বাসের বল কত। "কোথায় দয়াময়" বলিয়া ডাকিলেই তিনি দেখা দেন, জগৎকে ইহা জীবনে দেখাও। কেবলই সাধন কর, স্তব স্তুতি কর, তোমাদিগকে বিপদে ফেলিয়া ঈশ্বর দূরে পলায়ন করেন নাই। যে বিপন্ন, সেই যথার্থ সুখী। তাহারই অন্তরে সর্ব্বদা প্রেম-ভক্তি-নদী প্রবাহিত হয়। সেই ঘোর বিপদের সময় আসিয়াছে, যখন ঈশ্বর তোমাদিগকে তাঁহার অভেদ্য দুর্গ মধ্যে লইয়া গিয়া একটী সুন্দর পবিত্র শান্তি-গৃহে আশ্রয় দান করিবেন। নিরাশ দুঃখী হইবার এই সময় নহে। এই বিপদের পর কি হইবে দেখিবে। মৃত্তিকা প্রস্তর হইবে, ঈশ্বর আছেন, তাঁহার মৃত্যু হয় নাই, দশ দিক হইতে ইহা প্রচারিত হইবে।

হে প্রেমসিন্ধু, তোমার কথা কি মিষ্ট নহে? তুমি কি সুন্দর নও? পিতা, তোমার উপাসনা যে করিতে পারে তাহার দুঃখ কোথায়? তুমি যাহাকে দেখা দাও, সে কি কখনও দুঃখী হয়? পৃথিবীর বিপদে যদি উপাসনা ভাল হয় তবে তাহা যে স্বর্গীয় সম্পদ। বিপদে পড়িয়া যদি কোন দিন না কাঁদিতাম তাহা হইলে কি তোমার মুখের সৌন্দর্য্য দেখিতাম? সেই দিন তোমার মুখে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য

দেখিয়াছি, যে দিন দুঃখী বলিয়া কাছে আসিয়া বলিলে, "সন্তান! ভয় কি? আমি যে তোমার কাছে, আমি যে তোমার সহায়।" সেই দিন তোমার মুখ আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যে অনুরঞ্জিত দেখিয়াছি, যে দিন বলিলে "সন্তান! যদি সমস্ত পৃথিবী শত্রু হইয়া তোমাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে, তুমি যে ভাসিবে।" আবার সেই দিন তোমাকে সুন্দর দেখিয়াছি যে দিন সমুদয় পরিবারকে এই প্রাণের মধ্যে আনিয়া দিলে, এই ব্রহ্মমন্দির তাহার সাক্ষী রহিয়াছে। এইরূপে কতদিন তোমাকে দেখিয়া হৃদয়ের গভীর বেদনা দূর হইয়াছে, এবং তোমার সুমিষ্ট কথা শুনিয়া কতবার তাপিত প্রাণে শান্তি লাভ করিয়াছি, তাহা গণনা করিতে পারি না। প্রাণেশ্বর, তোমাকে পাইয়া যখন সুখী হইয়াছি, এবং তোমাকে লইয়া যখন সুখী হইতে পারি, তখন আর আমাদের কিসের ভয়? দুঃখ বিপদের সময় বন্ধু বান্ধব যিনি যেখানে আছেন সকলের চিত্তকে সুখী কর। পিতা, আমরা যদি ব্রাহ্ম না হইতাম, তবে কি তোমার মত এমন সুন্দর দেবতাকে দেখিতাম? হয় ত আজ এই রবিবার রাত্রে যখন তোমার মন্দির মধ্যে বসিয়া তোমার পবিত্র প্রেমসুধা পান করিতেছি, এমন পবিত্র সময়েই কত জঘন্য ভয়ানক কলঙ্কে আত্মাকে কলুষিত করিতাম। কিন্তু তুমি যাহাদিগকে কৃপা করিয়া ডাকিয়াছ তাহারা কি তোমাকে না দেখিলে আর কোথাও সুখী হইতে পারে? "তুমি যারে কর সুখী কে তারে দুঃখী করিতে পারে?" নাথ, তোমার সুখে চিরকাল আমাদিগকে সুখী কর। তুমি যখন সুখ দিবে বলিয়াছ তখন বিপদ আবার কি? কেবল পাপই শত্রু। যাঁহারা বাহির হইতে বাণ নিক্ষেপ করেন তাঁহারা যে পরম বন্ধু; কেন না তাঁহারা না জানিয়া

আমাদিগকে তোমার সৌন্দর্য্য দেখাইয়া দেন। জীবন্ত ঈশ্বর, তুমি তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর। দয়ার সাগর, দীনশরণ, তোমার কাছে প্রার্থনা করিতেছি যেন অনন্ত জীবন তোমাকে লইয়া সুখী থাকি।

প্রেমের জয়।

রবিবার, ২২শে ভাদ্র, ১৭৯৬ শক; ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

আমরা এই মাত্র শুনিলাম "সত্যমেব জয়তে, আর চিন্তা নাই।" দয়াময় পিতার রাজ্যে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ মনঃপীড়া আর রবে না। তোমাদের চিন্তা নাই, আমার চিন্তা নাই, মহাপাপীর চিন্তা নাই, জগতের চিন্তা নাই। কেন না ঈশ্বরের সত্য এবং তাঁহার প্রেমের জয় হইবেই হইবে। ঈশ্বর যখন এ সকল কথা বলিতেছেন, তখন আর আমাদের ভাবনা, চিন্তা কি? অতএব জগতে অসত্য এবং অপ্রেম দেখিয়া, সাবধান, কেহই আর ভীত হইও না। ঈশ্বরের কৃপাবলে এ সকলই চূর্ণ হইয়া যাইবে, এবং এ সমুদয়ের পরিবর্ত্তে অচিরে তাঁহার সত্য এবং প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। তোমরা দেখিতেছ নানা প্রকার জঘন্য দুর্দ্দান্ত রিপু সকল অন্তরে উত্তেজিত হইয়া মনুষ্যের জীবন কলঙ্কিত করিতেছে, এবং সৃষ্টি অবধি এ সকল ভয়ানক রিপুদিগের আক্রমণে মনুষ্যজাতি নিতান্ত বিপদগ্রস্ত এবং যার পর নাই বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু তথাপি ভয় নাই, ভাবনা নাই, কেন না স্বর্গ হইতে ঈশ্বর বলিতেছেন, তাঁহার স্বর্গের জয় হইবেই হইবে। ঈশ্বরের মুখ হইতে যখন এ সকল কথা শুনিতেছি যে, "সত্যের জয় হইবেই হইবে, এবং তাঁহার প্রেমরাজ্য বিস্তৃত হইবেই হইবে,"

তখন যদি সমুদয় পৃথিবীর লোক ইহার বিরোধী হয় তথাপি আমাদের কোন ভয় নাই। কেন না ঈশ্বর যেমন সত্য, তাঁহার কথাও তেমনই সত্য। তিনি যখন বলিতেছেন, সমুদয় অন্ধকার ভেদ করিয়া তাঁহার সত্যজ্যোতি বিকীর্ণ হইবে, এবং সমুদয় বিঘ্ন বিপদ অতিক্রম করিয়া এই পাপীজগতে তাঁহার প্রেম-সূর্য্য উদিত হইবে, তখন কতকগুলি ভ্রমান্ধ, চঞ্চলচিত্ত, স্বার্থপর বালকের দুর্ব্যবহার দেখিয়া কি আমরা ভীত হইব? পৃথিবীতে অসত্যের জয় হইবে, প্রেম-পরিবার হইতে পারে না, ব্রাহ্মধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবে, যাঁহারা অন্ততঃ একবারও ব্রহ্মের কথা শুনিয়াছেন, তাঁহারা কি এ সকল অলীক কথা বিশ্বাস করিতে পারেন? অবিশ্বাসী জগৎ বলিতেছে, ব্রাহ্মগণ, তোমরা পাঁচজনে কি করিতেছ? তোমরা এই ভাগীরথীতীরের একটী ক্ষুদ্র দল কি করিতে পার? আবার যখন তোমাদের এই অল্প কয়েকজনের মধ্যেই নানাপ্রকার মতভেদ, অসত্য, অপ্রেম, বিবাদ এবং এত বৎসরের সাধনের পরেও যখন তোমরাই সামান্য সামান্য রিপু দমন করিতে পারিতেছ না, তখন তোমাদের ধর্ম্ম দ্বারা সমস্ত জগতের পরিত্রাণ হইবে, কিরূপে এই অহঙ্কার করিতেছ? কিন্তু যথার্থ ঈশ্বর-বিশ্বাসী দুর্জ্জয় সাহসের সহিত অবিশ্বাসীদিগকে এই বলিতেছেন—"যখন ঈশ্বর স্বয়ং আপনার মুখে এই কথা বলিতেছেন যে, তাঁহার সত্য এবং তাঁহার প্রেমের জয় হইবেই হইবে, তখন কিরূপে তাঁহার কথা অবিশ্বাস করিব।"

এই যে সঙ্গীত হইল "সত্যের জয় হইবেই হইবে, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, মনঃপীড়া আর রবে না;" সাধকগণ, তোমরা কি ঈশ্বরের মুখে এ সকল কথা শুন নাই? যদি না শুনিয়া থাক তবে ব্রহ্ম-

মন্দিরে আসিবার প্রয়োজন কি? যদি তাঁহার মুখে এ সকল কথা না শুনিয়া থাক, তবে কাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া তোমরা এতকাল ভ্রম, কুসংস্কার, পাপ এবং স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছ? এত বৎসরের সাধনের পর যদি বলিতে হয় আমরা ঈশ্বরের আদেশ শুনি নাই, তবে এতকাল আমরা কি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, না, আপনার কথা ঈশ্বরের কথা বলিয়া বিশ্বাস করিতেছিলাম? যদি ঈশ্বরের কথা শুনিয়া আমরা তাঁহার সত্য ঘোষণা করিয়া থাকি, তবে আমাদের ভয় কি? পৃথিবীর পাপ অন্ধকার, বিঘ্ন বিপদ দেখিয়া যে ভীত হয় সে কাপুরুষ। পরিত্রাণার্থী হইয়া যখন কাতর প্রাণে ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়াছ, সাধকগণ, তখন কি তাঁহার এক একটী জ্বলন্ত কথা শুনিয়া তোমাদের নিতান্ত নিরাশ এবং অবসন্ন মন উত্তেজিত হয় নাই? ব্রাহ্মগণ, বিপদের সময় তোমাদের প্রত্যেককে দেখিতে হইবে, ঈশ্বরের কথা স্পষ্টরূপে শ্রবণ করা হইয়াছে কি না? তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া তোমাদের অন্তর বিমোহিত হইয়াছে, এবং তোমাদের প্রাণের গভীর পাপ তাপ দূর হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাকে দেখিলেই সকল হইল না, তাঁহার মুখ-নিঃসৃত এক একটী অগ্নিময়, উৎসাহকর এবং সুমিষ্ট কথা শুনিয়া চিরকাল নির্ভয়ে তাঁহার সেবা করিতে হইবে। তাঁহার মুখের এক একটী কথা অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় অন্তরের এবং চারিদিকের সমুদয় পাপ অন্ধকার দগ্ধ করিবে।

যদি ঈশ্বরের কথা শুনিতে পাই, তবে ঘোরতর পরীক্ষার অগ্নিও আমাদিগকে দগ্ধ করিতে পারে না। পরীক্ষাতে বরং অন্তরের উৎসাহ, বল আরও বৃদ্ধি হইতে থাকে। তাঁহার

কথা শুনিয়া যদি স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিবার জন্য প্রাণ দান করিতে পারি, তাহা হইলে অবশ্যই আমরা মৃত্যুশয্যায় বলিব, ঈশ্বর ধন্য তুমি! আমাদের এই অনিত্য জীবনে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইল। "যা হবার তাই হবে, যায় প্রাণ যাবে, তব ইচ্ছা পূর্ণ হোক এ জীবনে।" "যায় যদি যাক্ এ প্রাণ তোমার কর্ম্ম সাধনে," এ সমুদয় বীরবাক্য বলিয়া যাঁহারা ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তার করিবার জন্য প্রাণ দান করেন তাঁহাদের কত সৌভাগ্য! ঘোর বিঘ্ন বিপদের মধ্যে সাধকেরা কেবল তাঁহাদের বিশ্বাসকর্ণে ঈশ্বরের অগ্নিময় কথা সকল শুনিয়া আপনাদিগকে রক্ষা করেন। ঈশ্বর সর্ব্বদাই তাঁহার বিশ্বাসীদিগকে বলিতেছেন;—"নির্ভয়ে তোমরা আমার আদেশ পালন কর, অগ্নি তোমাদিগকে দগ্ধ করিতে পারিবে না, এবং কোন রিপুই তোমাদিগকে বধ করিতে পারিবে না।" ঈশ্বরের সত্যধর্ম্মের বিরুদ্ধে, ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে এবং আমাদের আপনাদের চরিত্রের বিরুদ্ধে অনেক কথা শুনিলাম; কিন্তু ব্রাহ্মগণ, তোমাদের মধ্যে কি কেহই শুন নাই যে, ঈশ্বর মেদিনী এবং ব্রহ্মাণ্ড কাঁপাইয়া বলিতেছেন, সত্যের জয় হইবেই হইবে, এবং তাঁহার প্রেমরাজ্য নিশ্চয়ই আসিবে। যদি ঈশ্বর যথার্থই তাঁহার প্রেম-পরিবার স্থাপন করিবেন মানস করিয়া থাকেন, তবে কাহার সাধ্য তাঁহার কার্য্যে বাধা দিতে পারে? জগতের সমুদয় লোক বদ্ধপরিকর হইয়া তাঁহার বিরোধী হইলেও তাহাদের চেষ্টা বিফল হইবে; কেন না ঈশ্বরের ইচ্ছার জয় হইবেই হইবে।

আমরা কি বিশ্বাস করি, দয়াময় ঈশ্বর আমাদের নিকটে আছেন, ডাকিলেই দেখা দেন, এবং কাতর প্রাণে প্রার্থনা করিলেই

তিনি প্রার্থীর সঙ্গে কথা কহিয়া তাহার উত্তর দান করেন? যদি ঈশ্বরের প্রেমমুখের অভয়প্রদ কথা না শুনিয়া থাকি, তবে এতদিন কি আমরা নিদ্রিত ছিলাম? ব্রাহ্মসমাজের চল্লিশ বৎসরের ঘটনাবলী উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে ঈশ্বরের ব্যাপার স্বপ্ন নহে। বিশ্বাস-চক্ষু খুলিয়া দেখ, এ সমুদয় ব্যাপার ঈশ্বরের সত্যজ্যোতি এবং প্রেম-জ্যোৎস্না প্রকাশ করিতেছে। যাহারা অবিশ্বাসী তাহারাই কেবল নিরাশার কথা শুনিয়া ভীত হয়। অমুক ব্যক্তি যত্নশীল হইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিল, আবার কেন সে ঘোর বিষয়ী হইল? অমুক ব্যক্তির অন্তরে যে কত প্রকার সাধুতা-পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, শীঘ্রই কেন সে সমুদয় মলিন হইয়া গেল? অল্পবিশ্বাসীদিগের মুখে কেবলই এ সকল ভয়ের কথা শুনিতে পাইবে। কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরের মুখের আশা-শাস্ত্র পড়িতে শিখিয়াছেন, এই ঘোর বিঘ্নময় সংসারে তাঁহাদের কিছুমাত্র ভয় ভাবনা নাই। কেন না তাঁহারা সর্ব্বদাই এই স্বর্গীয় বাক্য শুনিতেছেন "সত্যমেব জয়তে"। যাঁহারা এই অভয়মন্ত্রে দীক্ষিত, তাঁহাদের আর ভয় ভাবনা কি? প্রকাণ্ড দাবানলেও যদি তাঁহারা পতিত হন, তথাপি তাঁহাদের কিছুমাত্র দগ্ধ হয় না। সম্পদে, বিপদে, সুখে, দুঃখে সকল অবস্থাতেই তাঁহারা অভয়দাতা ঈশ্বরের আশ্রয়ে আশ্রিত। ঈশ্বরের নিকট তাঁহারা চিরজীবনের মত অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া দিয়াছেন; তাহাতে এই লেখা আছে—"তুমি উপাস্য, আমি উপাসক; তুমি গুরু, আমি শিষ্য; তুমি রাজা, আমি প্রজা; তুমি প্রভু, আমি ভৃত্য; তুমি পিতা, আমি সন্তান।" ঈশ্বরও তাঁহাদিগকে এই কথা বলিয়াছেন—"সন্তানগণ, তোমরা অমর হইয়া আমার এই ধর্ম্ম সাধন কর।"

এই অঙ্গীকার পত্রে যাঁহারা একবার স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহারা কি আবার পাপে পতিত হইয়া সুখী হইতে পারেন? প্রেম-পরিবারে বদ্ধ হইয়া যাঁহারা একবার ইহার পবিত্র শান্তি আস্বাদ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই স্বর্গীয় প্রেমনদী পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে থাকা অসম্ভব। ঈশ্বর তাঁহাদিগকে পাপ হইতে উদ্ধার করিয়া, তাঁহার পবিত্র গৃহে পুনরানয়ন করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত; এবং তাঁহার প্রেমিক ভক্তেরাও তাঁহাদের শুভাগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস, বিপথগামী ভ্রাতারা নিশ্চয়ই পিতার গৃহে ফিরিয়া আসিবেন। বাস্তবিক তাঁহাদিগকে আসিতেই হইবে। তাহা না হইলে তাঁহাদের অধোগতি হইবে। ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার অচেতন সন্তানদিগকে জাগাইয়া দিবেন, এবং মৃতদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিবেন। আমাদের নিজের নয়, কিন্তু তাঁহার মন্ত্রের বলে আমরা সকলেই বাঁচিয়া যাইব। দয়াময় ঈশ্বরের রাজ্যে পাপের গরল, এবং বিষয়-লালসা কাহাকেও বধ করিতে পারিবে না। পৃথিবীর অগ্নি আমাদিগকে দগ্ধ করিতে পারে না। সংসার-সাগরের প্রকাণ্ড ঢেউ ব্রহ্মসন্তানকে ডুবাইতে পারে না। ইহা অভ্রান্ত সত্য যে, ঈশ্বরের আশ্রিত সন্তানের কিছুতেই মৃত্যু নাই। অতএব এই কথা কাহারও মুখে শুনিতে চাই না যে, কিছুদিন প্রেমের পবিত্র-সাগরে নিমগ্ন থাকিয়া আবার আমরা তাহা ছাড়িয়া বাঁচিতে পারি। একবার যথার্থ ঈশ্বরের প্রেমামৃত পানে অমর হইয়া আবার পাপবিষ পান করিয়া সুখী হইতে পারি, যে এই ভয়ে ভীত হয়, ঈশ্বর স্বয়ং সেই ভীরু সন্তানের প্রত্যেক কথার প্রতিবাদ করেন। ব্রাহ্মগণ, অতএব তোমাদিগকে বারম্বার বলিতেছি

যদি তোমরা একবার পিতার প্রেমরস পান করিয়া অমরত্বের আস্বাদ পাইয়া থাক, তাহা হইলে আর তোমাদের ভয় নাই। এক্ষণে তোমরা সকলে একত্র হইয়া এবং নির্জনে ঈশ্বরের চরণতলে বসিয়া এই কথা বল,—"পিতা, এই যে আমরা তোমার চরণতলে আমাদের মস্তক রাখিলাম, আর পুনর্ব্বার ইহা উত্তোলন করিতে পারিব না, তুমি আশীর্ব্বাদ কর, চিরকাল যেন ইহা ঐ স্থানে থাকিয়া শীতল এবং পবিত্র থাকে।"

বন্ধুগণ, তোমাদের মধ্যে কে কে এই চির-দাসত্ব-পত্রে নাম দিতে প্রস্তুত? ঈশ্বর যদি জানিতে চাহেন,—এবং কে বলিল তিনি জানিতে চাহেন না—এই উপাসকদিগের মধ্যে কে কে চিরকাল তাঁহারই পূজা এবং সেবায় নিযুক্ত থাকিবে—তাহা হইলে তোমাদের মধ্যে কয়জন সাহস করিয়া এই অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করিতে পার? ঈশ্বরের প্রেমমুখ কি তোমরা দেখ নাই? দুই মিনিট ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য দেখিলে প্রাণ তাঁহার প্রেমে উন্মত্ত হয় না, কোন্ সাধক এই কথা বলিতে পারে? ঈশ্বরকে দেখিয়া যদি প্রাণ গূঢ়রূপে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত না হয়, তাহা হইলে সেই ঈশ্বর যথার্থ ঈশ্বর নহেন, অথবা সেই সাধক যথার্থ ঈশ্বর-সন্তান নহেন। ঈশ্বরের মুখ দেখিলে কি কেহ মোহিত না হইয়া থাকিতে পারে, না তাঁহাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিতে পারে? যিনি একবার ঈশ্বরের প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়াছেন, সংসার কি আর তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে? অতএব বন্ধুগণ, জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের মধ্যে কে কে অনন্তকালের জন্য এই নিত্যধর্ম্মের যাত্রী, কয়জন বলিতে পার আমরা কখনই ঈশ্বর এবং ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িব না? যদি বুঝিয়া থাক তিনি

ভিন্ন আর গতি নাই, তবে এখনই মনুষ্যের নিকটে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের নিকট চির-দাসত্ব-ব্রতের অঙ্গীকার পত্রে নাম লিখিয়া দাও। এবং বর্ত্তমান বিধানের সমস্ত নূতনতা এই কথার মধ্যে। যিনি এই নিত্য-ব্রতের ব্রতী হইবেন অঙ্গীকার করিয়া এই পত্রে স্বাক্ষর করিবেন, তিনিই এবার অমরত্ব এবং অভয়পদ লাভ করিবেন। হে ঈশ্বর, স্বপ্ন আর দেখিব না। বিচ্ছেদ যেখানে নাই, যেখানে আজ উল্লাস কল্য বিষাদ, সেখানে আর থাকিব না। যাহারা আজ ব্রাহ্মসমাজে আছে, কিন্তু কাল পলায়ন করিবে, তাহাদিগকে চাহি না। পৃথিবীর মমতায় আর ভুলিব না। পৃথিবী কলঙ্ক দিতে চায়, দিক। পৃথিবী, দূর হও, নানা প্রকার মোহিনী শক্তি দেখাইয়া তুমি জগৎকে ভুলাইয়া রাখিয়াছ। ধিক্ তোমার মায়াজাল!

এ কি ভয়ানক ব্যাপার, পৃথিবীতে কেবলই পরিবর্ত্তন! কাল যাঁহারা বন্ধু ছিলেন, আজ তাঁহারা পরস্পরের শত্রু হইলেন। এখন সেই রাজ্যে যাইব, যেখানে পরিবর্ত্তন নাই। সেখানে দুটী ভাই কিম্বা দুটী ভগ্নী যাঁহারা একবার ঈশ্বরের চরণতলে বসিয়া ঐ অঙ্গীকার পত্রে নাম লিখিয়া দিয়াছেন, আর তাঁহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না। যদি আমরা দুই পাঁচজন এইরূপে চিরকালের সম্পর্কে সম্বদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের আশ্রয়ে থাকিতে পারি, তাহা হইলে জয় ব্রহ্মের জয় বলিয়া আনন্দ মনে তাঁহার স্বর্গরাজ্য বিস্তার করিতে পারিব। ঈশ্বরের দয়াময় নাম মহামন্ত্র গ্রহণ করিয়া আমরা বাঁচিয়া যাইব। ঈশ্বর আমাদের সহায়, তাঁহারই সাহায্যে আমরা তাঁহার নিত্যধামে বাস করিব। আর পরিবর্ত্তনের রাজ্যে থাকিব না। আজ উৎসবের উন্মত্ততা, কল্য

ভয়ানক অবসন্নতা, আজ অগ্নিময় উৎসাহ, কল্য ভয়ানক নিরাশা এবং শিথিলতা, ব্রাহ্মজীবনে আর এ সকল পরিবর্ত্তন সহ্য করা যায় না। যদি নিত্য সুখে সুখী হইবে, তবে বন্ধুগণ, আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্র ঈশ্বরের নিকটে তাঁহার প্রতি চির-দাসত্ব-ব্রতের অঙ্গীকার পত্রে নাম লিখিয়া দাও। নিত্যধামে চল, সেখানে অভয়দাতা ঈশ্বরকে লাভ করিয়া, আমরা সকলে ভয় মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইব।

হে প্রেমসিন্ধু কৃপাময় পরমেশ্বর, তোমার কথা শুনিয়াছি, তোমার কথা মানিব। পিতা, তুমি আমাদিগকে যে পথে লইয়া যাইতেছ, ইহাতে রাশি রাশি বিঘ্ন বিপদ আমাদিগকে আক্রমণ করিবে; কিন্তু যাঁহারা কিছুতেই তোমাকে ছাড়িতে পারিবেন না তাঁহাদিগের মধ্যে আমাদিগকে পরিগণিত কর। যে তোমার কথা শুনিতে পায় না সেই ব্যক্তিই মৃত্যুকে ভয় করে। তুমি আমাদিগকে প্রাণের পথে, অমরত্বের পথে রক্ষা করিতেছ, তুমি নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত কর। এই ব্রহ্মমন্দিরে তুমি বর্ত্তমান থাকিয়া দুঃখীদের কথা শুনিতেছ। পিতা, সেই প্রেম শিক্ষা দাও, যাহা চিরদিন রক্ষা করিতে পারিব। অনন্ত প্রেমসাগরে, অনন্ত পুণ্যসিন্ধুতে নিমগ্ন করিয়া আমাদিগকে সুখী কর; তোমার নূতন বিধান, তোমার নূতন অঙ্গীকার পত্র দেখাইয়া দাও। তুমি আমাদিগকে গোপনে এবং একত্রে ডাকিয়া, আর তাহাতে আমাদের কাহারও পতন না হয়, ইহার উপায় করিয়া দাও। প্রভু, অনেক দেখিয়া শুনিয়া এখন এই দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, নিত্য পরিবার ভিন্ন আর কিছুতেই আমাদের সুখ নাই, শান্তি নাই। দয়া করিয়া দীনবন্ধু, আমাদিগকে নিত্যপ্রেমের অধিকারী করিয়া আমাদের কাতর প্রার্থনা পূর্ণ কর।

বৈরাগীর গৃহ। *

রবিবার, ২৯শে ভাদ্র, ১৭৯৬ শক; ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

মনুষ্যের গতি হয় সংসারের দিকে নয় স্বর্গের দিকে। মধ্যে সুবিস্তীর্ণ পথ। দুই দিকে দুই গৃহ—সংসার এবং স্বর্গ। এই মধ্যবর্ত্তী সুদীর্ঘ পথে কোটী কোটী জীব ভ্রমণ করিতেছে। যাহারা সংসার-গৃহে বাস করে, এক দিকে ভাবিতে গেলে তাহাদিগকে নিরাশ্রয় বলিতে পারি না, কেন না সংসারে তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার সহস্র সহস্র উপায় রহিয়াছে। সংসারী ব্যক্তিরা দুঃখ পায় বটে—কোন্ সংসারী না দুঃখ পায়?—কিন্তু তথাপি তাহারা এক প্রকার সংসারের আশ্রয় পাইয়া সে স্থানে পড়িয়া আছে। সে স্থান তাহাদিগকে এমনই মোহিনীমূর্ত্তি দেখাইয়া ভুলাইয়া রাখিয়াছে যে, সহস্র বিপদে আক্রান্ত হইয়া সহস্রবার যন্ত্রণানলে দগ্ধ হইলেও তাহারা তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে না। তাহারা সেই ভূমির গুণে বশীভূত হইয়া বিষয়ের মধ্যে বাস করিতেছে। তাহাদের একটী আশ্রয়-ভূমি আছে ইহা তাহারা বিশ্বাস করে। বাস্তবিক সংসার আশ্রয়-ভূমি কি না, তাহা ভূমি না সাগর এ বিষয়ে মতভেদ হইবে; কিন্তু সংসারীরা বিশ্বাস করে যে সংসার তাহাদের আশ্রয়-ভূমি। এইরূপে যতদিন বিষয় ভোগীরা বিষয়ের সুখে মত্ত থাকে, ততদিন সংসার যে বিপদপূর্ণ ভয়ানক স্থান তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। কিন্তু যখনই ঈশ্বরের বিশেষ কৃপাবলে তাহাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর হয়, তখন এক নিমেষের মধ্যে "সংসার, তুমি দূর হও"—এই বলিয়া অনায়াসে সংসার পরিত্যাগ করে এবং ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ়

প্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া প্রেমরাজ্যের দিকে চলিয়া যায়। যে স্থানে মাতৃভূমি সেখানেও যদি সুখ শান্তি না পাওয়া যায়, মনুষ্য সেই সংসারের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া চলিয়া যায়; এই কারণে লক্ষ লক্ষ লোক সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে অতি অল্প লোক স্বর্গের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহারা সকলেই চলিতেছে ইহা ঠিক; কিন্তু তাহারা ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে, কেহ কেহ সংসার ছাড়িয়া অনেক দূর চলিয়া যাইতেছে; কিন্তু দুরন্ত সংসারের বিস্তৃত শৃঙ্খল আবার তাহাদিগকে টানিয়া আনিতেছে। সুতরাং একবার সংসারের প্রতি বিমুখ হইয়াও আবার তাহারা সংসারের অভিমুখে যাইতেছে।

যাহারা সংসার ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল, সেই সমুদয় লোক আবার সংসারে আসিয়া উপস্থিত। চৈতন্যের ন্যায় সংসার ছাড়িয়া কেহ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, তখন যে কেবল তাহার পিতা মাতা এবং নিতান্ত আত্মীয় বন্ধুরা ক্রন্দন করে তাহা নহে; কিন্তু তাহার জন্য সংসার কাঁদে। সংসারের লোকদিগের নিকট একজন বৈরাগী হইয়াছে ইহা বলিবা মাত্র, তাহার জন্য তাহারা ক্রন্দন করে। সুতরাং যখন তাহাদের মধ্যে কেহ আবার সংসারে ফিরিয়া আসে তখন সকলের মুখে আর হাস্য ধরে না। তখন সেই ব্যক্তিকে সংসারের লোকেরা কোলাহল করিয়া এই কথা বলে,—"সেই ত তোমাকে বলিয়াছিলাম, সংসার ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না, পথের পথিক হইয়া কেন কষ্ট পাইবে। এখন দেখিলে ত সংসার ছাড়িয়া আর কোথাও সুখ পাইলে না।" বাস্তবিক সংসার সর্ব্বদাই প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে কখন্ কোন্

বিষয়ত্যাগী সন্ন্যাসী-সন্তান আবার ফিরিয়া আসিবে? কত সন্তান সংসার ছাড়িল, এবং আবার ফিরিয়া আসিল, কেবল অল্প সংখ্যক ক্রমাগত ঘোর অন্ধকার এবং বিপদের মধ্য দিয়াও চলিতেছে। স্বর্গের পথিক যাহারা হইয়াছে, সহস্র বৎসর বিলম্ব তাহাদের নিকট কিছুই নহে। কেন না স্বর্গের গৃহে একদিন উপনীত হইবই হইব, এই বিষয়ে যাঁহাদের অন্তরে গভীর বিশ্বাস আছে তাঁহাদের আর ভয় ভাবনার সম্ভাবনা কি? কিন্তু যতদিন ইহাঁরা পথে থাকিবেন ততদিন ইহাঁদিগকে পথের পথিক বলিতেই হইবে। যদিও ইহাঁদের মধ্যে অনেকেই মহা জ্ঞানবান, বুদ্ধিমান এবং প্রগাঢ় বিশ্বাসী ও ভক্ত; এবং যদিও ইহাঁদের উপাসনার জীবন্ত ভাবে জগতের লোক মোহিত হয়, তথাপি ইহাঁরা কি পথের পথিক নহেন? সত্য বটে ইহাঁরা ঈশ্বর-প্রদত্ত যে আলোক পাইয়াছেন, তাহা দেখিয়া ঘোর অন্ধকার মধ্যেও ক্রমাগত চলিয়া যাইতেছেন, কিন্তু অদ্যাবধি ইহাঁরা একটী গৃহ, একটী আশ্রয় স্থান পান নাই।

ইহাঁরা ঈশ্বরকে অন্বেষণ করিতেছেন, সংসার-পরায়ণ নহেন ইহা যথার্থ; কিন্তু যেমন সংসারের গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেইরূপ আর একটী গৃহবাসী হইতে পারেন নাই। যদি তাঁহারা বসেন, পথে বসেন; যদি আহার করেন, তাঁহাদিগকে পথেই আহার করিতে হয়। যদি তৃষ্ণা হয়, পথের সরোবর হইতে জল পান করেন। পথিকদিগের কত কষ্ট, আবার সম্মুখে অধিক পথ রহিয়াছে, ইহা যখন তাহারা দেখিতে পায়, তখন তাহাদের হৃদয় কেমন ব্যথিত ও অবসন্ন হয়। এমন কি পথিক নাই— এখনও গম্য স্থান লব্ধ হইল না—ইহা বলিতে বলিতে সহজে

যাহার মন অবসন্ন হয়? ইহা হইতে পারে বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় বসিয়া পথিক শত বৎসরের যন্ত্রণা ভুলিয়া যায়; কিন্তু মানিতে হইবে, তথাপি সে পথিক। যদিও সে ব্যক্তি তখন সমুদয় যন্ত্রণা ভুলিয়া যায়; কিন্তু তাহার মনে যদি হঠাৎ এই প্রশ্ন হয়, যদি এই স্থানেই মৃত্যু হয়, তবে আমার কি গতি হইবে? না দেখিলাম পিতা মাতার মুখ, না দেখিলাম ভ্রাতা ভগ্নীর মুখ। সেইরূপ পথের মধ্যে আমরা ধর্ম্ম সাধন করিতেছি। প্রতিদিন ঈশ্বরের উপাসনা এবং তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করিতেছি, এবং একদিন পিতার প্রেমগৃহে উপস্থিত হইয়া সুখী হইব, এই আশা আছে ইহা সত্য; কিন্তু ব্রাহ্মগণ, জিজ্ঞাসা করি, যদি সেই গৃহে উপস্থিত না হইতেই মৃত্যু হয়, যদি প্রলোভন দুর্জ্জয় হইয়া একদিন আমাদিগকে পাপে আচ্ছন্ন এবং অবসন্ন করিয়া বধ করে, আমাদের কি উপায় হইবে? ঔষধ সেবন করিবার পূর্ব্বেই যদি মৃত্যু হয়, তবে আর কি হইল? অতএব বলিতেছি ব্রাহ্ম পথিকগণ, আর বিলম্ব করিও না। আর পথে থাকিও না, ত্বরায় পিতার গৃহে চল।

ব্রাহ্মগণ, তোমরা অনেক উচ্চ অবস্থায় আসিয়াছ যথার্থ বটে; কিন্তু সংসারের লোকদের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিলে তোমরা কি আপনাদিগকে গৃহবিহীন এবং নিরাশ্রয় মনে কর না? তোমাদের সম্মুখে পিতার সুন্দর গৃহ রহিয়াছে; কিন্তু তোমরা যে অদ্যাবধি তাহা পাইলে না। পথে মৃত্যু যে কত ভয়ানক তাহা কি তোমরা শুন নাই? ঘোর মৃত্যু যন্ত্রণার সময়েও যদি মনে হয় আমি গৃহে আছি, প্রাণের মধ্যে কত আরাম বোধ হয়। ব্রাহ্ম পথিকগণ, অতএব তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি,

চিরকাল পথিক সহবাসই কি তোমাদের জীবন সর্ব্বস্ব হইবে? পাঁচজন পথের পথিক হইয়া চলিতেছ, কখন কি বিপদ ঘটে কিছুই জান না। কতকাল পরে স্বর্গে গমন করিয়া সুখী হইবে? পথের পথিক হইয়া কে চিরকাল থাকিতে পারে? গৃহ লাভ হইল না বলিয়াই অধিকাংশ ব্রাহ্ম স্বর্গে প্রবেশ করা কিম্বা স্বর্গের নিকটবর্ত্তী হওয়া দূরে থাকুক, বরং সংসারের দিকেই পুনর্গমন করিতেছে। আমরাও আবার সংসারে ফিরিব না কে বলিল? এইজন্য বলিতেছি, বন্ধুগণ, তোমাদের মধ্যে আর কেহই পথিক হইয়া থাকিও না। এখনই তাঁহার নাম গ্রহণ করিলে সেই স্বর্গের গৃহে প্রবেশ করিয়া সুখী হইতে পারিবে। সেই যে ব্রহ্মভক্তদিগের ঘর সেখানে না গেলে আমাদের মৃত্যু। ঈশ্বর আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন এইজন্য যে আমরা তাঁহার গৃহে বাস করিব। এতদিনের সাধন ভজন, এত বৎসরের উপাসনা এবং ঈশ্বর-সেবা কি আমাদিগকে সেই চিরস্থায়ী অনন্তকালের স্বর্গরাজ্যের দিকে উন্মুখ করিতে পারে নাই? সমুদয় সাধনের উদ্দেশ্য এই যে আমাদিগকে সংসার ছাড়াইয়া ঈশ্বরের দিকে, ধর্ম্মের দিকে লইয়া যাইবে এবং সমুদয় ভ্রাতায় মিলিত হইয়া উপাসনার মধুরতা আস্বাদ করিব।

আমরা এই দেশের বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। যথার্থ ব্রাহ্মসমাজকে কে কলঙ্কিত করিতে পারে? তুমি কি ব্রহ্ম-সন্তানদিগকে ঈশ্বরের নিকট লইয়া আসিয়াছ, না ইহাঁদিগকে কেবল সংসার ছাড়াইয়া পথের পথিক করিয়া রাখিয়াছ? কবে কার মৃত্যু হইবে চিরকালই ইহা মনুষ্যের নিকট অনিশ্চিত থাকিবে। কেন না ইহা তাহার পরিত্রাণের পক্ষে আবশ্যক। যিনি বলেন মৃত্যু কবে হইবে

জানি না, তিনি ঈশ্বরের কথা বলেন ; কিন্তু বাঁচিব কবে যিনি বলিতে পারেন না, তিনি জীবিত থাকিতেও মৃত। যাহার মৃত্যু এবং নবজীবনের দিন দুইই অন্ধকারে আচ্ছন্ন, সে অনন্ত জীবনের দিকে যায় নাই ; কেন না পরিত্রাণের পক্ষে মৃত্যুর দিন না জানা এবং জীবনের দিন জানা উভয়ই নিতান্ত আবশ্যক। যিনি অনন্ত জীবনের জন্য লালায়িত, তিনি জানেন, আর এই জঘন্য নীচ মলিন সংসারের ঘরে থাকিতে হইবে না ; কিন্তু স্বর্গরাজ্যে গিয়া কল্য সেখানকার সূর্য্য দেখিব। যাঁহারা পথশ্রান্ত হইয়াছেন তাঁহারা সেই গৃহে যাইয়া সুখী হইবেন। যেখানেই হউক উপাসনা করিলেই হইল যাহারা এই কথা বলে তাহারা পথের পথিক, তাহারা সেই গৃহে প্রবেশ করিতে পারে নাই। তাহারা আবার সংসারের পদাশ্রয় গ্রহণ করিয়া সংসারের পূজা করিতে পারে। কিন্তু যিনি যথার্থ ব্রাহ্ম তাঁহার সাধ্য নাই যে তিনি পথ হইতে আবার সংসারে ফিরিয়া যাইতে পারেন। প্রকৃত ব্রাহ্ম ইহা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারেন অমুক শুভক্ষণে আমার পরিত্রাণ। যাহারা পরিত্রাণার্থী নহে, তাহারা কিছুদিন উৎসাহের সহিত ধর্ম্ম সাধন করিয়া, আবার শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে অস্ত্রাঘাত করিয়া সংসারের দিকে ফিরিয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসীদিগের পক্ষে সংসারে ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব। যাঁহারা স্বর্গের ঘর অন্বেষণ করিতেছেন, থাকে থাকুক প্রাণ, যায় প্রাণ যাক, স্বর্গের ঘরে যাইবই, এই তাঁহাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। অতএব স্বর্গের ঘর যদি তোমরা পাঁচজন অন্বেষণ করিয়া থাক নিশ্চয়ই তোমরা সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া সুখী হইবে।

পথের মধ্যে পথিক ভাইদের ম্লান মুখ দেখিয়া অত্যন্ত কষ্ট

পাইয়াছি। এবার পিতার গৃহে ভাইদের সঙ্গে মিলন করিয়া সুখী হইব। স্বর্গের নিত্যধামে এবার ভাইদের সঙ্গে আলাপ করিয়া বহু-কালের মনের দুঃখ দূর করিব। বন্ধুদিগকে ঈশ্বরের আরামপূর্ণ গৃহে দেখিয়া আনন্দিত হইব। সেই গৃহে স্বয়ং ঈশ্বর ভাণ্ডারী হইয়া রত্ন সকল বাহির করিয়া দিতেছেন। ব্রাহ্মগণ, এতদিন তোমরা পথের মধ্যে নাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছ। দুঃখের সহিত বলিতেছি এই ব্রহ্মমন্দিরও তোমাদের নিকট পান্থশালার মত পথের মন্দির হইয়া রহিয়াছে। কেবল সপ্তাহের মধ্যে রবিবার একদিন পরস্পরের সঙ্গে দেখা হয়। কিন্তু বন্ধুগণ, আর কতদিন পরে তোমাদের সঙ্গে পথের মধ্যে দেখা হইবে না? আমরা চিরকাল যাহাতে বাঁচিয়া থাকিতে পারি এইজন্য ঈশ্বর দুঃখীদের প্রতি বিশেষ অনুকূল হইয়া আমাদিগের জন্য নিত্যধাম নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন, ভ্রাতৃগণ! চল, সেই উপাসকদিগের যথার্থ অনন্তকালের গৃহে যাইয়া আমরা নির্ভয় এবং নিরাপদ হই। আর ক্ষণকালের জন্য প্রণয় স্থাপন করিয়া কেহই নিশ্চিন্ত থাকিও না। এবার সেই নিত্যধামে যাইয়া—যেখানে নিত্য প্রেম, নিত্য শান্তি বিরাজ করিতেছে—পিতা এবং ভ্রাতা ভগ্নীদিগের সঙ্গে অনন্তকালের সম্পর্ক সাধন করিতে হইবে। প্রাণান্তেও আর পিতাকে ছাড়িতে পারিব না। তাহা হইলে ব্রাহ্মের পতন হইল এ সংবাদ অসম্ভব হইবে। যেখানে গেলে মন দিন দিন ভক্ত এবং প্রেমিক হইবে, চরিত্র দিন দিন নির্ম্মল হইবে, এবং পাপ যন্ত্রণা সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হইবে, ত্বরায় দয়াময়ের সেই নিত্য পুণ্যালয়ে চল। সেই গৃহে তুমি আমাকে শাসন করিবে, আমি তোমাকে শাসন করিব। যে ঈশ্বর আমাদের অন্তরে সুমতি দিয়া থাকেন তিনিই সেই গৃহে

আমাদের নেতা হইবেন। তাঁহার আশীর্ব্বাদে এবার আমরা তাঁহার নিত্য পরিবার-বদ্ধ হইয়া নিত্য ব্রহ্মমন্দিরে তাঁহাকে দেখিয়া সুখী হইব। পিতা দয়া করিয়া এই দুঃখী সন্তানদিগকে লইয়া তাঁহার চিরসুখী পরিবার সংগঠন করুন! এইজন্য আমরা কাতর প্রাণে তাঁহার কাছে বল প্রার্থনা করি।

হে কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু পরমেশ্বর! এবার এরূপ উপায় কর যাহাতে চিরকালের জন্য বন্ধু বান্ধবদিগকে সঙ্গে লইয়া অনন্ত ব্রতে ব্রতী হইয়া নিত্য তোমার আদেশ পালন করি। এবার তোমার উপাসকদিগকে তোমার নিত্য প্রেম শান্তি গৃহে লইয়া যাইবে এই আশা দিয়াছ। এই আশা পূর্ণ হইল দেখিয়া যাহাতে এই আনন্দ পরলোকে লইয়া যাইতে পারি এই আশীর্ব্বাদ কর। যেখানে তোমার নিত্যকালের বৈরাগী, সন্ন্যাসী সাধকেরা বাস করিতেছেন সেই গৃহে লইয়া গিয়া, দুঃখী, দুর্ব্বল, অবসন্ন, পরিশ্রান্ত পথিকদিগকে আরাম শান্তি দাও। তুমি আশীর্ব্বাদ করিলে ব্রাহ্মদিগের এত দিনের আশা পূর্ণ হইবে।

ঈশ্বর-দর্শন।

রবিবার ৫ই আশ্বিন; ১৭৯৬ শক; ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

পরব্রহ্ম অনন্ত, অপরিমিত; কিন্তু তাঁহার দর্শন পরিমিত। পরমেশ্বর নিত্য এবং পূর্ণ; কিন্তু তাঁহার দর্শন উন্নতিশীল এবং অপূর্ণ। সূর্য্য অতি প্রকাণ্ড; কিন্তু তাহার জ্যোতি কতদূর আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হয়? সমুদ্র অপার, অতলস্পর্শ, কিন্তু আমরা ইহার

যতটুকু স্থানে অবগাহন করি তাহা কত অল্প? বস্তুর যে অংশ বিধৃত কিম্বা উপলব্ধ হয়, তাহা দ্বারা উহার পরিমাণ হয় না। ঈশ্বরের পরিমাণ কোথায়? আমাদের অপরিমিত পরমেশ্বর অনন্ত সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ভূলোক দ্যুলোক সর্ব্বত্র তাঁহার মহিমা বিস্তার করিতেছেন; আমরা তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধকগণ কোথায় পড়িয়া আছি; কিন্তু আমাদের এত স্পর্দ্ধা এবং এত অহঙ্কার যে আমরা কি না বলিতেছি যে, আমরা এত বড় ঈশ্বরের দর্শন পাইয়াছি। শ্রেষ্ঠতম সাধক ভক্ত ঋষিদিগের কথা দূরে থাকুক, নীচতম, হীনতম ব্রাহ্মেরাও বলে, আমরা ঈশ্বরকে দেখিয়াছি। ঈশ্বরের তুলনায় আমরা কে? হীন ব্যক্তির রসনার এতদূর সাহস যে, সে কি না বলিতেছে, আমি ঈশ্বরকে দেখিয়াছি। সূর্য্যের ন্যায় প্রকাণ্ড নহে, পর্ব্বতের ন্যায় বৃহৎও নহে যে সেই ক্ষুদ্র মনুষ্য, সে বলিতেছে, ঈশ্বর যিনি অনন্ত, আমি তাঁহার সুবিমল প্রেমমুখ দেখিয়াছি। সে আরও এই কথা বলিতেছে, কেবল শাস্ত্রে কিম্বা অন্যের মুখে যে ঈশ্বরের কথা শুনিয়াছি তাহা নহে, কিন্তু আমি প্রতিদিন উপাসনার সময় তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। এই আমার ভক্তি-হস্ত তাঁহাকে ধারণ করে। ঈশ্বর অনন্ত, তাঁহাকে দেখিতেছি কি? অল্প পরিমাণে ঈশ্বরকে দেখা যায়। দর্শনের পরিমাণ আছে। দর্শনের উজ্জ্বলতা, নিগূঢ়তা, সুমিষ্টতা এবং পবিত্রতা সম্পর্কে চির-কালই তারতম্য থাকিবে; কিন্তু পূর্ণ পবিত্র ঈশ্বরে কোন পরিবর্ত্তন কিম্বা হ্রাস বৃদ্ধি নাই। তাঁহার প্রেম, কাল কম ছিল, আজ বৃদ্ধি হইল, ইহা হইতে পারে না। যখন সৃষ্টি হইল, তখনও তিনি যেমন ছিলেন, এখনও তিনি তেমনই রহিয়াছেন। জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, শান্তি

প্রভৃতি তাঁহার সমুদয় গুণই অনন্ত। কিন্তু সাধকের দর্শনের মধ্যে পরিমাণ আছে।

অধিক অন্ধকার মধ্যে যদি অল্প আলোক দেখিয়া থাক তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, ঘোর অবিশ্বাসের মধ্যে হঠাৎ বিদ্যুতের মত একবার ঈশ্বর-দর্শন কেমন আশ্চর্য্য। প্রথম হইতে তুমি পঞ্চাশ বৎসর যে সমানভাবে ঈশ্বরকে দেখিবে তাহা বিশ্বাস করিও না। পঞ্চাশ বৎসর পরে তোমার ঈশ্বর-দর্শন যে কত উজ্জ্বলতর, গভীরতর এবং মিষ্টতর হইবে তাহা তুমি কল্পনাও করিতে পার না। তাহার তুলনায় তুমি যে দিন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, সে দিন ব্রহ্ম-দর্শন হইয়াছিল কি না সন্দেহ। কিন্তু আজ তোমার ব্রহ্ম-দর্শন কত উজ্জ্বলতর। তখনকার দর্শন আর এখনকার দর্শনে কত প্রভেদ! তখনকার দর্শন বোধ হয় যেন ঘোরান্ধকার মধ্যে একটী অতি সামান্য ক্ষুদ্রতম প্রদীপ জ্বলিয়া ছিল। তেজের তেমন স্ফূর্ত্তি ছিল না। পাপ কুসংস্কারে অন্ধীভূত চক্ষুর নিকটে ঈশ্বরের পবিত্র জ্যোতি প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই প্রকার দর্শনে কি আর এখন তৃপ্তি হয়? যতই অধিক পরিমাণে বিশ্বাস প্রগাঢ় এবং ভক্তি-নয়ন বিস্তারিত হইবে, ততই তাঁহাকে উজ্জ্বলতররূপে দেখিতে পাইব। এখন যে ঈশ্বর-দর্শন লাভ করিতেছি, তাহা প্রাতঃকালের অরুণোদয়ের ন্যায় সামান্য উজ্জ্বল। কিন্তু যতই আমাদের সাধনের উন্নতি হইবে, ততই আমরা ঈশ্বরকে দ্বিপ্রহরের সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল দেখিব। সেই সূর্য্য একই স্থানে সমানভাবে রহিয়াছে, কিন্তু দর্শকদিগের স্থানের ভিন্নতা অনুসারে, সূর্য্যের উজ্জ্বলতা কম বেশী প্রকাশ পাইতেছে। সেইরূপ সাধকদিগের ধারণাশক্তির তারতম্যানুসারে সেই একই সত্য এবং প্রেম-সূর্য্য

তাঁহাদের নিকট ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হন। অতএব, শ্রেষ্ঠতম সাধকগণ, তোমাদিগকে আনন্দের সহিত বলিতেছি, এখন তোমাদের মস্তকের উপর যে আলোক দেখিতেছ, ভবিষ্যতে যাহা দেখিবে, তাহার তুলনায় এই দ্বিপ্রহরের আলোকও অন্ধকার বোধ হইবে। যখন এই উচ্চ আশা মনে করি, তখন বুঝি ব্রাহ্মধর্ম্ম কেমন মহৎ। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যে, দেবত্ব পাইবার আশা হইতেছে। ভবিষ্যতে কেবল দর্শনের উজ্জ্বলতা অধিক হইবে তাহা নহে; কিন্তু ইহার সরস ভাব ও মিষ্টতাও অধিক হইবে।

একদিন ঈশ্বরকে দেখিলাম, দেখিতে দেখিতে বলিলাম, আরও দেখা দাও, তৃষ্ণা এখনও পূর্ণ হয় নাই। এমন সুন্দর কে তুমি! আরও দেখা দাও। অনেকক্ষণ তাঁহাকে দেখিয়া পরে কার্য্যালয়ে চলিয়া গেলাম, আর একদিন দেখিলাম, আর ছাড়িতে পারিলাম না। দেখিয়া মোহিত হইলাম, অন্তর বাহির চারিদিক মধুময় হইল। দর্শনের কি সামান্য প্রতাপ? দর্শনে হৃদয় উদ্বেলিত হইল। সমস্ত আত্মা পরিবর্ত্তিত হইল। ব্রহ্ম-দর্শন দার্শনিকদিগের কিম্বা মনোবিজ্ঞানবিদ্‌দিগের শুষ্ক দর্শন নহে; কিন্তু বিশ্বাসী ভক্তদিগের সরস দর্শন। আগে পাঁচ মিনিট উপাসনা করিলেই ব্রাহ্মেরা তুষ্ট হইতেন; কিন্তু এখন তাঁহারা যতই পিতাকে দেখিতেছেন, ততই তাঁহাকে আরও দেখিবার জন্য লালায়িত হইতেছেন। পিতার সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহারা কেমন গূঢ়রূপে মুগ্ধ হইতেছেন, আমাদের কথা নাই, শব্দ নাই, যে তাহা ব্যক্ত করি। ব্রহ্ম-দর্শনে কত মিষ্টতা, কত সুধা, কত আনন্দ, তাহা কিরূপে প্রকাশ করিব? এই আনন্দ দিন দিন বৃদ্ধি হইবে; এবং এত গভীর হইবে যে সাধকের বাক্য-রোধ হইবে। ব্রাহ্মগণ,

তোমাদিগকে বলি, ভবিষ্যতে তোমরা ব্রহ্ম-দর্শনের যে আনন্দ পাইবে, তাহার তুলনায় এখনকার আনন্দ যন্ত্রণা বোধ হইবে। যাঁহারা উচ্চতর স্বর্গে বাস করেন, তাঁহারা আমাদের ব্রহ্ম-দর্শন দেখিয়া বলেন, কি ইহারা দেখিল যে, ইহারা উন্মত্ত হইয়া গেল? যথার্থ যে আনন্দময়ের দর্শন ইহারা ত তাহার কিছুই পায় নাই, তথাপি কেন ইহারা নগরের পথে পথে আনন্দে নৃত্য করিতেছে? যখন স্বর্গে যাইব, তখন মনে করিব, এককালে আমরা বাল্যক্রীড়ার সামান্য আনন্দ-রসকে সুখের মহাসমুদ্র মনে করিতাম।

বাস্তবিক যতই আমরা প্রেমসিন্ধু পিতার নিকটতর হইব, ততই আমরা সুধা হইতে অধিক সুধা লাভ করিব। আত্মার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্ম-দর্শনের উজ্জ্বলতা, মিষ্টতা, পুণ্যবল সকলই বৃদ্ধি হইবে। এখনও ব্রাহ্মেরা ঈশ্বরকে দেখিতেছেন, কিন্তু সেই দর্শনে যে এখনও তাঁহাদের কাম, ক্রোধ ইত্যাদি জঘন্য রিপু সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মূলিত হইল না, এখনও যে তাঁহাদের অন্তরের জঞ্জাল এবং পরস্পরের প্রতি অপ্রণয় বিনষ্ট হইল না; তাঁহাদের প্রেম যে পরস্পরের প্রতি উথলিয়া পড়িল না। লোভী কেন লোভশূন্য হইল না? স্বার্থপর ব্যক্তি কেন দয়ার্দ্র হইয়া সর্ব্বত্যাগী হইল না? ভীরু কেন মহাবীর হইল না? কেন পাপীদের পাপ-পাশ-শৃঙ্খল ছিন্ন হইল না? এখনও কেন সাধকেরা সম্পূর্ণরূপে পাপ বিমুক্ত হইলেন না? এখনও কেন সাধকেরা বীরের ন্যায় এই কথা বলিতে পারিলেন না, পাপরাক্ষসী, তুই দূর হ। এখনও ব্রাহ্মেরা ঈশ্বরের প্রেমে তেমন মুগ্ধ হইলেন না যে, পাপের সুখভোগেচ্ছাকে এইরূপ সাহসের সহিত অন্তর হইতে দূর করিয়া দিতে পারেন। এই মন্দিরে প্রতি রবিবারে কি দেখি? যে দিকে

নয়ন ফিরাই সেই দিকেই প্রাণেশ্বরের উজ্জ্বল মধুময় দর্শন। কিন্তু এই মন্দির ছাড়িয়া যখন সাধকগণ গৃহে ফিরিয়া যান, সেখানে সেই পাপ তাঁহাদিগকে প্রতীক্ষা করে।

ব্রহ্মকে একবার দেখিয়া যদি শীঘ্রই আবার তাঁহাকে ভুলিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে পাপ-রাক্ষসী নিশ্চয়ই আমাদিগকে গ্রাস করিবে। এইজন্যই আমি বারবার বলিতেছি, ব্রহ্ম-দর্শন উন্নতিশীল; ভাবী কালের দর্শন সম্বন্ধে এখনকার দর্শন কিছুই নহে। অনেকবার ফুল দেখি, কিন্তু অল্পক্ষণ মোহিত হই। সাধক, আমি তোমাকে সাধুবাদ করি যে, তুমি প্রতি রবিবারে প্রাণেশ্বরকে দেখিয়া থাক, এই প্রশংসা তুমি পাইবার উপযুক্ত। কিন্তু এই দর্শনেই নিশ্চিন্ত হইও না। আরও চলিতে হইবে, আরও উচ্চতর স্বর্গে গিয়া ঈশ্বরকে আরও উজ্জ্বলতররূপে দেখিতে হইবে। যতই তাঁহার দর্শনে আত্মার ভাব মধুর হইবে ততই তোমরা উন্নত হইবে। দর্শনের পর দর্শন, কত উজ্জ্বলতরভাবে তাঁহাকে দেখিব। নির্জনে যাঁহাকে দেখি, ব্রহ্মমন্দিরেও তাঁহাকে দেখি, সম্পদে বিপদেও তাঁহাকেই দেখি; সেই সকল অবস্থাতেই একই দেব-দর্শন। যখন আর সকলেই পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তখনও তিনিই অন্তরে দেখা দেন; ঘোর বিপদ এবং দুঃখ শোকের নদীর ভিতর দিয়াও তাঁহারই দর্শন। ভক্তির ব্রহ্ম-দর্শন, সুমিষ্ট সঙ্গীতের সময় ব্রহ্ম-দর্শন, উদ্যানে ব্রহ্ম-দর্শন, নদী কিম্বা সরোবরতটে ব্রহ্ম-দর্শন, মৃত্যু-শয্যায় ব্রহ্ম-দর্শন, এ সমুদয়ই কেমন ভাবিয়া দেখ। প্রত্যেক দর্শনের মিষ্টতা আছে, গভীরতা আছে; কিন্তু উন্নতিশীল ভক্তের হৃদয় কিছুতেই তৃপ্ত হয় না। ভক্ত বলিতেছেন আরও

উজ্জ্বলতর, মধুরতর দর্শন চাই, স্বর্গের পিতাকে আরও না দেখিলে চিরমোহিত হইতে পারি না। এখনকার ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা এই যে, অনেকেই ব্রহ্ম-দর্শন পাইয়া বারম্বার মোহিত হইয়াছেন; কিন্তু এমন দর্শন কেহই পান নাই, যাহাতে চিরমোহিত হইয়া এই কথা বলিতে পারেন—এই ইহকাল, পরকাল এবং অনন্তকালের মত আনন্দসাগরে ভাসিলাম।

হে প্রেমময় পরমেশ্বর, ভাল করিয়া দেখা দাও। শুনিয়াছি ভক্তেরা তোমাকে দেখিয়া চিরমোহিত হইয়াছেন। আমার তেমন সৌভাগ্য হয় নাই। আমি তোমাকে প্রতিদিন দেখি সত্য। কাহাকে দেখি? যিনি বিশ্বপতি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে যাঁহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাকে দেখিয়াছি, অনেকবার দেখিয়াছি। জন্মদুঃখী ক্ষুদ্র কীটের এত সাহস হইল যে, সে ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি তোমাকে দেখিতেছে। এত বড় অপরাধী হইয়া তোমাকে দেখিতে পাই। কিন্তু যতই তুমি দেখা দিতেছ, ততই যে তোমাকে আরও দেখিবার জন্য ইচ্ছা হইতেছে। দরিদ্রকে যতই কেন তুমি ধন দাও না, তাহার পক্ষে কদাচ তাহা সম্পূর্ণ তৃপ্তির কারণ হইতে পারে না। এই যে অদর্শন যন্ত্রণার পর কত মধুর দর্শন, এখনও প্রাণ চিরমোহিত হইল না এই দুঃখ রহিল। তোমার এমন সুখময় প্রেমমুখের রূপ কেন দেখাইলে যদি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া সুখী না করিবে? এমন করিয়া দেখা দাও যে তোমাকে ছাড়িয়া আর কিছু দেখিতে ইচ্ছা হইবে না। তুমি আমাদের ঘরে দিন রাত্রি বসিয়া থাক, অনিমেষে আমাদের নয়ন তোমাকে দেখুক। কৃতজ্ঞতা দিতেছি যে তুমি দর্শন দিয়াছ; কিন্তু প্রাণ কাঁদিতেছে ক্রমাগত দেখা দাও। যখন মোহিত হইব চিরকালের জন্য, তখন

আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া তোমাকে পূর্ণ কৃতজ্ঞতা দিব। এই সাধকদিগের উপাসনা সভা যেন তোমার পূর্ণ প্রেম, পূর্ণ পবিত্রতা সাধন করে। সকলকে দেখা দাও। পৃথিবীর যে যেখানে আমাদের ভাই ভগ্নী আছেন, সকলকে দেখা দাও। কৃপা করিয়া সকলকেই দেখা দাও। "তুমি দেখা না দিলে কে তোমাকে দেখিতে পারে।"

নিঃসন্দিগ্ধ ব্রহ্ম-দর্শন।

রবিবার, ১২ই আশ্বিন, ১৭৯৬ শক; ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

ঈশ্বর-দর্শন নিরাকার দর্শন। কেন না ঈশ্বরের রূপ নাই। কিন্তু যদিও তাঁহার রূপ নাই, তথাপি রূপ দ্বারা যেমন মনুষ্যের মনকে আকর্ষণ করা যায়, তিনি রূপবিহীন হইয়া কেবল তাঁহার আধ্যাত্মিক অরূপ সৌন্দর্য্যের দ্বারা তাহা অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে তাঁহার সন্তানদিগের হৃদয়, প্রাণ হরণ করেন! রূপের মধ্যে যে সৌন্দর্য্য আছে তাহার মোহিনী শক্তি দ্বারা হৃদয়, মন, প্রাণ সম্পূর্ণরূপে মোহিত হইয়া যায়, ইহা সকলেই স্বীকার করে। সেইরূপ ব্রহ্মের যদি সৌন্দর্য্য না থাকিত তিনি কাহারও মনে প্রেম ভক্তি উদ্দীপন করিতে পারিতেন না। তিনি তাঁহার নিরাকার সৌন্দর্য্য দ্বারা জীবাত্মাকে পুলকিত করেন। যদিও তিনি গুণবিশিষ্ট নিরাকার আত্মা, তথাপি তাঁহার দর্শনে মুগ্ধ ভাব হয়। যেখানে আকর্ষণ করিবার শক্তি আছে সেখানে রূপের প্রয়োজন কি? ঈশ্বর আমাদিগকে তাঁহার সৌন্দর্য্য দ্বারা আকর্ষণ করেন। ঈশ্বর স্বয়ং যেমন সুন্দর, সেই সৌন্দর্য্য দর্শনে যদি মনুষ্যের মন মোহিত না হয়, সে আপনার

হৃদয় হইতে নানা প্রকার রঙ্গ লইয়া, কল্পনা দ্বারা ব্রহ্মের মুখে অতিরিক্ত সৌন্দর্য্য চিত্রিত করে। এইরূপে যখনই ব্রহ্মকে কদাকার, শুষ্ক, নীরস মনে হয়, তখনই সে আপনার হস্তে রঙ্গ লইয়া ঈশ্বরকে তাহার মনের মত সুন্দর করিতে চেষ্টা করে। এ সমুদয় অল্পবিশ্বাসী-দিগের কার্য্য। যাঁহারা আত্মতত্ত্বের গভীর রাজ্যে প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মবিজ্ঞান পড়েন নাই, তাঁহারাই এইরূপে ঈশ্বরকে কল্পনা করেন। কিন্তু আমরা সত্যপ্রিয় ব্রাহ্ম হইয়া এই রূপ দর্শন চাই না। ব্রাহ্মগণ, ব্রহ্মমন্দিরের দেবতা যে, তোমাদিগকে প্রতি সপ্তাহে ডাকেন, তাহা ইহারই জন্য যে, ঈশ্বর যেমন তোমরা সেইরূপে তাঁহাকে দেখিবে। তুমি আপনার মনের কল্পিত কোন বস্তুকে ঈশ্বর মনে করিলে যথার্থ ঈশ্বর-দর্শন হইবে না। বাস্তবিক যদি যথার্থ জীবন্ত ঈশ্বরকে দেখিতে চাও তবে কল্পনা ছাড়। ব্রহ্ম-দর্শন কল্পনার ব্যাপার নহে।

মনের মধ্যে যত প্রকার গূঢ়তত্ত্ব আছে, সমুদয় পাঠ কর, দেখিবে সর্ব্বোচ্চ মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে ব্রহ্ম-দর্শনের সামঞ্জস্য রহিয়াছে। যাহাতে সন্দেহ থাকে সেই দর্শন পরিত্যাগ করিবে। মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে ব্রহ্ম-দর্শন-তত্ত্বের মিলন হয় না, যিনি এই কথা বলেন তিনি ব্রহ্ম-দর্শন পান নাই। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের জ্যোতি যতই বিস্তার হইতেছে, ততই তাহা ব্রহ্মের মুখ উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশ করিতেছে। মনোবিজ্ঞানের সহিত ব্রহ্ম-দর্শনের কোন বিবাদ নাই, এইজন্যই ব্রহ্ম-দর্শন বিষয়ে, এই বেদী হইতে বারম্বার বলা হইয়াছে, আমাদের আর কোন ভয় নাই। ইহার মধ্যে সন্দেহের সামান্য কারণও নাই। স্থির, নিঃসন্দেহরূপে ব্রহ্ম-দর্শন ভোগ করা যায়। কিন্তু কল্পনার প্রয়োজন আছে। কল্পনার সাহায্য লইয়া যত প্রকারে

তুমি ব্রহ্মকে নির্ম্মাণ করিতে পার কর, তোমার শিল্পনৈপুণ্যের যতদূর ক্ষমতা আছে, তদ্দ্বারা ঈশ্বরের মুখ নানা প্রকার সুন্দর বর্ণে চিত্রিত কর; কিন্তু এই কল্পনাকেও ভয় করি না। কেন না তুমি কল্পনা দ্বারা ভাল ভাল রঙ্গ লইয়া অথবা হৃদয়ের কোমলতর ভাব লইয়া, যে ঈশ্বরকে গঠন করিলে, তাহা যখন যথার্থ ব্রহ্মের নিকট আনিয়া উপস্থিত করিবে, তখন যদি সেই কল্পিত ঈশ্বর তাঁহার নিকট পরাজিত না হয় তবে বলিব ঈশ্বর মিথ্যা। সত্যপ্রিয় ব্রাহ্মহৃদয়ে অবশ্যই এই ফল হইয়াছে। এমন সত্য ব্রহ্ম থাকিতে কল্পনা দ্বারা মিথ্যা কৃত্রিম ব্রহ্মকে কেন নির্ম্মাণ করিলাম, এই বলিয়া নিশ্চয়ই তিনি অনুশোচনা করিয়াছেন।

কোটী সূর্য্যের ন্যায় ঈশ্বরকে কল্পনা কর; কিন্তু ব্রহ্মের কাছে যাইতে না যাইতে তোমার সেই কোটীসূর্য্য-নিন্দিত কল্পিত ঈশ্বর নিমেষের মধ্যে অন্ধকার হইল। তৎক্ষণাৎ কল্পনা লজ্জা পাইয়া আত্মহত্যা করিল। কিম্বা সহস্র মনোহর চন্দ্রের ন্যায় ঈশ্বরের প্রেমমুখ কল্পনা কর; কিন্তু যথার্থ ভক্তবৎসল ঈশ্বরের নিকট তাহাও শুষ্ক কঠোর বোধ হইবে। অতএব, সাধক, এই ভাবে কল্পনা তোমার সহায় হইল যে, কল্পনা যথার্থ ঈশ্বরের সম্মুখে লজ্জিত হইয়া আপনি আপনাকে বিনাশ করিয়া ফেলিল; সাধক কল্পনাশূন্য হইয়া নিঃসন্দেহে ঈশ্বর-দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হইলেন। ধর্ম্মজীবনের আরম্ভে, আত্মার বাল্যকালে সাধক, বর্ণপ্রিয়, রঙ্গপ্রিয়, এবং পদ্য ও কবিতাপ্রিয় হইয়া আপনার মনের ভাবের মত ঈশ্বরকে কল্পনা করে। কিন্তু অধিক বয়সে, সাধনের উচ্চাবস্থায় সাধক স্বভাবতঃই বিজ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরের সত্যতা নিরূপণ করিয়া তাঁহাকে অন্তরে স্থিরীকৃত করেন।

বাল্যকালের প্রথম দর্শন ভয়ের সহিত, সন্দেহের সহিত মিশ্রিত থাকে। কিন্তু বিজ্ঞানের দর্শন সন্দেহবিহীন। যেমন পরস্পরের দর্শনে মোহিত হই, তেমনই যথার্থ ঈশ্বর-দর্শনে জীবাত্মা মোহিত হয়। কে বলিবে ঈশ্বরের রূপ নাই? তাঁহার কোন জড় রূপ নাই, ইহা সত্য; কিন্তু তাঁহাতে এমনই আধ্যাত্মিক রূপ আছে যে, তাহার নিকট অর্থের রূপ অথবা সাংসারিক সুখের রূপ কিছুই নহে। সংসারের মোহিনীশক্তি অপেক্ষা যদি ব্রহ্মের অধিক রূপ না থাকিত, তাহা হইলে মনুষ্য-সন্তানগণ চিরকালই ঘোর পাপ-পঙ্কে লিপ্ত থাকিত। এইজন্য ঈশ্বর সকল অপেক্ষা আপনাকে অধিক সুন্দর করিলেন। চন্দ্র, সূর্য্য, নদ, নদী, পুষ্প, লতা, সুন্দর নর নারী প্রভৃতি সেই মহাকবি ঈশ্বরের হস্ত হইতে যত প্রকার সুন্দর বস্তু বাহির হইয়াছে, তিনি প্রত্যেকের মূলে পরম সৌন্দর্য্যের আকর হইয়া রহিয়াছেন। সেই সুন্দর ঈশ্বরের নিকটে কোন প্রকার কল্পিত সৌন্দর্য্য তিষ্ঠিতে পারে না।

নিঃসন্দিগ্ধ ব্রহ্ম-দর্শন হইলে আর কোন সৌন্দর্য্যই মনুষ্যের চিত্ত হরণ করিতে পারে না। ব্রাহ্ম, তুমি ব্রহ্ম-দর্শন পাইয়াছ, ইহা মানিলাম; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তুমি ব্রহ্ম-দর্শনের কোন্ সোপানে উঠিয়াছ? যে দর্শনে অন্তরের গভীর দুঃখ যন্ত্রণা দূর হয়, এবং মন বিমোহিত হয়, সেই মধুর দর্শন কি পাইয়াছ? যে পর্য্যন্ত অন্তরে পূর্ণ মত্ততা হয় নাই, সে পর্য্যন্ত নিশ্চয় জানিও, সেই সুমিষ্ট দর্শন পাও নাই। সত্যকে সাক্ষী করিয়া কি বলিতে পার যে, তুমি সুন্দর ব্রহ্মকে এমনই উজ্জ্বলরূপে দেখিয়াছ যে, পৃথিবীতে আর কোন রূপ নাই, যাহা তোমার প্রাণকে আকর্ষণ

করিতে পারে? যদি বল এমন রূপ আছে যাহা দেখিলে মন ঈশ্বর হইতে বিমুখ হয়, তাহা হইলে তুমি ব্রহ্ম-দর্শনের উচ্চ অধিকার পাও নাই। যখন উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে উঠিয়া উজ্জ্বলতররূপে ব্রহ্মকে দেখিয়া তাঁহার প্রেমরূপ-সোমরস পান করিয়া উন্মত্ত হইবে, তথনই জানিব পাপের মোহিনীশক্তি আর তোমাকে বশীভূত করিতে পারিবে না। এখনকার দর্শন আনন্দকর মানিলাম, বিজ্ঞানের ভূমির উপর দণ্ডায়মান হইয়া ঈশ্বর-দর্শন নিঃসন্দেহ, ইহা স্বীকার করিলাম; কিন্তু যেখানে দর্শন এবং মত্ততা এক হইবে সে স্থানে না গেলে কাহারও পরিত্রাণ নাই। যে দিন ব্রাহ্মসমাজের এই উচ্চ অবস্থা হইবে, সেই দিন পৃথিবী লজ্জিত হইবে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখন পর্য্যন্ত একটীকেও মত্ত ব্রাহ্ম দেখা যায় না। সামান্য এক বিন্দু সোমরস পানে অল্প মত্ততা, অধিকতর সোমরস পানে অধিকতর মত্ততা, সেইরূপ যদি বৎসরের পর বৎসর ঈশ্বর-দর্শনে অধিক হইতে অধিকতর প্রমত্ততা না জন্মিয়া থাকে, তবে তোমাদের ব্রাহ্মজীবনে ধিক্। যদি স্বর্গীয় প্রেমসুরা পানে প্রমত্ত না হইয়া থাক, তবে দশ বৎসর কি জন্য সাধন করিলে? সামান্যরূপে ঈশ্বর-দর্শন হইবে না, নিঃসন্দেহ দর্শন চাই; কেবল নিঃসন্দেহ দর্শন হইলেও হইবে না, সুমিষ্ট দর্শন চাই; আবার কেবল সুমিষ্ট দর্শন হইলেও হইবে না, কিন্তু পূর্ণ মত্ততার দর্শন চাই।

ঈশ্বরকে দেখিলাম, অথচ পলায়ন করিবার ক্ষমতা রহিল, তবে জানিলাম যথার্থ ব্রহ্ম-দর্শন, এবং প্রকৃত ভজন সাধন কিছুই হয় নাই। যখন পৃথিবীর জঘন্য চৈতন্য বিনষ্ট হইবে, কিন্তু আত্মাতে স্বর্গীয় চৈতন্যের উদয় হইবে, শরীরের সেই অচেতন অবস্থা চাই।

সকল প্রকার প্রলোভন ও পাপের আকর্ষণে শরীর যদি সম্পূর্ণরূপে মৃত হয়, তাহা হইলে আত্মার সচেতন অবস্থায় এই পৃথিবীতেই এমন দর্শন পাইব, যাহাতে চিরকালের জন্য বিমোহিত হইয়া থাকিব; কিঞ্চিৎ সময়ের মত্ততা লাভ করিলে হইবে না; কিন্তু একেবারে প্রমত্ত হইয়া থাকিব। দিবারাত্রি সর্ব্বক্ষণ তাঁহার নিগূঢ় প্রেম-নদীতে সন্তরণ করিতে হইবে। পূর্ব্বতম লোকেরা জঘন্য সোমরস পান করিয়া শারীরিক মত্ততা লাভ করিত, তোমাদিগকে সে মত্ততা লাভ করিতে বলিতেছি না; কিন্তু অন্তরে ঈশ্বরের রূপ দেখিয়া তোমাদের আত্মা এমনই মত্ত হইবে যে, অন্য কোন রূপ দেখিতে আর ইচ্ছা হইবে না, এবং পৃথিবীর সমস্ত বস্তুকে ক্রীড়ার বস্তু মনে হইবে। পিতার ভাণ্ডার-গৃহ হইতে আমরা অতি সামান্য ধন পাইয়াছি; কিন্তু আমাদের জন্য যে সেখানে কত ধন সঞ্চিত রহিয়াছে তাহার অন্ত নাই। ইঙ্গিত পাইয়াছি, যে দিক হইতে উষার আলোক দেখিতেছি, সেই দিকেই ব্রহ্ম আছেন, সেই দিকে চল অগ্রসর হই, সেখানে তাঁহার পূর্ণ সৌন্দর্য্য দেখিয়া একদিন চিরমোহিত হইব আশা আছে। পরমেশ্বর আশা পূর্ণ করুন।

আত্মাতে ব্রহ্ম-দর্শন।

রবিবার, ১৯শে আশ্বিন, ১৭৯৬ শক; ৪ঠা অক্টোবর, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

পুষ্প যেমন ক্রমে ক্রমে প্রস্ফুটিত হয়, তাহার সৌন্দর্য্য এবং সৌরভে যেমন ক্রমে ক্রমে চারিদিক আমোদিত করে, ব্রহ্ম-দর্শনরূপ-পুষ্পও সেইরূপ ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইয়া উহার সৌন্দর্য্য এবং

সৌরভ দ্বারা চারিদিক আমোদিত করে। মনুষ্য যখন প্রথম ঈশ্বরের সত্তায় বিশ্বাস করে তাহা অতি সামান্য ব্যাপার। প্রথমে জগৎ কৌশল দেখিয়া মনুষ্য বিশ্বাস করে ইহার অবশ্যই একজন জ্ঞানময়, মঙ্গলময় নিয়ন্তা আছেন; এই অবস্থায় ব্রহ্ম-দর্শন হইল কে বলিবে? যতবার সেই চন্দ্র সূর্য্য, এবং ধন ধান্যের প্রতি বিশ্বাস-নেত্র পতিত হয়, ততবারই জড়রাজ্যে ঈশ্বরের দয়ার চিহ্ন দেখিয়া মনুষ্যের মন সহজে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। এই প্রকার বিশ্বাস এবং কৃতজ্ঞতা দ্বারা ঈশ্বর এবং মনুষ্যের মধ্যে যে দূরতা রহিয়াছে অনেক পরিমাণে তাহা বিনষ্ট হয় সত্য; কিন্তু তথাপি ব্রহ্ম হইতে তাঁহার হৃদয় বহু দূরে থাকে। ঈশ্বর আছেন কেবল ইহা যিনি বিশ্বাস করেন, তিনি প্রাতঃকালের মত অতি অল্প আলোক দর্শন করেন। যে ব্যক্তি বুঝিতে পারিত না যে ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর বারম্বার ভূরি ভূরি প্রমাণ দ্বারা তিনি আছেন ইহার সাক্ষ্য দিয়া, সেই অচেতন ব্যক্তিকে চেতন করিয়া দিলেন। ঈশ্বর আছেন, এই সত্য-পুষ্প তাহার অন্তরে ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। ঈশ্বর আছেন কেবল ইহা বলিলে হইল না, তাঁহার জ্ঞান, দয়া, পুণ্য আছে, এ সকল কথা বলিলেও পূর্ণ বিশ্বাস হইল না। ইহা দ্বারা বুদ্ধি স্থির হইল, এবং হৃদয়েরও অনেকগুলি ভাব তৃপ্ত হইল; কিন্তু তথাপি আত্মার অনেকগুলি শক্তি অলস রহিল, তাহারা কার্য্য করিতে পারিল না বলিয়া খেদ করিতে লাগিল। আত্মা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অব্যবহিত সন্নিধানে উপস্থিত না হইলে, পূর্ণ বিশ্বাসের উদয় হয় না।

যখন আত্মা ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়, তখন সে তাঁহাকে "তুমি" বলিয়া সম্বোধন করে। তখন তিনি "তুমি

রূপে” পরিণত হন। সাধক যখন বলেন, হে ঈশ্বর! আমার মন তুমি অন্তর্যামী হইয়া জানিতেছ, তাঁহার সেই “তুমি” তথাপি দূরস্থ। তখনও ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁহার পূর্ণ ঘনিষ্ঠতা হয় নাই। অল্পবিশ্বাস থাকাতে তখনও ঈশ্বরকে দূরস্থ মনে হইতে থাকে। যতক্ষণ ঈশ্বর “তিনি” ছিলেন ততক্ষণ কৌশলপূর্ণ জড়জগতের সাহায্যে, কিম্বা বিজ্ঞানের পুস্তকাদি অধ্যয়ন দ্বারা বিশ্বাসকে সতেজ করিতে হইয়াছিল। জড়বাদীরা জড়ের মধ্য দিয়া সূক্ষ্ম চৈতন্যময় ঈশ্বরকে দেখিতে চেষ্টা করে। ক্রমাগত চন্দ্র সূর্য্য, নদ নদী, পুষ্প লতা, জ্যোতিশাস্ত্র, ভূতত্ত্ববিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা এবং নানাবিধ বিজ্ঞানশাস্ত্র এক বাক্য হইয়া ঈশ্বরের সত্তার সাক্ষ্য না দিলে তাঁহাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস হয় না। এইজন্য মনুষ্য উন্মীলিত নেত্রে সর্ব্বদা তাকাইতেছে যে, জড়রাজ্যে ঈশ্বরের সত্তার কত সাক্ষী সংগ্রহ করিতে পারে। ঈশ্বরের বর্ত্তমানতা সপ্রমাণ করিবার জন্য তাহাদের নিকট জড়বস্তুর সাক্ষের আবশ্যক, কিন্তু যথার্থ বিশ্বাসী সাধক চিরকাল জড়ের মধ্য দিয়া ঈশ্বরের সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করিতে পারেন না। প্রতিবার ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে হইলে, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, নদীর হস্ত দিয়া তাহা প্রেরণ করিতে হইবে, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারেন না। অনেক দূর ভ্রমণ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত পথিক তাঁহাকে নিকটে দেখিতে ইচ্ছা করিল। যদিও আবেদন-পত্র সাক্ষাৎ সম্পর্কে ঈশ্বরের হস্তে দিই নাই, কিন্তু প্রকৃতির হস্তে দিয়াছি, জড়জগতের ভিতর দিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা প্রেরণ করিয়াছি, জগৎ যদি মিথ্যা হয় আমার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে না, সেই প্রার্থনা ঈশ্বরের নিকট পৌছিল কি না এখনও

সংবাদ আসে নাই, সাধকের মনে কদাচ এ সকল চিন্তা সহ্য হয় না। প্রকৃত সাধক এই চান যে, তাঁহার হৃদয় ঈশ্বরের সহিত প্রত্যক্ষ ভাবে সংলগ্ন হইবে। প্রেমরজ্জু দ্বারা জীবাত্মা ঈশ্বরেতে সম্বদ্ধ হইবে। তাঁহার মন স্বভাবতঃই ঈশ্বরের সঙ্গে সকল প্রকার ব্যবধান বিনাশ করিয়া, নিগূঢ় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিতে ব্যাকুল হয়।

বাল্যকালে শিশু আত্মার বিশ্বাস, জ্ঞান, জড়জগৎ উদ্দীপন করিয়াছিল। সেই ব্রাহ্ম-জিজ্ঞাসুর প্রথমাবস্থায় চন্দ্র, সূর্য্য অথবা জড়-জগতের যে কার্য্য ছিল তাহা শেষ হইল; কিন্তু এখন সেই আত্মা এই চায়, চন্দ্র সূর্য্য থাকুক আর না থাকুক ইহাদের ঈশ্বর আমার নিকট আছেন। সূর্য্য যদি অন্ধকার হয়, বিজ্ঞান যদি মূর্খতা হয়, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডও যদি চূর্ণ হয়, তাহা হইলে কি হইবে? চক্ষু নিমীলিত করিলে "তুমি" যাঁহাকে বলি তাঁহাকে দেখা যায়। এখন, তিনি আছেন, ইহা স্থির হইয়াছে, তুমি আছ, ইহাও স্থির হইয়াছে। এখন "তোমাকে" আরও নিকটে দেখিবার সময় আসিয়াছে। চন্দ্র আছেন, অতএব ঈশ্বর আছেন; সুতরাং, এই যুক্তি, এবং হেতুর শাস্ত্র দূরীভূত হউক। যে ব্যক্তি ক্রমাগত কৌশলপ্রিয় হইয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য জগতের কৌশল অন্বেষণ করিতেছে সে ব্যক্তি ব্রহ্ম-দর্শনের অধিকারী নহে। যাহার মন এখনও প্রমাণ চায় সে কিরূপে উচ্চ শ্রেণীর বিশ্বাসীদিগের মধ্যে পরিগণিত হইবে? কিন্তু যিনি বলিলেন, আর সাক্ষী চাই না, বিচারালয়ের কার্য্য বন্ধ হইয়া গেল, যাঁহার সত্তা সপ্রমাণ করিবার আবশ্যক ছিল, তিনি নিকটস্থ হইলেন, আর সাক্ষীর প্রয়োজন রহিল না; জড়জগতের সাক্ষ্যদানের কার্য্য শেষ হইল। কিরূপে? প্রত্যক্ষ দর্শন দ্বারা। তাঁহার বর্ত্তমানতা

প্রমাণ করিবে কে? দেখ, ঈশ্বর আছেন, এই সত্য প্রস্ফুটিত হইয়া, ঈশ্বরকে দেখা যায় এই সত্যে পরিণত হইল। তিনি তুমিতে পরিণত হইল, এবং তুমি আরও ঘনিষ্ঠতর মধুরতর তুমিতে পরিণত হইল। এখন ইচ্ছা হইতেছে আর চন্দ্র, সূর্য্য দেখিব না, চক্ষু আপনা আপনি মুদ্রিত হইল। সমুদয় বিজ্ঞানালোকের কার্য্য শেষ হইল, এক্ষণে পূর্ণ বিশ্বাসীর নিকটে ব্রহ্মাগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। তাঁহার অন্তরে বাহিরে ঈশ্বরের বর্ত্তমানতার জ্যোতি। সাধক যখন প্রথম দিন ঈশ্বরকে তুমি বলিয়া সম্বোধন করিলেন, তখন ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁহার নূতন পরিচয় হইল।

ঈশ্বর নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছেন, কিন্তু মনুষ্যের বিশ্বাস-চক্ষু সর্ব্বদা প্রস্ফুটিত থাকে না, এইজন্য প্রকৃত সাধক চির-দর্শন প্রার্থনা করেন। অনেকে কল্পনা দ্বারা ঈশ্বরকে বাঁধিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু শীঘ্রই তাঁহাদের চেষ্টা নিষ্ফল হয়। নিরাকার চক্ষু নিরাকার ঈশ্বরকে দেখিতে লাগিল। মনুষ্যের বিশ্বাস-চক্ষু অতি ক্ষীণ, তাহার নিকট এই ঈশ্বর ছিলেন, আর নাই। আমরা তাঁহাকে একবার দেখিয়াছি, আবার হে জগৎ, তাঁহাকে দেখাইয়া দাও। তখন প্রস্ফুটিত বিশ্বাস-চক্ষে পর্ব্বত-শিখরে, নদীর কল্লোলে, পুষ্পের সৌন্দর্য্যে, সেই সৌন্দর্য্যের আকর ঈশ্বর দেখা দিতে লাগিলেন। যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরকে সপ্রমাণ করিবে, এ জন্য আর জড়জগতের প্রয়োজন রহিল না। কিন্তু জগৎ তাঁহার সৌন্দর্য্যের প্রভা বিস্তার করিতে লাগিল। অতএব ঈশ্বরের সত্তা সপ্রমাণ করিবার জন্য বাহ্যজগতের প্রয়োজন নাই। কিন্তু জড়জগৎ এবং হৃদয়জগতের সাহায্য লইয়া ব্রাহ্ম ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য দর্শন করেন। কিন্তু যদি

পুষ্পের সৌন্দর্য্য ম্লান হয়, জড়জগৎ অদৃশ্য হয়, তখন ব্রাহ্ম কি করিবেন? নিমীলিত কি উন্মীলিত চক্ষে আমি "আছি" নিজের অস্তিত্বে কে সন্দেহ করিয়াছে? তেমনই নিমীলিত কি উন্মীলিত নেত্রে "ঈশ্বর আছেন" ইহাতে কে সংশয় করিবে? সত্যবিশ্বাসী কোন সৃষ্ট বস্তুকে অবলম্বন করিয়া থাকেন না; কিন্তু সমস্ত বস্তুকে অতিক্রম করিয়া ঈশ্বর দর্শন করেন। জড়জগতের প্রমাণের উপরে তাঁহার ঈশ্বর-দর্শন নির্ভর করে না। ব্রহ্ম-দর্শনই তাঁহার আত্মার অবস্থা। "দেখা দাও কাতরে" ঈশ্বর-দর্শনের জন্য তাঁহাকে আর এরূপ প্রার্থনা করিতে হয় না। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ হইলেও আমি আছি, ঈশ্বর আছেন, ইহাতে আর সন্দেহ হইতে পারিবে না। ঈশ্বরেতে নিজের মুখ দর্শন, এবং নিজের মধ্যে ঈশ্বরের মুখ দর্শন করা, তখন তাঁহার আত্মার সহজাবস্থা হয়। ঈশ্বর-দর্শন আর প্রমাণসাপেক্ষ থাকে না। এই অবস্থা প্রত্যেক ব্রাহ্মকে লাভ করিতে হইবে। আর সঙ্গীত, ধ্যান দ্বারা তাঁহাকে দেখিতে হয় না। ঈশ্বর প্রতিনিয়ত সমক্ষে। তিনি আত্মার প্রাণ হইয়া গেলেন। প্রথমে উদ্যম, চেষ্টা, সাধন, অবশেষে শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভক্তিতে ব্রহ্ম-দর্শন।

রবিবার, ২৬শে আশ্বিন, ১৭৯৬ শক; ১১ই অক্টোবর, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

জীবাত্মার মধ্যে পরমাত্মা লাভের স্পৃহা উদ্দীপ্ত হইবা মাত্র বুদ্ধি এবং ভক্তি ধাবিত হইল। ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভেই বুদ্ধি এবং ভক্তি ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হয়। প্রত্যেক মনুষ্যের সম্পর্কে

যেমন এই অবস্থা স্বাভাবিক, তেমনই ইহা সমস্ত জাতির সম্পর্কেও স্বাভাবিক। প্রত্যেক জাতির মধ্যেই বুদ্ধি ঈশ্বরকে নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, বুদ্ধি আপনার ক্ষীণতা বুঝিতে পারে না। আমি জানিব এই ভাব অহঙ্কারসম্ভূত। বুদ্ধি যতই গূঢ় সত্য সকল জানিবার জন্য ব্যস্ত হয়, ততই ইহা অসত্যের দুর্গ সকল চূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। যতই সত্যের পর সত্য অধিকৃত হয়, ততই বুদ্ধি আরও দাম্ভিক ভাবে নূতন নূতন সত্য সকল আবিষ্কার করিতে ধাবিত হয়। আপনার গৌরব আপনি প্রকাশ করে কে? মনুষ্যের বুদ্ধি। বুঝিতে পারি না, জানিতে পারি না, বুদ্ধি এ কথা সহ্য করিতে পারে না। স্বীয় দুর্ব্বলতা, স্বীয় অধিকারের সীমা, অথবা অনধিকার চর্চ্চা যে কোন বস্তু আছে তাহা বুদ্ধি বুঝিতে পারে না। বুদ্ধি অহঙ্কারসম্ভূত, সুতরাং বুদ্ধির পতন হয়। বুদ্ধি যতদিন কুটিল থাকে ততদিন ইহা নানাপ্রকার ভ্রম কুসংস্কারে থাকিয়াও সত্য পাইয়াছি বলিয়া দম্ভ করে। যদি বুদ্ধিতে সরলতা থাকে, তাহা হইলে ইহা বলে ঈশ্বরকে আমি সম্পূর্ণরূপে জানি না, তাঁহাকে নির্ণয় করিতে গিয়া আমি কোন প্রকার সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি না। বুদ্ধি এতকালের পর এই সিদ্ধান্ত করিল ঈশ্বরকে অবধারণ করা যায় না। আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর যিনি, পাতাল অপেক্ষা গভীরতর যিনি, তাঁহাকে কিরূপে বুদ্ধি পরিমাণ করিবে? এইজন্যই অনেক সত্য-পরায়ণ ব্যক্তিরাও বলিতেছেন, ঈশ্বর-দর্শন অসম্ভব। চৈতন্যস্বরূপ যিনি, তাঁহাকে কিরূপে ধ্যান ও দর্শন করিব? ইহা বুদ্ধিশাস্ত্রের কথা। বুদ্ধি যাহাদের নেতা, বুদ্ধি যাহাদের ধর্ম্মের মূল, তাহাদের পক্ষে ঈশ্বর-দর্শন অসম্ভব।

বুদ্ধির পথে গিয়া যতই আমরা ঈশ্বরকে ধরিতে যাই ততই তিনি উচ্চ হইতে উচ্চতর, গভীর হইতে গভীরতর, এবং দূর হইতে দূরতর দেশে পলায়ন করেন। বুদ্ধির নিকটে চিরকালই তিনি দুরবগাহ্য থাকিবেন। ক্ষুদ্র বুদ্ধি সেই গভীর ব্রহ্ম-সাগরে প্রবেশ করিতে পারে না। যতই আমরা বুদ্ধির দ্বারা ঈশ্বরকে দেখিতে যাই ততই আমাদের মন প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে। অনেকেই পূর্ব্বজীবনের পরীক্ষা স্মরণ করিয়া সায় দিবেন যে, চিন্তা ঈশ্বর-দর্শন সুলভ না করিয়া দুর্ল্লভ করিয়া দেয়। তোমরা কি ইহা স্বীকার করিবে না যে, বরং চিন্তা এবং আলোচনা শূন্য হইয়া কেবল অনুরাগ দ্বারা ঈশ্বরকে অনুভব করা যায়? চিন্তা দ্বারা কেবলই অন্ধকার দেখিতে হয়। চিন্তার পথে কেবলই দুর্দ্দশা। আজ কাল চারিদিকে ভয়ানক জড়বাদের প্রাদুর্ভাব। যেখানে কেবল জড়ের শাসন, চৈতন্য নাই, পরিত্রাণ নাই, সেখানেই অহঙ্কারী বুদ্ধির রাজত্ব। অতএব পরিত্রাণার্থীরা অতি সাবধান হইয়া এই বুদ্ধির কুটিল পথ পরিত্যাগ করেন। প্রথমেই বলিয়াছি, মনুষ্যের ধর্ম্মজীবনের আরম্ভে বুদ্ধি এবং ভক্তি এই দুটী সর্ব্বাগ্রে উত্তেজিত হয়। আমি নিজে কিছুই বুঝিতে পারি না, এই প্রকার ভাব হইতে ভক্তির উদয় হয়। মনুষ্যের মনে যতক্ষণ অহঙ্কার দম্ভ থাকে ততক্ষণ ভক্তির উদয় হয় না। যে অহঙ্কারের দাস হইয়া নিজের বুদ্ধিবলে ঈশ্বরকে জানিতে চেষ্টা করিল, তাহার সকল চেষ্টা বিফল হইল; কিন্তু যে নিরুপায় হইয়া দীনভাবে তাঁহাকে প্রার্থনা করিল তাহারই নিকট ঈশ্বর প্রকাশিত হইলেন।

অনুতাপ, ব্যাকুলতা এবং বিনয় হইতে ভক্তি-পুষ্প উৎপন্ন হয়।

যতই আপনাকে ক্রমাগত পৃথিবীর ধূলির মত নীচ করিবে, ততই তোমার অন্তরে ভক্তিরস সঞ্চারিত হইবে। উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে ভক্তি গমন করে না। অহঙ্কার ভক্তির মহাশত্রু। যে আমিত্ব কিম্বা অহং জ্ঞান বুদ্ধির প্রাণ, সেই আমিত্ব ভক্তির মূলে নাই। বুদ্ধি বলে আমি জানি, ভক্তি বলে তুমি জানাও, বুদ্ধি বলে আমি বুঝি, ভক্তি বলে তুমি বুঝাও। এই ভক্তি মনুষ্যকে কোন্ দিকে লইয়া যায়? ঈশ্বরের পদতলে। যে বিদ্যা বলে আমি কিছুই জানি না, তাহা ভক্তির বিদ্যা। বুদ্ধি যাহা সহস্র বর্ষ চেষ্টা করিয়া বলিতে পারে না, ভক্তি সাহস এবং বিনয়ের সহিত নিমেষের মধ্যে বলিল আমাকে ব্রহ্ম দর্শন দিতেছেন। ভক্তি-বিশিষ্ট-ব্যক্তি কেবল বিশ্বাস এবং ভক্তি-চক্ষে ঈশ্বরকে দর্শন করিতে সক্ষম হন। বুদ্ধি অনেক বৎসর আস্ফালন করিয়া এই বলিল, আমি ঈশ্বরকে দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু ভক্তি যাই বিনম্রভাবে চক্ষু দুটী খুলিলেন, তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মাণ্ডের পতি ঈশ্বর সম্মুখে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধি অনেক চেষ্টা করিয়া এই বলিল, ঈশ্বর অচিন্ত্য তাঁহাকে দেখা যায় না। এই কি পাষণ্ড বুদ্ধি, তোমার সিদ্ধান্ত? তুমি এত আস্ফালন ও এত আড়ম্বরের পর কি না এই কথা বলিলে যে ঈশ্বরকে দেখা যায় না? তোমাকে ধিক্! প্রখর বুদ্ধি, তুমি মহা আড়ম্বর করিয়া ঈশ্বরকে দেখিবে বলিয়া গিয়াছিলে; কিন্তু তোমার অহঙ্কার চূর্ণ হইল, তুমি নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলে।

দেখ ভক্তি অতি দীনের ন্যায় ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া কাঁদিতেছিল; কিন্তু তাহারই নিকট ব্রহ্মাণ্ডের রাজা দেখা দিলেন। ভক্ত বলেন, ঈশ্বর আমাকে দেখা দিলেন, তাই আমি তাঁহার দেখা পাইলাম।

শাস্ত্রেও পড়ি নাই, তর্ক দ্বারাও সিদ্ধান্ত করি নাই, ঘরে বসিয়া ছিলাম, চক্ষু আপনা আপনি খুলিয়া গেল, দেখিলাম কাছে আসিয়া ঈশ্বর বসিয়া আছেন। তর্কে বহুদূর, কিন্তু ঈশ্বর ভক্তের নিকটস্থ, অন্তরস্থ প্রাণধন। বুদ্ধি অনেক তীর্থ পর্য্যটন করিয়া এই লাভ করিল, ঈশ্বর অচিন্ত্য; কিন্তু ভক্ত ঘরে বসিয়া নিজের প্রাণের মধ্যে প্রাণেশ্বরকে দেখিলেন। বুদ্ধির নিকট অবতার নাই, ভক্তির নিকট অবতার। ঈশ্বর ভক্তবৎসলের হৃদয়ের মধ্যে না আসিলে, তিনি স্বয়ং দেখা না দিলে, কে তাঁহাকে দেখিতে পায়? মূল্য দিয়া পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। উচ্চতর বিজ্ঞান বলিল, ঈশ্বর অচিন্ত্য, তাঁহাকে দেখা যায় না। কিন্তু ভক্তি বলিল, ঈশ্বরকে দেখা যায়। ঈশ্বর নিরাকার, সুতরাং তাঁহাকে দেখা যায় না, জগতের সমস্ত বিজ্ঞানশাস্ত্র এই কথা বলিতেছে; কিন্তু যখন বঙ্গদেশে, কলিকাতা নগরে, ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া উপস্থিত হই, তখন দেখি ব্রাহ্মদিগের প্রার্থনা, সঙ্গীত, স্তব স্তুতি এবং পুস্তকাদিতে, "হে ঈশ্বর! দেখা দাও।" এই কথা রহিয়াছে। অরূপ-রূপ-দর্শন এ যে আশ্চর্য্য কথা! বাস্তবিক যদি ব্রহ্মকে দেখা না যায়, তবে আমাদের অন্তরে ব্রহ্ম-দর্শন-স্পৃহা হইল কেন? এত শতাব্দীতে, এত বিজ্ঞানে যাহা স্থির হয় নাই, তোমরা এই অসাধ্য সাধন করিবে? যিনি বুদ্ধির অগম্য, মনের অচিন্ত্য, তাঁহাকে তোমরা ভক্তি-চক্ষে করতলন্যস্ত ফলের ন্যায় দেখিতেছ, ইহা কি সামান্য ব্যাপার?

বুদ্ধি কোন কালেই অহঙ্কারে ঈশ্বরকে দেখিতে পায় নাই। সেই ভক্তি যাহা চিরকাল ঈশ্বরকে নিকটে দেখিয়াছে, বঙ্গদেশে বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছে। আমাদের যে

বিভাগে বুদ্ধি সেখানে ঈশ্বর অদৃশ্য এবং অচিন্ত্য, অতএব বন্ধুগণ, তোমরা কেহই বুদ্ধির সামান্য প্রদীপ লইয়া ব্রহ্ম-দর্শন-রাজ্যে প্রবেশ করিও না, যদি কোন আচার্য্য বলেন চিন্তা দ্বারা ব্রহ্মকে দেখা যায়, সেই মৃত্যুর কথা তোমরা গ্রহণ করিও না। তাহা অহঙ্কার এবং অন্ধকারের পথ। বুদ্ধির প্রদীপ লইয়া দুই ঘণ্টা কাল ধ্যান কর, কোথাও ঈশ্বরকে দেখিতে পাইবে না। কেবলই অন্ধকারের পর গভীরতর অন্ধকার দেখিবে। কিন্তু যখনই বলিবে আমি নিজের কোন বলে ঈশ্বরকে দেখিতে পারি না, তখনই ভক্তি-বলে নিমেষের মধ্যে বলিবে, "এই আমার ঈশ্বর।" ভক্তকে জিজ্ঞাসা কর, ভাই, তুমি কিরূপে ঈশ্বরকে দেখিলে, তিনি বলিবেন তাহা আমি জানি না। যাহারা বুদ্ধি-পরায়ণ তাহারা পথ দেখাইতে চেষ্টা করিত। ভক্তকে পথ ভ্রমণ করিয়া দূরে যাইতে হয় না, তিনি ঘরে বসিয়া ঈশ্বরকে দেখিতে পান। জগতের কত লোক বলিয়াছে, ব্রাহ্মেরা দাম্ভিক। কিন্তু আমরা ঈশ্বর-দর্শন করি ইহা যথার্থ বিনয়ের কথা। বিজ্ঞানবিদেরাই অহঙ্কার করিয়া বলে "ঈশ্বরকে দেখা যায় না, ঈশ্বর নিরাকার, অলক্ষিত ভাবে লুকাইয়া আছেন, তাঁহাকে দেখা যায় না," যাহারা এই কথা বলে তাহারাই অহঙ্কারী। তিনি আছেন, ইহা যদি সত্য হয়, তাঁহাকে দেখা যায় ইহা তেমনই সত্য। ব্রহ্মের অস্তিত্বে বিশ্বাস, এবং ব্রহ্ম-দর্শন এক কথা। এখানে "তুমি আছ" "তোমাকে দর্শন করিতেছি" "তোমার পবিত্র আবির্ভাব ভোগ করিতেছি" এ সকলই এক কথা। যাই ভক্ত বলিলেন আমার প্রাণেশ্বর আছেন, তখনই তিনি তাঁহাকে দেখিলেন এবং তাহার মধুর সত্তা সম্ভোগ করিলেন। যাই ভক্ত বলিলেন আমার নিজের কোন

চেষ্টা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হইল না, তখনই নিরাকার ব্রহ্ম সেই দীনাত্মা ভক্তের নিকটে দৃশ্য ব্রহ্মরূপে প্রকাশিত হইলেন। ব্রহ্ম যতদিন বাঁচিয়া থাকেন, আমার বিশ্বাসের অভাব হইবে না। দেখ ভক্তের কর্ম্ম, ভক্তের ব্রহ্ম-দর্শন কেমন সুলভ, ভক্তের নিরাকার তত্ত্ব পাঠ কেমন ঋজুপাঠ! কে কাহার বাড়ীতে যায়? ঘরে বসিয়া ভক্তেরা মহারত্ন লাভ করেন। ভক্তবৎসল স্বয়ং আসিয়া ভক্তদিগকে ঘরে তাঁহার স্বর্গের মহাধন বিতরণ করেন।

ঈশ্বরের সাক্ষীর অভাব।

রবিবার, ২রা কার্ত্তিক, ১৭৯৬ শক; ১৮ই অক্টোবর, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

ব্রাহ্মগণ, তোমাদের পিতার কি কোন অভাব আছে? তোমরা না বল, ঈশ্বর পূর্ণস্বরূপ, অনাদি, অনন্ত, নিত্য এবং পূর্ণ সত্য, পূর্ণ প্রেম, পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ পবিত্রতার আধার হইয়া বিরাজ করিতেছেন। তোমরা সকলেই জান ঈশ্বর পূর্ণ; কিন্তু সেই পূর্ণ ঈশ্বরেরও একটী অভাব আছে। পূর্ণ পরব্রহ্মের অভাব আছে। ব্রাহ্মগণ, অগ্র ভাবিয়া দেখ তোমাদের পূর্ণ পরমেশ্বরের অভাব আছে কি না। আমাদের ঈশ্বরের একটী অভাব আছে। তাঁহার কতকগুলি সাক্ষীর অভাব আছে। তাঁহার মঙ্গলভাবের অসীম ক্ষমতা, এবং অনন্ত জ্ঞান কৌশলের পরিচয় দিবার জন্য সহস্র সহস্র সাক্ষী সৃজন করিলেন। ক্ষুদ্রতম সর্ষপকণা হইতে প্রকাণ্ড পর্ব্বত পর্য্যন্ত তাঁহারই জ্ঞান, শক্তি এবং দয়ার সাক্ষ্য দিতেছে। সকলেই বলিতেছে আমাদের ঈশ্বর পূর্ণ-দয়া, পূর্ণ-জ্ঞান এবং পূর্ণ-শক্তির আধার। ঈশ্বর আপনার

সৃষ্টির মধ্যে অসংখ্য সাক্ষী রাখিয়া দিলেন; কিন্তু মনুষ্য পাপে এমনই অন্ধ এবং অসাড় হইয়াছে যে, তাহাদিগকে চিনিতে পারে না। এইজন্য চৈতন্য-বিশিষ্ট মনুষ্যদিগের মধ্যেই ঈশ্বরের সাক্ষীর প্রয়োজন। জড়জগৎ ক্রমাগত ঈশ্বরের জ্ঞান ও দয়ার সাক্ষ্য দিতেছে, কিন্তু তাহা সকলে বুঝিতে পারিল না। পৃথিবীর নর নারী তাঁহারই পুত্র কন্যা, তিনি নিজ হস্তে তাহাদের আত্মাতে বুদ্ধি, প্রেম এবং দেবভাব সকল দিলেন; কিন্তু সেই ব্রহ্মপুত্র কন্যারাই পিতাকে ভুলিয়া এই জগতের ভিতর হইতেই কুটিল যুক্তি সকল বাহির করিয়া ঈশ্বর নাই ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিল। হায়, ঈশ্বরের সাক্ষী সকলের এই দুর্দ্দশা হইল! ঈশ্বর সাক্ষী চান তাঁহার পুত্র কন্যাদিগের মধ্যে। জড়জগৎ ঈশ্বরের হস্তের লেখা, এবং ভৌতিক বিজ্ঞান চিরকালই ইহার কৌশল দ্বারা ঈশ্বরের জ্ঞান, দয়া ও শক্তির পরিচয় দিয়া আসিতেছে; কিন্তু তথাপি আরও স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ সাক্ষীর প্রয়োজন। যাহার আত্মা আছে, চৈতন্য আছে, সেই সাক্ষীর প্রয়োজন। জড়জগৎ অপেক্ষা উচ্চতর মহত্তর সাক্ষী তিনি চান।

ঈশ্বর তাঁহার সুশৃঙ্খলাপূর্ণ সুন্দর ধর্ম্মজগতে, গুরু হইয়া শিষ্য, রাজা হইয়া প্রজা, এবং পিতা হইয়া সাধু এবং সাধ্বী পুত্র কন্যা সকল প্রস্তুত কেন করিতেছেন? কেবল সেই সকল লোকদিগের কল্যাণের জন্য নহে; কিন্তু একটী শিষ্য সহস্র শিষ্য প্রস্তুত করিবে, একটী প্রজা সহস্র প্রজার আদর্শ হইবে, এবং একটী সন্তান তাঁহার আরও সহস্র সন্তানকে উদ্ধার করিবে, এইজন্য পিতা সাক্ষী চাহিতেছেন। তিনি যে এতকাল ব্রাহ্মসমাজের শ্রীবৃদ্ধি করিলেন, তাহা কেবল বঙ্গদেশের জন্য নহে; কিন্তু পৃথিবীর পরিত্রাণের জন্য। তোমরা

স্বর্গের যে আলোক পাইয়াছ, তাহা কেবল তোমাদের হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিবার জন্য নহে; কিন্তু তাহা দ্বারা সমুদয় জগৎ উজ্জ্বল হইবে। তোমাদের কয়েকজনকে জগতের গুরু ঈশ্বর তাঁহার শিষ্যত্বে বরণ করিয়াছেন, এইজন্য যে, তোমরা তাঁহার সাক্ষী হইয়া জগতের পরিত্রাণের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিবে। এইজন্য বলি ব্রাহ্মসমাজ ঈশ্বরের বিশেষ বিধান। বঙ্গদেশে ঈশ্বর তাঁহার কতকগুলি সাক্ষী প্রস্তুত করিলেন, এইজন্য যে, তাহাদিগকে জগতের নিকট স্থাপন করিবেন। ব্রাহ্মগণ, বুঝিলে ত তোমাদের কর্ত্তব্য কি? যেমন তোমরা শিষ্য হইবে, তেমনই তোমাদিগকে তাঁহার অলৌকিক কার্য্যের সাক্ষ্য দিতে হইবে। এখনও ব্রাহ্মদিগের গুরুতর কর্ত্তব্য সাধন হয় নাই। তাঁহাদিগকে এখন সাক্ষী হইয়া জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় ঈশ্বরের কথা বলিতে হইবে। যদি পৃথিবীর মধ্যে কোন ব্যক্তি, বিশেষরূপে যথার্থ সৌভাগ্যশালী হইয়া থাকেন তিনি ব্রাহ্ম। কেন না তিনি সেই স্বর্গের রত্ন পাইয়াছেন যাহা নিত্য, অবিনশ্বর পরমধন। পৃথিবীর ধন সম্পদ পাইলে কি সৌভাগ্য হয়? যদি পরিত্রাণের পথ দেখা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট আলোক হয়, তাহা ব্রাহ্মেরা পাইয়াছেন, অতএব ব্রাহ্ম অপেক্ষা সৌভাগ্যশালী আর কে আছে?

জগতের নিকট এই সাক্ষ্য দিব যে ঈশ্বরের কাছে আমরা পরিত্রাণের পথ দেখিয়াছি, এবং সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যে ব্রাহ্মধর্ম্ম, আমরা তাহার মিষ্টতা আস্বাদ করিয়াছি। পাপী হইয়াও যদি পরিত্রাণের পথ দেখিলে সৌভাগ্য হয়, তাহা বঙ্গদেশে হইয়াছে। যথার্থ স্বর্গের সৌভাগ্য-চন্দ্র যদি কোথাও উদিত হইয়া থাকে, তাহা এই বঙ্গদেশের পাপী ব্রাহ্মদিগের জীবনে দেখ। এই যে কতকগুলি লোক দিন

দিন, মাসে মাসে, বৎসরে বৎসরে ঈশ্বরের উপাসনা, সাধন ভজন এবং তাঁহাকে প্রার্থনা করিতেছেন, এ সকল ব্যাপারের মধ্যেই রাশি রাশি অন্ধকার ভেদ করিয়া সেই সৌভাগ্য-জ্যোৎস্না উঠিতেছে। সৌভাগ্য কে না বুঝিতে পারে? অন্য বিষয়ে আমরা মূর্খ হই ক্ষতি নাই, কেন না যখনই আমরা ভাবি আমরা গরিব কয়েকটী ভাই, ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম, এখন আমরা কোথায় আসিয়াছি, তখন আমাদের সৌভাগ্য দেখিয়া আনন্দ আর ধারণ করিতে পারি না। প্রেমময় ঈশ্বরের হস্ত হইতে তাঁহার প্রেমামৃত ব্রাহ্মধর্ম্মরূপে পাপীদের হস্তে আসিল। সেই মহাপাতকী আমরা নিরাকার ঈশ্বরের রূপ দর্শন করিতেছি, ইহা কি সৌভাগ্য নহে? আমাদের কঠোর প্রাণে ঈশ্বরের প্রসাদবারি বর্ষিত হইয়া প্রেম-বীজ, ভক্তি-বীজ অঙ্কুরিত হইল, ইহা কি সামান্য সৌভাগ্যের বিষয়? এই বঙ্গদেশে আমরা কয়জন পাপী ভাই বলিতেছি, নিরাকার ঈশ্বরকে দেখা যায়, অবিশ্বাসীগণ, ইহাতে তোমরা আপত্তি কর কেন? আমরা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, একবার যে প্রাণের সহিত কাঁদিতে পারে, তখনই সে নিরাকার ঈশ্বরকে দেখিতে পায়। কে ইহার সাক্ষী? ব্রাহ্ম তুমি। আক্ষেপের বিষয় এই, ব্রাহ্মেরা ভাবেন না তাঁহাদের কত সৌভাগ্য।

এই যে এত বৎসর ব্রাহ্ম হইয়া বঙ্গদেশে বাস করিতেছি, হে ঈশ্বর! ইহা অপেক্ষা আর সৌভাগ্য হইতে পারে না। ধন, মান ও পরিবার বন্ধুজনে কি হইবে? আমরা যে ব্রাহ্ম হইয়াছি। পৃথিবীর পাপ মোহিনী-মূর্ত্তি দেখাইয়া কতবার কাঁপাইল। সভ্যতা ও জ্ঞানদর্প কত প্রলোভন দেখাইল, এ সমুদয়ের

মধ্যে এখনও যে বাঁচিয়া আছি, এখনও সে কুসংস্কার দুরাচার-সাগরে ডুবি নাই, ইহাতে আমাদের কত সৌভাগ্য! আমরা পাঁচজন ভাই মিলিত হইয়া দয়াল প্রভুর সংবাদ পরস্পরকে বলিতে পারি এই আমাদের স্বর্গ। ইহাতে আমরা যে পাপী, ইহা কি অস্বীকার করি? কিন্তু পাপী হইয়াও আমাদের এত সৌভাগ্য হইল, ইহাতেই আমাদের এত অধিক আনন্দ। সাধু হইলে এত সৌভাগ্য মনে হইত না। ভক্তির পবিত্রজলে ভক্ত তাঁহাকে দেখিবেই; কিন্তু পাপীর মন যখন অনুতাপ-জলে আর্দ্র হইয়া তাঁহাকে দেখে, তাহা অপেক্ষা আর পাপীর সৌভাগ্য কি হইতে পারে? আমরা কয়েকজন পাপী ব্রাহ্ম এমন সুন্দর সংবাদ পাইয়াছি, এখন জগতের নিকট ইহার সাক্ষী হইতে হইবে। আজ এই দুর্গাপূজা উপলক্ষে কত ভাই ভগ্নী হাসিতেছেন বটে; কিন্তু তাঁহাদের হৃদয় কাঁদিতেছে। দেশের ভাই ভগ্নীদের পায়ে পড়িয়া জিজ্ঞাসা করি, ভাইগণ, ভগ্নিগণ, তোমাদের মুখ যখন হাসে, তখন কি তোমাদের প্রাণ কাঁদে না? এমন প্রিয় পরমেশ্বর দেশে আসিয়াছেন, কেন তাঁহাকে দেখিলে না? ব্রাহ্ম, তোমাকেও বলি, তুমি যে সাক্ষীর নিয়োগ-পত্র পাইয়াছ, তাহার কি করিলে? তোমরা কি শুনিতেছ না, পৃথিবীর নর নারী সকলে বলিতেছে, কৈ নিরাকার ঈশ্বরকে দেখা যায়, ইহার যথার্থ সাক্ষ্য ত কেহই দিল না। আমাদের পিতার যে কতকগুলি ভাল সাক্ষীর প্রয়োজন হইয়াছে। প্রেমসিন্ধু পিতা নিরাকার; কিন্তু তিনি মিষ্টতায় পরিপূর্ণ। ব্রাহ্মসমাজ, তোমার ক্রোড়ে যতগুলি ব্রাহ্ম বসিয়া আছেন, সকলকে তুমি দয়াময় পিতার সাক্ষী করিয়া লও। যে সাক্ষী নহে, সে ব্রাহ্ম নহে। যদি সাক্ষ্য না দাও, তবে

পিতা তাঁহার পুত্র বলিয়া, যথার্থ ব্রাহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিবেন কিরূপে ?

তোমাদের চরিত্র পবিত্র করিয়া দয়াময় পিতাকে এমনই ভাবে প্রচার কর যে, জগৎ বলিবে, সমুদ্র যাঁহার প্রেম দেখাইতে পারিল না, এই কয়েকজন ভক্ত সাক্ষীর দুই চারি বিন্দু চক্ষের জল সেই প্রেমসিন্ধুকে দেখাইয়া দিল। ব্রাহ্ম ভাই, তোমার চরিত্রকে নির্ম্মল কর, ঈশ্বর আপনি তোমার জীবন দ্বারা জগতে আপনার সাক্ষ্য দিবেন। অন্ধকার রজনী কেমন ভয়ানক, তোমরা কি জান না? যে সকল স্ত্রী পুরুষ আজ দয়াময় নাম করিয়া স্বর্গের সুখ ভোগ করিতে পারিতেন, আজ তাঁহারা নরকের অন্ধকার এবং ব্যভিচার-সাগরে ডুবিতেছেন। এই নরকের রজনী যেখানে, এই ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্র আলোক আবার সেখানেই। এক দিকে এই নরকের ছবি, অপর দিকে এই স্বর্গের আলোক। এই দুই ছবি দেখাইয়া কি বলিতে হইবে, ব্রাহ্মগণ, তোমাদিগকে ব্রহ্মের সাক্ষী হইয়া বাহির হইতে হইবে। তোমাদের এত সৌভাগ্যের মধ্যে দেশের এই দুর্ভাগ্য। হা ব্রাহ্মগণ, তোমরা কি ইহা দেখিতেছ না? তোমরা প্রচারক হইয়া চারিদিকে ধাবিত হও এই কথা বলিতেছি না, কিন্তু ইহা বলিতেছি তোমরা প্রকৃতরূপে উপাসনাশীল হইয়া চরিত্র নির্ম্মল কর, তাহা হইলে তোমাদের ঈশ্বরের প্রতি সকলের মন প্রাণ আকৃষ্ট হইবে। জগৎ যখন দেখিবে তোমরা যথার্থই ঈশ্বরের সাক্ষী হইয়া সুখী হইয়াছ, তখন আর তাহারা পিতাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না। যাঁহার সাক্ষীর প্রয়োজন আছে সেই পূর্ণ ঈশ্বর তোমাদের কয়েকজনকে ডাকিতেছেন। তিনি যে

এই দেশে সহস্র সহস্র ব্রাহ্ম প্রস্তুত করিলেন, এইজন্য যে তাহারা সাক্ষী হইয়া, তাঁহার সহযোগী হইয়া—(কি আশ্চর্য্য! কি উচ্চ অধিকারের কথা!)—তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়া, এ সকল সামান্য মনুষ্য, জগতে তাঁহার রাজ্য বিস্তার করিবে। ঈশ্বর ডাকিতেছেন, তোমরা সকলে তাঁহার পথের অনুগামী হও।

হে ঈশ্বর, এখনও তোমাকে ডাকিতে পারিতেছি। কি আমি, তুমি বা কে? কত প্রভেদ! পৃথিবীর লোক বলে পাপী কি কখনও পুণ্যময় ঈশ্বরকে দেখিতে পারে? জগতের লোক যাহা অসম্ভব বলিয়া জানে তাহা আমাদের জীবনে সত্য হইল। পিতা, ইহা কি সত্য নহে, নির্জনে, বৃক্ষতলে তোমাকে দেখিয়াছি, তোমার সঙ্গে সদালাপ করিয়াছি, তোমার সুমিষ্ট কথা শুনিয়া জীবনের সকল দুঃখ যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়াছি? পিতা, এ সকল ত স্বপ্ন নহে। আমরা ত নিজে ইচ্ছা করিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসি নাই। আজ ত এই ভয়ানক রজনীতে পাপ অধর্ম্মে ডুবিয়া থাকিতাম, কেন আমাদিগকে বাঁচাইয়া আনিলে? যদি ব্রাহ্ম না করিতে, আমাদের কি দুর্দ্দশা হইত। দুষ্কর্ম্ম করিতাম, নিজের এবং অন্য লোকের সর্ব্বনাশ করিতাম। পিতা, এত যে দয়া করিলে কৃতজ্ঞতা কি দিয়াছি? সাক্ষী হইয়া দশজনের কাছে কি বলিয়াছি, তুমি কেমন দয়াময়। হে দীনগতি, তুমি বাঁচাইলে তাই এত সৌভাগ্য। রত্ন পুরাতন হইলে তাহার মূল্য কেহ বুঝিতে পারে না, আমাদেরও বুঝি সেই দুর্দ্দশা হইল। হে দীননাথ, বড় উপকার করিলে, জীবন কিনিয়া রাখিলে। আশীর্ব্বাদ কর, যেন চিরদিন তোমাকে দেখিয়া চরিত্র নির্ম্মল করি, এবং তোমার সাক্ষী হইয়া জগতে তোমার

দয়ার সাক্ষ্য দিতে পারি। ব্রহ্মমন্দিরের রাজা, তুমি কৃপা করিয়া উপাসকদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

ব্রহ্মবাণী। *

রবিবার, ৯ই কার্ত্তিক, ১৭৯৬ শক; ২৫শে অক্টোবর, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

ভয়ানক সংসার-কোলাহল মধ্যে আমরা বসিয়া আছি। সময়ে সময়ে ইহার মধ্যে স্বর্গ হইতে নূতন প্রকার শব্দ সকল আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে। সর্ব্বদাই সংসারের কঠোর দুর্ব্বাক্য সকল শুনিতেছি। আমরা সেই অসার কোলাহল মধ্যে দিবস যামিনী বাস করিতেছি। সংসারের কথা এক দিকে, স্বর্গের কথা অপর দিকে; মনুষ্যের কথা এক দিকে, ঈশ্বরের কথা অপর দিকে। মধ্যে মধ্যে এই সংসারের কোলাহলের ভিতর দিয়া অপর দিক হইতে যে শব্দ আসিতেছে তাহা আমরা শুনি না। এই পৃথিবীর হৃদয়-বিদারক ভয়ানক শব্দগুলি এক দিকে, স্বর্গের সুমিষ্ট কথা সকল অন্য দিকে। নিরাশ করিতে পারে, মনকে জর্জ্জরিত করিতে পারে, প্রাণকে ক্ষত বিক্ষত করে, এমন সকল কথাই অধিক। অবশ্যই তোমরা আপনার পরিবার মধ্যে, বন্ধু বান্ধবদিগের মধ্যে এবং যাহাদের সঙ্গে বিষয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাক, তাহাদের প্রমুখাৎ এ সকল কথা শুনিতেছ। সাধু তিনি, ধন্য তিনি যিনি সংসারের এই কোলাহল মধ্যে থাকিয়াও ঈশ্বরের কথা শুনিয়া প্রাণকে শুদ্ধ এবং সুখী করেন। ঈশ্বরের কথা কি আসিতেছে না? কিন্তু সংসার-কোলাহলে কে তাহা শুনিতে পায়? আমার শরীর মনের অত্যন্ত

নিকটে সংসার দিবা রাত্রি চীৎকার করিতেছে, তাহা ভেদ করিয়া কিরূপে স্বর্গের সেই একটী ক্ষুদ্র কথা কত সহস্র ক্রোশ অতিক্রম করিয়া আমার নিকট আসিবে? সংসার-কোলাহল আমাদিগকে এমনই ব্যস্ত করিয়াছে যে, আমরা স্বর্গের কথা শুনিতে পাই না। যাঁহারা ঈশ্বরের নিকটে আছেন তাঁহারা স্বর্গের কথা সকল সুস্পষ্ট-রূপে শুনিতে পান। যতই আমরা স্বর্গের নিকটস্থ হই, ততই স্বর্গের কথা সকল সুস্পষ্টরূপে আমাদের হৃদয় অধিকার করে। কিন্তু কত অল্প সময় আমরা স্বর্গের কথা শুনি। যদি জিজ্ঞাসা করি, ব্রাহ্ম! তুমি কতবার স্বর্গের শব্দ শুনিয়াছ? তিনি বলিবেন ঈশ্বর-মুখ-বিনিঃসৃত-সদুপদেশ আমি অতি অল্পবারই শুনিয়াছি। কিন্তু সংসারের জঘন্য ভয়ঙ্কর শব্দ সকল যাহা অন্ধকার ও নিরাশা আনিয়া দেয়, সর্ব্বদাই তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। আমরা একটু ধার্ম্মিক হইলে সংসারের তাহা সহ্য হয় না। তখনই সংসার নানা প্রকার কুটিল কথা শুনাইয়া আমাদিগকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করে। চল্লিশ বৎসরের ব্রাহ্মও পুরাতন পাপ ছাড়িতে পারিল না। বারবার পোষিত রিপুদিগকে তাড়াইয়া দাও আবার তাহারা তোমার হৃদয় মধ্যে পুনর্জ্জীবিত হইবে।

এইরূপে যাহাতে নিরাশ-কূপে পড়িয়া আমাদের সর্ব্বনাশ হয়, সংসার এই সকল কুমন্ত্রণা দিতেছে। যাহাতে ধর্ম্মের অগ্নি আরও প্রজ্বলিত হয় সংসার আমাদিগকে তেমন শব্দ শুনাইবে না। পৃথিবীতে ধর্ম্মের জয় হয় না, প্রেম থাকে না, ভক্তি থাকে না—এ সকল কথাই সংসার বলে। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছে, প্রচারকেরা দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিতেছেন, সংসার বলিবে ঐ

দেখ কিছুই স্থায়ী নহে, স্থানে স্থানে সময়ে সময়ে একটু ধর্ম্মোৎসাহ প্রজ্বলিত হয় সত্য; কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই সেই অগ্নি নির্ব্বাণ হয়। এ সকল কথা-বিষ পান করিয়া কত শত উৎসাহী ব্রাহ্ম মরিল। কত কালের বন্ধুতা, প্রণয় হয় ত একটী কথা দ্বারা ভস্মীভূত হইল। কে সেই কথা বলিল? সংসার। এই দুরন্ত সংসার দিন রাত্রি সেই সকল কথা বলিতেছে যাহাতে আমরা আর ব্রাহ্মসমাজে না থাকি, ব্রহ্মমন্দিরে আসিতে না হয়, আর যৌবনের উৎসাহের সহিত ধর্ম্মপ্রচার না করি। দিবা রাত্রি সর্ব্বদাই সংসার কুমন্ত্রণা-জাল বিস্তার করিতেছে। কিন্তু আমাদের পরম সৌভাগ্য যে ইহার মধ্যেও দয়াময় করুণা করিয়া আমাদের কর্ণে তাঁহার দুই একটী কথা প্রেরণ করিতেছেন। ঘোরান্ধকারপূর্ণ-নিশীথ সময়ে যেন সহস্র ক্রোশ দূর হইতে এক একটী শব্দ আসিতেছে। ঈশ্বর সর্ব্বদাই নিকটে থাকিয়া কথা কহিতেছেন। কিন্তু সংসারি! তুমি বধির হইয়াছ, কেমন করিয়া তাহা শুনিবে? যদি সেই কথা শুনিতে চাও, তবে আরও স্বর্গের নিকটে যাও। স্বর্গীয় পিতার মুখের নিকট উপস্থিত হও, সেই শব্দ স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে। যিনি স্বর্গের নিকটস্থ তিনি ঈশ্বরের কথা তেমনই স্পষ্টরূপে শুনিতে পান যেমন সংসারী ব্যক্তিরা সংসারের কথা শুনিতে পায়। যদি পৃথিবীর কুটিল কুমন্ত্রণা বিনাশ করিতে চাও তবে সুস্পষ্টরূপে ঈশ্বরের কথা শুনিতে চেষ্টা কর।

অনেক কাল যাহারা সাধন ভজন করিল তাহাদের দুর্দ্দশা কি দেখ নাই সংসার এই কথা বলিয়া ভয় দেখাইতেছে। বাস্তবিকই ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে অনেকের বারম্বার পতন এবং

অনুন্নতি দেখিতেছি, অল্পবিশ্বাসীরা এ সকল দেখিয়া নিরাশ এবং নিরুৎসাহ হইতেছে; কিন্তু যাঁহারা পূর্ণবিশ্বাসী তাঁহারা এ সকল দুর্ঘটনার মধ্যেও ঈশ্বরের মঙ্গলহস্ত দেখিয়া আশার কথা শুনিতেছেন, আশার শাস্ত্র পাঠ করিতেছেন। ঈশ্বর কি বলিতেছেন? সর্ব্বদাই তিনি আশার কথা বলিতেছেন। নিরাশা, অন্ধকারের কথা তিনি কখনও বলেন নাই, বলিতে পারেন না। তাঁহার যে কথায় অন্ধের চক্ষু হয়, মৃতের প্রাণ হয়, হায়, কি দুর্ভাগ্য! আমরা সেই কথা শুনি না। ঈশ্বরের এই প্রাণপ্রদ, আশাকর কথা আমাদের অন্তরে আসিতেছিল, মনে হইল বুঝি ঘোর নিরাশা-সাগরে একটী আশা-দ্বীপ পাইলাম; কিন্তু এমন সময়ে আবার সেই সংসারের রণক্ষেত্র হইতে, "মার্ মার্" বলিয়া ভয়ঙ্কর শব্দ উঠিল। সেই আশা-দ্বীপ অদৃশ্য হইল। আবার একটী স্বর্গের কথা শুনিবার উপক্রম হইল, স্বর্গের দিকের আকাশ একটু উজ্জ্বল হইল, আবার নিষ্ঠুর সংসার-কোলাহল তাহা গ্রাস করিল। অধিকাংশ ব্রাহ্মের এই অবস্থা। সে মিথ্যাবাদী যে বলে ঈশ্বরের কথা শুনা যায় না। লোকে শাস্ত্র চায় কেন? ঈশ্বরের এক কথা সংসারের লক্ষ কথা গ্রাস করে। ঈশ্বরের কথা সমস্ত দিন রাত্রি, সমস্ত বৎসর অবিশ্রান্ত আসিতেছে, কর্ণের অতি নিকটে আসিল; কিন্তু আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিল না। মুখের কাছে অমৃত, অথচ রসনা তাহা পান করিল না।

ঈশ্বর বারম্বার এই সুধাময় কথা বলিতেছেন, "পাপী, আমি তোমার আশা ভরসা। আমি কোন্ পাপীকে বলিয়াছি যে তুমি আমার ত্যাজ্য পুত্র, তোমার নাম আর স্বর্গের পুস্তকে থাকিবে

না?" ব্রাহ্মগণ, তোমরা কি এমন কোন মহাপাপীর কথা শুনিয়াছ ঈশ্বর যাহাকে চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিলেন? কেহই ঈশ্বরের নামে এই অপবাদ প্রচার করিতে পারে না। ঈশ্বর বলিতেছেন;—"বল সন্তান, কোন্ দিন আমি তোমাকে আর ভালবাসিব না, এই কথা বলিয়াছি। নির্ব্বোধ সন্তান, তুমি যে নিজে বলিতেছ, তোমার পরিত্রাণ হইবে না, ঈশ্বর আর আমার উদ্ধারের কোন উপায় করিবেন না।" বাস্তবিক ঈশ্বরের মুখে কে নিরাশার কথা শুনিয়াছে? ঈশ্বর বলিতেছেন;—"আমি ঈশ্বর হইতাম না যদি আমার মুখ হইতে নিরাশার কথা বাহির করিতে পারিতাম।" "তুমি অত্যন্ত জঘন্য ভয়ঙ্কর পাপী অতএব তোমাকে পরিত্যাগ করিব" এই কথা কি ঈশ্বর বলিতে পারেন? যে দিন আমরা মহাপাপে কলঙ্কিত হইয়াছি সেই দিনও তিনি নিরাশার কথা বলেন নাই। "তোমার আর পরিত্রাণের আশা ভরসা নাই, তুমি এমনই নীচ জঘন্য কাজ করিয়াছ যে আর তুমি স্বর্গে থাকিতে পার না।" পৃথিবী হওয়া অবধি কাহাকেও ঈশ্বর এই নিরাশার কথা বলেন নাই। তিনি চিরকালই তাঁহার সন্তানদিগকে আশাকর, উৎসাহকর কথা সকল বলিয়া আসিতেছেন।

যিনি নিত্য উৎসাহদাতা এবং আশার দেবতা সেই ঈশ্বরের শিষ্য আমরা, সেই দয়াময়ের সন্তান আমরা। চিরকালই আমরা ইহাঁর মুখে আশার কথা শুনিয়া আসিতেছি। প্রাণেশ্বরের কাছে নিরাশার একটী বর্ণও শুনি নাই। দুঃখের বিষয় প্রাণ-নাথের কথা বারম্বার শুনিয়াও হৃদয়ে তাহা ধরিয়া রাখিতে পারি না। ঈশ্বর সর্ব্বদাই কথা কহিতেছেন। অতএব যেখানে সংসার-

কোলাহল নাই, যেখানে কিছুই কর্ণকে বধির করিতে পারে না, সেই স্থানে সময়ে সময়ে উপবিষ্ট হও। স্বর্গকে ডাকিয়া বল, স্বর্গ! তুমি নিকটে এস, এখন তোমার কথা শুনিব, যত উপদেশ দিতে পার দাও, তুমি কথা কহ। হে স্বর্গ! তোমার কোলাহলে আমাদিগকে মত্ত কর, সংসারের ভয়ানক চীৎকার যেন তোমার গভীর শব্দে বিলীন হইয়া যায়। আর যেন সংসারের কথা জয়লাভ না করে। কেমন আনন্দের সেই অবস্থা যখন সাধক আর সংসারের কথা শুনিতে পান না। যে কর্ণে সংসারের কথা প্রবেশ করে, তাঁহার সেই কর্ণ মৃত হইয়াছে। তাঁহার কত সৌভাগ্য! তিনি আর ইহজীবন কিম্বা পরজীবনে সংসারের কুটিল কুমন্ত্রণা শুনিতে পাইবেন না। চিরকালই স্বর্গের কথা, আশার কথা, ব্রহ্মবাণী শুনিতে শুনিতে তাঁহার জ্ঞান, প্রেম এবং পুণ্য বৃদ্ধি হয়। ঈশ্বরের প্রত্যেক কথা প্রাণপ্রদ, আশাপ্রদ। এমন কথা ছাড়িয়া কেন সংসার-কোলাহলে প্রাণকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছ? সংসার-কোলাহলের দৌরাত্ম্যে কিছুতেই কিছু হইল না বলিয়া কেন নিরাশ হইতেছ? ভাল কথা শুনিলে না, কেবলই সংসারের যন্ত্রণাদায়ক কথা সকল শুনিয়া, প্রাণ গেল, হৃদয় বিদীর্ণ হইল বলিয়া কেন কাঁদিতেছ। ব্রাহ্মগণ, সেই দিকে কেন চলনা যেখানে স্বর্গের উল্লাসকর কথা সকল শুনিবে। সাধক ব্রাহ্ম! তুমি চল, একটী কথা শুনিলে যদি অবিশ্বাস চলিয়া যায়, তবে সেই কথা শুন না কেন? নিয়ত ঈশ্বরের অমৃতময় উপদেশ সকল শুন, তাঁহার সুমিষ্ট কথা শুনিবার জন্য সর্ব্বদাই আত্মার দ্বার খুলিয়া রাখ। তাঁহার এক একটী মহামন্ত্র উর্ব্বরা ভূমিতে পড়িবা মাত্র অঙ্কুরিত হইয়া

স্বর্গীয় ফল প্রসব করিবে। তাঁহার এক একটী জীবন্ত বাক্যে এমন অগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে যে তাহাতে মহাপাপী পবিত্র হইবে, পাষণ্ড ভক্ত হইবে। এমন সকল ঘটনা যদি আমাদের মধ্যে না হয়, তবে কিসের জন্য উপাসক সভার জীবন? ঈশ্বরের সত্যপূর্ণ মন্ত্র সকল শুনিয়া ব্রাহ্মসমাজ সঞ্জীবিত হউক!

ধর্ম্মজীবন কি ? *

রবিবার, ১৬ই কার্ত্তিক, ১৭৯৬ শক; ১লা নবেম্বর, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

ধর্ম্মজীবন কতকগুলি ঘটনার সমষ্টি নহে। ধর্ম্মজীবন একটী ব্রত পালন। ইহার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবল সেই ব্রত পালন। ঈশ্বর হইতে জীবনের ব্রত লাভ করিয়া তাঁহারই সাহায্যে তাহা সাধন করিব। সাধন ভিন্ন ধর্ম্মরস আস্বাদ করিতে পারি না। ঈশ্বরের নিকট যে ব্রত গ্রহণ করিবে, তাহা লঙ্ঘন করা মহাপাপ জানিবে। ঈশ্বর আমাদের প্রভু, আমরা তাঁহার দাস। তিনি প্রতি জনের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া আজ্ঞা প্রকাশ করিতেছেন। এই আজ্ঞা শুনিয়াই লোকে ধর্ম্মজীবন আরম্ভ করে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, অনেকে ধর্ম্মজীবন আরম্ভ করিয়া তাহা প্রস্ফুটিত করিতে চেষ্টা করে না। তাহাদের জীবন চঞ্চল। সামান্য বিপদ কিম্বা কোন বিষয়ে আপনাদের চেষ্টাকে বিফল হইতে দেখিলেই তাহাদের মন অবসন্ন হয়। আমরা সকলেই ঈশ্বরের দাস ইহা কে না স্বীকার করে? কিন্তু আমরা ধর্ম্মকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করি না। এই বিষয়ে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিকট আমাদের অনেক শিখিবার

আছে। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে, বিশেষতঃ এ দেশের স্ত্রীলোক-দিগের মধ্যে ব্রত পালনের জন্য কেমন দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়! সহস্র বিঘ্ন বিপদ আসে আসুক, সংসারের অবস্থা কিম্বা মনের ভাব প্রতিকূল হয় হউক, তথাপি কিছুতেই তাঁহারা তাঁহাদের ব্রত লঙ্ঘন করেন না। তাঁহারা কুসংস্কারাবিষ্ট, সত্য; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এই একটী ভাব দেখা যায় যে, যাহা তাঁহারা একবার ব্রত বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহা প্রাণপণ সাধন করিতে যত্ন করেন। ইহার কারণ, তাঁহারা শাস্ত্রের উপর, গুরুর উপর নির্ভর করেন। যদিও সেই অবলম্বিত ব্রতটী তাঁহাদের নিকট অসার বলিয়া বোধ হয়, তথাপি তাহা গুরুর আদেশ বলিয়া অটল অধ্যবসায় এবং যত্নের সহিত তাহা সাধন করেন।

ব্রাহ্ম হইয়া অসার ব্রত কিরূপে গ্রহণ করিব? যাহাতে আত্মার পরিত্রাণ হয় না সেই ব্রত আমরা গ্রহণ করিব ইহা হইতে পারে না। আমরা কোন শাস্ত্র মানি না, আমরা কোন উপদেষ্টার নিয়মে বদ্ধ নহি, ইহাই আমাদের অহঙ্কার। কুসংস্কার অতিক্রম করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া আমরা কাহারও শাসন মানি না। কিন্তু যদিও আমাদের উপরে কোন সামাজিক শাসন নাই, ঈশ্বর স্বয়ং আমাদের শাসনপতি। এবং যদিও কোন বাহ্যিক পুস্তক আমাদের শাস্ত্র নহে; কিন্তু শাস্ত্রের শাস্ত্র পরম শাস্ত্র আমাদের হৃদয়ের মধ্যে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমাদের জন্য এই ব্রত, আমাদের মনে যদি রিপু থাকে তাহা দমন করিবার এই উপায়। আমরা যদি ভ্রাতাকে অকারণে নির্যাতন করিয়া থাকি, তাহার এই প্রায়শ্চিত্ত, যদি ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে কলহ বিবাদ করিয়া থাকি, তাহা হইলে

এক মাস এই ব্রত পালন করিতে হইবে। এই সমুদয় বিধি সেই পুস্তকের ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদে লিখিত রহিয়াছে। অবিশ্বাসীরা এ সকল বুঝিতে পারে না। ঈশ্বর আমাদের জন্য বাহিরের কাগজে শাস্ত্র লেখেন নাই; কিন্তু অন্তরের অন্তরে তিনি আমাদের সঙ্গে কথা কন; যদি সেই স্বর্গের কথা শুনিয়া জীবন পবিত্র করিতে চাও, এবং সকল সংশয় দূর করিতে ইচ্ছা কর, তবে সেই হৃদয়ের ঘরে প্রবেশ করিয়া ঈশ্বরের সঙ্গে সদালাপ কর, সমুদয় বিবাদের মীমাংসা হইবে। তিনি যাহা করিতে বলিবেন, তাহা না করিলে আমাদের জীবন সার্থক হইবে না। ইহার উপর আমাদের পরিত্রাণ নির্ভর করিতেছে, তাঁহার আদেশ পালন না করিলে আমাদের জীবন মৃত্যু সমান। প্রত্যেকেরই বিশেষ ব্রত আছে। অতএব ঈশ্বর যে ব্রত বলিয়া দিয়াছেন প্রত্যেককেই চিরজীবন সেই ব্রতে ব্রতী হইয়া থাকিতে হইবে। তুমি ধনী হও, কি দীন হও, মূর্খ হও, কি জ্ঞানী হও, কি নির্জনে কি বন্ধুদিগের সঙ্গে, ঐ ব্রত পালন করিতেই হইবে।

যখন কোন রিপু প্রবল হইবে তখন কি বিশেষ ব্রত অবলম্বন করিবে, তাহাও ঈশ্বর তোমার সেই অন্তরের অন্তরে লিখিয়া দিয়াছেন। পাপ করিলে প্রায়শ্চিত্ত আছে ইহা সকল শাস্ত্র সম্মত। প্রায়শ্চিত্তকে যাহারা বাহিরের ব্যাপার মনে করে তাহারা যথার্থ নিগূঢ় তত্ত্বদর্শী নহে। বাস্তবিক চিত্ত সংস্করণের সমুদয় গূঢ় তত্ত্ব, জীবাত্মার গূঢ়তম স্থানে লিখিত রহিয়াছে। তুমি চিত্তকে পরিশুদ্ধ করিবার জন্য যদি ব্যাকুল হইয়া থাক, তবে অন্তর খনন করিয়া সে সমুদয় তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারিবে। সেখানে প্রবেশ করিলে দেখিবে ঈশ্বর অঙ্গুলি দ্বারা দেখাইয়া দিতেছেন;—"বৎস, ব্রহ্মভক্ত, তুমি

দুই ঘণ্টা, পাঁচ দিন কিম্বা দশ বৎসর বিশেষরূপে এই ব্রত সাধন কর, আসন্ন বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবে।" ঈশ্বর হইতে বিধি প্রকাশিত হইল, তুমি তাহা অবলম্বন করিয়া সাধন কর। দেখিবে তিনি স্বয়ং হস্ত ধারণ করিয়া তোমাকে ভয়ানক বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন। ব্রত পালনে যদি কিছুমাত্র ত্রুটি না হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাতে তোমার পরিত্রাণ হইবে। কেন না ঈশ্বর এবং তাঁহার অঙ্গীকার সত্য। দুঃখের বিষয় দুর্ব্বল অল্পবিশ্বাসী মনুষ্য ঈশ্বরের বাক্যকে কুসংস্কার মনে করে। একটী বিশেষ ব্রত অবলম্বন করিলে পাঁচ দিনে চিত্ত শুদ্ধ হইবে, ইহাও কি সম্ভব, এরূপ সন্দেহ এবং কুতর্কজাল বিস্তৃত করিয়া অবিশ্বাসী আপনার জালে আপনি বদ্ধ হইয়া মরে। ঈশ্বর আজ্ঞা করিতেছেন;—"বিশ্বাসের সহিত ভক্তির সহিত দুইবার তুমি দয়াল নাম কর বিঘ্ন বিপদ আপনা আপনি চলিয়া যাইবে।" কিন্তু অনেক ব্রাহ্ম ঈশ্বরের কথা প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "একেবারে কি হয় না?" এই বলিয়া তাঁহারা ঈশ্বরের কথা মানিলেন না। ঈশ্বর জ্ঞানী, মূর্খ, যুবা বৃদ্ধ সকলের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিশেষ বিশেষ ব্রত নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেছেন, সেই ব্রতকে খণ্ড খণ্ড করিতে, কিম্বা তাহার সময় সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন করিতে, আমাদের ক্ষমতা নাই, কোন অধিকার নাই। চিরকাল প্রগাঢ় নিষ্ঠা এবং নিত্য উৎসাহের সহিত তাহা পালন করিতে হইবে। ব্রত পালন সম্পর্কে এ দেশীয় লোকদিগের অধ্যবসায় ধন্য। অসার অসত্য-মূলক ব্রত পালন করিতে তাঁহাদের কত যত্ন কেমন উৎসাহ! ধিক্ ব্রাহ্মকে যে তিনি সত্য পালন করিতে এরূপ শিথিল।

আমরা মনে করি একটী ব্রত গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া যে উচ্চতর

ব্রত গ্রহণ করিব না এমন কোন শাস্ত্র নাই। কিন্তু ইহা আমাদের ভ্রম এবং পাপ, কেন না যাহা জীবনের ব্রত বলিয়া একবার গ্রহণ করিয়াছি তাহা কখনই পরিত্যাগ করিতে পারি না। কি উপাসনা সম্পর্কে কি চিত্তশুদ্ধি সম্পর্কে, কি পরস্পরের সম্বন্ধে যে যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছি শেষ পর্য্যন্ত তাহা পালন করিতে হইবে। যে বিধি যে ব্রত অথবা যে সাধন প্রণালী আমরা গ্রহণ করিব তাহা কত দিনের জন্য ? যতদিন না উদ্দেশ্য সাধিত হয়। তুমি যে কামরিপু ইত্যাদি দমন করিতে ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলে তাহা পরিত্যাগ করিলে কেন ? বাস্তবিক ব্রত লঙ্ঘন করা একটী পাপ। ব্রত পালন কি ? পাপের ঔষধ সেবন। ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া সমস্ত হৃদয়কে যেমন চিরকাল তাঁহার প্রতি ভক্তিরসে অভিষিক্ত করিয়া রাখিতে হইবে, সেই প্রকার তিনি যে সকল ব্রত সাধন করিতে বলিবেন, চিরকাল তাহা পালন করিতে হইবে, একদিন লঙ্ঘন করিলে তাঁহার এবং ব্রাহ্মসমাজের নিকট পাপী হইতে হইবে। ঈশ্বরের আদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া চিরকালই অন্তরের প্রেম পুণ্য বৃদ্ধি করিতে হইবে। দিন দিন অন্তরে প্রবেশ করিয়া ঈশ্বরের আদেশ সকল শ্রবণ কর, দেখিবে জীবন পবিত্র হয় কি না। আবার অনুরোধ করিতেছি, ব্রাহ্মগণ, বাহিরের পুস্তক দগ্ধ করিয়া অন্তরের অন্তরে ঈশ্বরের স্বহস্ত-লিখিত সেই বেদের এক একটী পরিচ্ছেদে ঈশ্বর পরিষ্কার-রূপে যে সকল শ্লোক লিখিয়া রাখিয়াছেন সে সমুদয় অধ্যয়ন কর, জগদ্গুরু ঈশ্বর স্বয়ং সাহায্য করিবেন। এমন শাস্ত্র আর কোথাও পাইবে না। ইহাতে ঈশ্বর স্বহস্তে চিত্ত সংস্করণের উৎকৃষ্ট রীতি সকল লিখিয়াছেন। ঈশ্বর আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য নিজে

গূঢ়ভাবে এ সকল লিখিয়া দিতেছেন। আমাদের ভয় কি? এস সকলে আমরা উৎসাহ অগ্নিতে পূর্ণ হইয়া নিত্য ঈশ্বর-প্রদত্ত জীবনের ব্রত সকল পালন করি, ঈশ্বর আশা দিতেছেন নিশ্চয়ই আমরা স্বর্গরাজ্যে গিয়া তাঁহার ব্রত পালনের যে শুভ ফল তাহা অনন্তকাল সম্ভোগ করিব।

সংসার বিদ্যালয়।

রবিবার, ২৩শে কার্ত্তিক, ১৭৯৬ শক; ৮ই নবেম্বর, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

ক্ষুদ্র বীজের ভিতর প্রকাণ্ড বৃক্ষ। পঙ্কের মধ্যে সুন্দর পদ্মের উৎপত্তি। এ সকল ব্যাপার দেখিলে মনুষ্য যত কেন ক্ষুদ্র ও জঘন্য হউক না তাহাকে ঘৃণা করা যায় না। কে বলিতে পারে এখন যাহাকে সামান্য, অপদার্থ বলিয়া ঘৃণা করিতেছি তাহা দ্বারা সমস্ত জগতের পরিত্রাণের জন্য কোন মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন না হইবে? অতএব যথার্থতঃ অসার, জঘন্য অথবা সামান্য কি তাহা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে হইবে। কেন না এই আমরা দেখিলাম যাহা বাহিরে দেখিতে অসার, এবং অতি সামান্য তাহা হইতেই সার এবং মহাব্যাপার সকল সম্পন্ন হয়। যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা কখনও ঐ সকল সামগ্রীকে তুচ্ছ করেন না। তাঁহারা জানেন, ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ সকল বস্তুকে ঘৃণা করিলে পরলোকের পথে কণ্টক রোপণ করা হয়। আমরা দেখিতে পাই, যিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করিতে তৎপর হন তিনি সংসারকে অসার মনে করেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ব্রাহ্মগণ, সে বস্তু কি যাহা তোমরা সংসার বলিয়া ঘৃণা করিতেছ,

এবং যাহা অসার ছায়া মনে করিয়া সর্ব্বদাই দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতেছ? পৃথিবীতে এমন শাস্ত্র নাই, যাহা সংসারকে অসার বলিয়া উপদেশ না দেয়, কিন্তু সে সংসার কি? যাহা আমরা দেখি, শুনি, স্পর্শ করি, তাহাই কি সংসার, পাপ, অধর্ম্ম, অথবা বিষ বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে? এ প্রকার যাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন তাঁহারা যথার্থ জ্ঞানবান্ বলিয়া জগতে সমাদৃত হইতে পারেন না। যাহা অস্থায়ী তাহাকে স্থায়ী জ্ঞান করিয়া তাহার উপরে যে প্রেম স্থাপন তাহাই অসার। যাহা চিরকাল থাকিবে না, তাহার উপর হৃদয়ের সমুদয় অনুরাগ স্থাপন করাই অসারতা। যাঁহারা যথার্থ ঈশ্বরের ধর্ম্মোপদেষ্টা তাঁহারা কখনই জগৎকে অধর্ম্মের ব্যাপার বলেন না; কিন্তু জগতের সঙ্গে যেন আমাদের চিরস্থায়ী সম্পর্ক রহিয়াছে, এই ভ্রম হইতে যে পাপ উৎপন্ন হয়, তাঁহারা চিরকাল ইহারই প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছেন।

সংসারের সামগ্রী সকল ঘৃণা করা দূরে থাকুক, যিনি যথার্থ তত্ত্বদর্শী তিনি সংসারকে ধর্ম্ম শিক্ষার একটী প্রধান বিদ্যালয় বলিয়া গ্রহণ করেন এবং তন্মধ্যে ব্রহ্ম-বিদ্যা লাভ করিয়া জীবন সার্থক করেন। সংসারেই আমরা জন্মিয়াছি, সংসারেই আমরা বাস করিতেছি, স্বর্গরাজ্যে আমরা জন্মি নাই, স্বর্গরাজ্যে আমরা বাস করি না। আমরা সংসার দেখি, সংসার শুনি, সংসার স্পর্শ করি, সংসার ভোগ করি। জীবনের অধিকাংশ সংসারের অনুসরণ করিয়াই গত হইতেছে। অধার্ম্মিকদিগের কথা লইয়া আলোচনা করিতেছি না; বিষয়ীদিগের কথাও বলিতেছি না; কিন্তু বিশ্বাসীরা, ব্রাহ্মেরা, কিরূপে সংসারে বিচরণ করেন

তাহাই বলিতেছি। সকলেই সংসারে আছি, সংসারের মনুষ্যদিগের সহিত আলাপ করিতেছি, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি সংসারের বস্তু সকল দ্বারা সর্ব্বদাই পরিবেষ্টিত রহিয়াছি। চারিদিকে সংসার আমাদের নয়ন মন আকর্ষণ করিতেছে। এই সংসারের ভিতর রহিয়াছি কিসের জন্য? পাপ করিবার জন্য নহে; কিন্তু ধর্ম্ম সাধন কবিবার জন্য। কে বলে সংসার পাপের আলয়? সংসার আমাদের ধর্ম্মক্ষেত্র। ঈশ্বর আমাদিগকে এই সংসারে জন্মদান করিলেন, তিনিই মাতৃগর্ভে আমাদিগকে সৃজন করিয়া এই সংসারে আনিলেন। আমাদের এ জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অথবা ইহার আদি বর্ণ ও শেষ বর্ণ এই সংসার। সংসারের বস্তু সকল ভোগ করি, সংসারের পুষ্পের সৌরভ লইয়া হৃদয়কে আমোদিত করি। সংসারের মনুষ্যের সঙ্গে আলাপ করি। আমাদের প্রায় সমুদয় কার্য্যের সঙ্গেই সংসারের যোগ রহিয়াছে। কিন্তু সাংসারিক কার্য্য হইতে যে ফল উৎপন্ন হয় তাহা সংসারের অতীত।

যখন পুষ্পের লাবণ্য দেখিয়া তাহার নির্ম্মাতার অরূপ-রূপ-মাধুরী স্মরণ হইল, যখন পুষ্পের সৌরভ গ্রহণ করিতে করিতে ঈশ্বরের প্রেমে হৃদয় বিগলিত হইল, তখন পুষ্পের সঙ্গে আর সম্পর্ক কি? ধন হস্তগত হইল, সেই অনিত্য বস্তু হৃদয়ের ভিতরে যাহা দিয়া গেল তাহা বিনাশ করে কে? অস্থায়ী বস্তু দ্বারা পরলোকের স্থায়ী সম্বল করিয়া লইলাম। নিজের স্বার্থ ত্যাগ করিয়া সহস্র লোকের উপকার করিলাম। সে সমুদয় লোকের সঙ্গে হয় ত কোন সম্পর্ক রহিল না; কিন্তু তাহার ফল ত অসার নহে। কথা কহিলাম, কথার উৎপত্তি কোথায়? জিহ্বা। জিহ্বা

শব্দ উচ্চারণ করিল, বায়ুতে আঘাত লাগিল, সেই বায়ু লোকের কর্ণে প্রবেশ করিল। শ্রোতা হয় ত পাপী, কুসংস্কারাবিষ্ট; কিন্তু আচার্য্যের কথা বজ্রধ্বনির ন্যায় তাহাকে জাগাইল। কথা কি? বায়ু। বায়ু কি? অসার বস্তু। কিন্তু সেই অসার পদার্থ পাপীর জীবনে কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আনিয়া দিল। আর ত কেহ সে কথা শুনিল না, যিনি সেই কথা বলিলেন তিনিও চলিয়া গেলেন; কিন্তু সেই কথার ফল চিরস্থায়ী হইল। একদিন ঘোর অন্ধকার মধ্যে পাপী জাগিয়া উঠিল, চারিদিক দেখিয়া চমকিয়া উঠিল, হৃৎকম্প হইল। শত সহস্র উপদেশ শুনিয়া, এত সাধুসঙ্গ করিয়া যাহার কিছুই হইল না, হঠাৎ অন্ধকার দেখিয়া তাহার মন ফিরিয়া গেল, ঘোরান্ধকার মধ্যে তাহার অন্তরে জ্ঞান-সূর্য্যের উদয় হইল। অন্ধকার অসার, কিছুই নহে, জ্যোতির অভাব; কিন্তু অসার হইতে সার উৎপন্ন হইল। যাহা আপাততঃ অসম্ভব তাহা সম্ভব হইল। এই সংসারের অসার ভূমি হইতে চিরকালই সার উৎপন্ন হইতেছে। উৎপত্তি স্থান হয় ত অতি সামান্য, অসার, জঘন্য, কিন্তু তাহা হইতে কেমন আশ্চর্য্য, লাবণ্যময় সৌরভযুক্ত পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হয়। আবার ভাবিয়া দেখ শ্মশান কি ভয়ের কথা, মৃত্যু কেমন অন্ধকারের ব্যাপার! সেই স্থান কি ভয়ঙ্কর, যেখানে মনুষ্যের কতকগুলি অস্থি পড়িয়া আছে। শ্মশান ভাবিতে কাহারও ইচ্ছা হয় না; কিন্তু পৃথিবীতে যদি মৃত্যু এবং শ্মশান না থাকিত, তাহা হইলে বৈরাগ্য শিখিবার বিদ্যালয় উঠিয়া যাইত। এই একজন উৎসাহী যুবা রাশি রাশি ধন সঞ্চয় করিতেছিল, দেখিতে দেখিতে এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া সে ব্যক্তি কোথায় চলিয়া গেল। এই নিদারুণ ঘটনা কি

শিক্ষা দিল? বৈরাগ্য। প্রত্যেকেরই বৈরাগ্যের প্রয়োজন। সেই বৈরাগ্যের সূত্রপাত হইল কোথায়? মৃত্যু ঘটনায়। সুতরাং মৃত্যু আমাদের গুরু। মৃত্যু পৃথিবীর সমুদয় অসারতা এবং অনিত্যতা স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়া দিল। পৃথিবীর ধনে আর মত্ত হইব না, সেই ভয়ঙ্কর শ্মশান-বিদ্যালয়ে মৃত্যুরূপ গুরুর নিকট ইহা শিক্ষা করিলাম।

বন্ধুগণ, স্বর্গরাজ্য, প্রেম-পরিবার তোমরা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ইহার আদর্শ তোমরা কোথায় পাইয়াছ? এই সুন্দর পরিবারের পূর্ব্বাভাস তোমরা প্রথমে কোথায় পাইয়াছ যদ্দ্বারা তোমরা স্বর্গরাজ্যের এমন উৎকৃষ্ট ছবি চিত্র করিলে? সমুদয় সংসার হইতে। যে সংসারে পিতা মাতা, পুত্র কন্যা, ভ্রাতা ভগ্নী, স্ত্রী স্বামী পরস্পরের মধ্যে মিলন নাই, যে মনুষ্য-পরিবারে কত পশুবৎ ব্যবহার এবং কত ভয়ানক জঘন্যতা, সেই স্থান হইতে আমারা ঈশ্বরের পবিত্র প্রেম-পরিবারের ছবি পাইলাম, তাহাকে যখন উৎকৃষ্ট বর্ণ দ্বারা চিত্র করিলাম তাহাই স্বর্গ হইল। ইহা অপেক্ষা আরও একটী সামান্য দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। ঈশ্বরকে আমরা পিতা মাতা বলিয়া ডাকি, এ সকল সুমিষ্ট পবিত্র সম্বোধন আমরা কোথায় শিখিলাম? এই অসার সংসার মধ্যে। পৃথিবীর পিতাকে যদি না চিনিতাম এখানে, মাতাকে যদি মা বলিয়া না ডাকিতাম, তবে কি ঈশ্বরের সঙ্গে এ সকল সুমধুর সম্পর্কের আস্বাদ পাইতাম? আমরা সংসারেই পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী ইত্যাদি সুমিষ্ট নাম শিখিয়াছি। এখন ব্রহ্মমন্দিরে এ সকল নামের মধ্যে যাহা কিছু অসার ভাব তাহা পরিত্যাগ করিয়া ইহাদের মধ্যে যে সকল স্বর্গীয় সম্পর্ক আছে তাহাই সাধন করিতেছি।

সংসারই আমাদের শিক্ষার স্থল। সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনিবার, সমস্ত সপ্তাহ আমরা কোথায় ছিলাম? সংসার মধ্যে, আজ রবিবার আমরা ব্রহ্মমন্দিরে। সমস্ত সপ্তাহ সংসারের নানা প্রকার পুষ্প হইতে মধু সঞ্চয় করিয়া ব্রহ্মপূজার আয়োজন করিয়াছি। সংসার সেই পুষ্প সকলকে জন্ম দিল। যে ঈশ্বর মধুময়, যে স্বর্গরাজ্য মধুময়, এই গরলময় সংসার আমাদিগকে সেই মধুময় ঈশ্বরকে এবং সেই মধুময় স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ করিতে বাধ্য করিতেছে। সংসারের অন্ধকার আমাদিগকে আলোকের দিকে ধাবিত করিয়াছে। অতএব সংসারের গরল পরিত্যাগ করিয়া ইহার মধু গ্রহণ কর।

যে ব্যক্তি সংসারের সুখে মুগ্ধ হয় সে মূর্খ, কিন্তু যিনি সংসারে থাকিয়া সাধন ভজন দ্বারা পরকালের সম্বল করিয়া লন তিনি জ্ঞানবান্। যে ব্যক্তি সংসারে থাকিয়া ঈশ্বর এবং পরলোক ভুলিয়া যায়, তাহারই পক্ষে পিতা মাতা এবং স্ত্রী পুত্র ধর্ম্ম সাধনের প্রতিকূল। যিনি সংসারে থাকিয়া সর্ব্বদা ঈশ্বরের হস্ত দেখেন এবং তাঁহার অভয় চরণ পূজা করেন, তাঁহার নিকট স্ত্রী পুত্র সকলেই পরিত্রাণ পথের সহায়। তিনি সংসারের প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন হইতে ঈশ্বরের পরম শাস্ত্র উদ্ভাবন করিয়া লন; কেন না তিনি দেখিতে পান যে, ঈশ্বর স্বহস্তে সংসার সৃজন করিয়াছেন, এবং স্বহস্তে ইহার সমস্ত ইতিহাস লিখিতেছেন। মনুষ্যের রক্তে এই ইতিহাস লিখিত হইতেছে। ইহার প্রত্যেক কথার মধ্যে ধর্ম্মরাজ্যের নিগূঢ় ব্যাপার এবং স্বর্গরাজ্যের অমৃত নিহিত রহিয়াছে। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল হস্তে সংসারের তাবৎ ঘটনা সকল সংঘটন করিতেছেন। কে বলে সংসারে অনেক বিষ আছে, সংসারের সুখে পতন হয়? যাহারা

মূর্খ এবং সংসারের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখে নাই, তাহারাই এই কথা বলে। যাহারা স্বর্গের সৌন্দর্য্য দেখাইয়া সংসারকে মুগ্ধ করিতে পারে না, অথবা ঈশ্বরের বলে সংসারকে জয় করিতে পারে না, তাহাদেরই সংসারের সুখে মৃত্যু হয়। ঈশ্বর স্বয়ং আমাদিগকে সংসারে আনিয়াছেন; তাঁহার ইচ্ছা যে আমরা সংসারের সামগ্রী সকল লইয়া তাঁহার স্বর্গরাজ্য নির্ম্মাণ করি। সংসারের প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রত্যেক বস্তু ঈশ্বরের কথা বলিতেছে। এই চন্দ্র সূর্য্য যাহারা পাপীর নিকট, অবিশ্বাসীর নিকট অবাক্ হইয়া বসিয়া থাকে, বিশ্বাসীদিগের নিকট ইহারা অতি মধুর ও সুস্পষ্টভাবে ঈশ্বরের গুণ গান করে। সংসারের কোন স্থানে অপবিত্রতা নাই, অতএব পাছে এইটী স্পর্শ করিলে পাপ হয় কেহই এ কথা বলিও না।

যাহা হইতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় তাহা জঘন্য হইতে পারে না। সংসার হইতে যখন এমন সুন্দর পদ্ম সকল বিকশিত হইতেছে, কিরূপে আর ইহাকে অসার জঘন্য বলিয়া ঘৃণা করিবে? স্বর্গরাজ্যে যদি জন্মিতাম তাহা হইলে হয় ত সংসারকে তুচ্ছ করিলেও চলিত; কিন্তু ঈশ্বরের আজ্ঞা তাহা নহে। সংসারের মধ্যে কি তবে অসার এবং অপবিত্র? সংসারের প্রতি আমাদের মায়া। বস্তু অপবিত্র হইতে পারে না, কেন না বস্তু হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি হইতেছে, প্রত্যেক বস্তু ঈশ্বরকে দেখাইয়া দিতেছে, এবং তাঁহার দয়ার কথা বলিতেছে। অতএব সংসারের বস্তু যাঁহাকে দেখাইয়া দিতেছে, তাঁহার সঙ্গে চিরস্থায়ী স্বর্গের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হও। সংসারের গভীর স্থানে প্রবেশ করিয়া ঈশ্বরের কথা শ্রবণ কর; নর নারীর বাহিক আবরণ ভেদ করিয়া তাঁহাদের হৃদিস্থিত স্বর্গীয় ভ্রাতৃভাব এবং ভগ্নীভাব দেখিয়া

মোহিত হও। সংসারের সকলকে গুরু বলিয়া বরণ করিয়া লও। সমুদয়ের প্রয়োজন আছে। সমুদয়ের মধ্যে ঈশ্বর কথা বলিতেছেন।

হে প্রেমময়, প্রেম-সিংহাসনে তুমি বসিয়া আছ। আমরা জয় দয়াময়, জয় দয়াময় বলিয়া তোমার জয়ধ্বনি করিতেছি। যে জন্য কাছে আসিতে বলিয়াছ, তাহা বুঝাইয়া দাও। এত দিন সংসারতত্ত্ব বুঝিতে পারি নাই বলিয়া সংসারে মরিতেছিলাম। যে সংসারকে জঘন্য নীচ বলিয়া বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, তাহা গূঢ়ভাবে আমাকে তাহার দিকে আরও গভীরতররূপে আকৃষ্ট করিল। আজ বলিলাম কোন লোকের সঙ্গে আলাপ করিব না, ক্রমে বুঝিলাম নির্জনে থাকা অন্যায়। এইরূপে নিজের দোষে পিতা মাতা, ভাই ভগ্নী, স্ত্রী পুত্র কাহারও সঙ্গে প্রকৃত সম্পর্ক স্থাপিত হইল না। কি করি, নাথ, তুমি উপদেশ দাও। তুমি যখন বন্ধু বান্ধব আনিয়া দিলে তাহাদিগকে গ্রহণ করিব না কেন? দেখ, ঈশ্বর, সংসারের বৃথা আমোদে যেন মত্ত না হই; কিন্তু সংসারের ভিতরে যেন বৈরাগী হইয়া বাস করিতে পারি। তোমার কৃপাগুণে সংসারের বিষ পরিত্যাগ করিয়া কেবল ইহার মধুই পান করিব। যখন সংসার তোমারই হস্তের ব্যাপার তখন আর আমার ভয় কি? যখন তোমাকে দেখি তখন সংসারের যে দিকে নেত্রপাত করি সে দিকেই ব্রহ্মবিদ্যা। চারিদিক হইতে তখন তোমার ধর্ম্মতত্ত্ব আসিয়া আমাকে আলিঙ্গন করে। সংসারে আছি তোমারই, মন্দিরে আছি তোমারই। সংসার মধ্যে যেন তোমার ধর্ম্ম সাধন করিতে পারি, কৃপাময়, এই আশীর্ব্বাদ কর। নাথ, তোমার সাধকের কাছে সংসার কি? সকলই ব্রহ্মময়, সকলই মধুময়। তিনি জানেন ইহার কোন বস্তুকে স্পর্শ করিলেই পাপী

হইতে হয় না। যখন তোমাকে দেখি তখন আমার কাছে বিষ নাই, অন্ধকার নাই, ভয় নাই। তখন সকলই ব্রহ্মময়, সকলই মধুময়, দেখিয়া অভয় পদ পাই। যখন মন তোমাকে দেখিতে পায় না, তখনই চারিদিকে মৃত্যুর ব্যাপার দেখিয়া ভীত হই। কৃপাময়, আশীর্ব্বাদ কর, যেন ভ্রাতা ভগ্নী মিলে, তোমাকে প্রীতিপুষ্প দিয়া পূজা করিতে পারি। ব্রাহ্ম বলিয়া যদি কাছে ডাকিয়া থাক, সংসারী হইয়াও যেন বৈরাগী হই এই আশীর্ব্বাদ কর। হে নাথ, সংসারে তোমার আজ্ঞা বহন করিব, লোকে বলিবে এ ব্যক্তি সংসারে ডুবিয়া আছে; কিন্তু আমি ভিতরে ভিতরে তোমাকে ডাকিব, তোমাকে দেখিব এবং তোমার কথা শুনিব। প্রাণ মনকে তুমি অসার বস্তু দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছ বটে, কিন্তু সংসারের মধ্যে যাহা সার তাহা লইয়া তোমার স্বর্গরাজ্য নির্ম্মাণ করিব। হে দীনশরণ, এই আশা করিয়া বারবার ভক্তির সহিত তোমার পবিত্র চরণে আমরা প্রণাম করিতেছি।

ঈশ্বর সত্য কি কল্পনা?

রবিবার, ৩০শে কার্ত্তিক, ১৭৯৬ শক; ১৫ই নবেম্বর, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

ব্রাহ্মগণ, তোমরা কি মায়াবাদী? তোমরা কি সত্যকে কল্পনা মনে কর? পদার্থকে ছায়া মনে কর? মায়াবাদী পৃথিবীর সমস্ত বস্তু দেখিতেছে, স্পর্শ করিতেছে, ভোগ করিতেছে, তথাপি পৃথিবীর অস্তিত্বে সন্দেহ করিতেছে, মনে ভাবিতেছে সকলই ভ্রমের ব্যাপার। মায়াবাদীর মতে এই প্রত্যক্ষ ব্রহ্মাণ্ড একটী প্রকাণ্ড স্বপ্ন, সৃষ্টি

হইতে বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যন্ত ইহার ইতিহাস একটী সুদীর্ঘ গল্প। তাহারা সত্য দেখিলেও বিশ্বাস করে না। ব্রাহ্মগণ, তোমরা কি সেই মতের অনুসরণ কর? আপাততঃ তোমরা বলিবে এই ভ্রান্তি আমাদের নাই, অথবা এই উত্তর দিবে, যে সকল দৃশ্য পদার্থ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি তাহাদিগকে কিরূপে কল্পনা বা স্বপ্ন বলিব? বহির্জ্জগৎ সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানবিদ্‌দিগের মধ্যে যে মায়াবাদ আছে তাহা তোমরা স্বীকার কর না ইহা যথার্থ; কিন্তু ধর্ম্মজগৎ সম্বন্ধে কি তোমরা মায়াবাদী হও নাই? এই গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা কর, গুরুতর বলিতেছি এইজন্য যে, ইহার উপর আমাদের পরিত্রাণ নির্ভর করে। যাহারা ধর্ম্মজগতের ঘটনা সকলকে মায়া মনে করে কিম্বা অণুমাত্র সন্দেহ করে, তাহাদের স্বর্গে যাইবার কিম্বা উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় সত্যকে কেহই মায়া মনে করিতে পারে না। মাতৃগর্ভ হইতে যে শিশু সদ্য প্রসূত হইল, সে কি এই নূতন জগৎ দেখিয়া ইহা মিথ্যা মনে করিতে পারে? স্বভাব বুদ্ধিকে বিকৃত হইতে দেয় না, এইজন্য শিশুরা যাহা দেখে সহজেই তাহা বিশ্বাস করে। কোন প্রকার কুযুক্তি কিম্বা সংশয় তাহাদের মনকে আন্দোলন করে না।

শিশু কি প্রস্তর স্পর্শ করিয়া বলিতে পারে, ইহার বাস্তবিক যথার্থ সত্তা নাই, এইটী কেবল আমার মনের ভাব? শিশু মায়াবাদী হইতে পারে না; কিন্তু সেই শিশুর যখন ক্রমে ক্রমে বয়োবৃদ্ধি হয়, যখন নানা প্রকার ভ্রম এবং পাপাসক্তি দ্বারা তাহার বুদ্ধি অন্ধীভূত হয় তখন সে মায়াবাদী হইতে পারে। বাল্যকালে, অল্প বয়সে এই মত গৃহীত হইতে পারে না; কিন্তু

অধিক বয়সে জ্ঞানাভিমানীদিগের মধ্যে এই মত দেখিতে পাই। বালকদিগের এবং সরল মূর্খ চাষাদিগের মধ্যে এই মত স্থান পাইতে পারে না। যেখানে বুদ্ধির গৌরব, জ্ঞানের দর্প, সেখানেই শুনিতে পাই, এই জগৎ মিথ্যা, এই সূর্য্য অন্ধকার, সকলই একটী প্রকাণ্ড মায়া। বুদ্ধির বিকারে এই মতের উৎপত্তি। স্বভাবে এই মত নাই। যাহা স্পর্শ করিতেছি, ভোগ করিতেছি, তাহা কিরূপে ছায়া হইবে বুঝিতে পারি না। অন্যান্য দেশেও এই মত আছে। কিন্তু দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবার প্রয়োজন কি? এই দেশেই এই মত ছিল, এবং এখনও আছে। দুঃখের বিষয় ব্রাহ্মজগতেও ধর্ম্মজীবন সম্পর্কে এই ভয়ানক মত প্রবেশ করিতেছে দেখিতেছি। এই মত বাল্যকালে নাই, আত্মার স্বাভাবিক সরল অবস্থাতে নাই, বিকৃত বিদ্যার অহঙ্কারে ইহার উৎপত্তি। তোমরা যখন ব্রাহ্মবালক ছিলে, যখন তোমরা বিশ্বাসগর্ভ হইতে ব্রাহ্মজগতে প্রসূত হইলে, তখন কোথায় ছিল তোমাদের কুমন্ত্রণা, কোথায় বা ছিল তোমাদের কুশাস্ত্র? আত্মার শৈশবাবস্থায় আমরা সকলেই যাহা দেখিয়াছি তাহাই বিশ্বাস করিয়াছি। সেই অবস্থাতে কোন প্রমাণের প্রয়োজন হয় না।

যাহা হাতে ধরিলাম তাহা কল্পনা হইতে পারে না, কিন্তু ধর্ম্মজীবন যতই ইহার বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া সংসারের নানা প্রকার পরীক্ষায় পরীক্ষিত হয়, ততই বুদ্ধির কুটিলতা, কুযুক্তি এবং মায়াবাদ ইত্যাদি আসিয়া ইহাকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করে। এইজন্যই ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও অনেককেই মায়াবাদী দেখা যাইতেছে। তাঁহারা বলেন, ধর্ম্মজীবনের আরম্ভে, আত্মার বাল্যকালে যে, আমরা ঈশ্বরকে দেখিতাম, এবং আত্মার গূঢ়তম প্রদেশে স্বর্গের আনন্দ, ঈশ্বরের

প্রসাদরূপ-পবিত্র-শান্তি সম্ভোগ করিতাম, কে বলিল, তাহা যথার্থ ? এইরূপে গত জীবনের প্রত্যক্ষ ঘটনা সকল স্বপ্নের ব্যাপার বলিয়া তাঁহারা বিদায় করিয়া দেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব, উপাসনার গূঢ়তত্ত্ব, পরলোকের নিগূঢ় প্রমাণ, এবং অবশেষে নীতিতত্ত্ব, এ সকলই তাঁহাদের সন্দেহ-চক্ষে নিপতিত হয়। ধর্ম্মজগতের ব্যাপার সকল সন্দেহ করিতে করিতে অবশেষে নীতিজগতের উপরেও তাঁহাদের মন সন্দিগ্ধ হয়। এই কারণেই যাঁহারা উপাসনা পরিত্যাগ করেন, অল্পকালের মধ্যেই তাঁহাদের চরিত্রও দূষিত হয়। এইরূপে মনুষ্য ধর্ম্মজগৎ এবং নীতিজগৎ সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইতে হইতে, ক্রমে অবিশ্বাসী হইয়া ধর্ম্মজগৎ ও নীতিজগৎ উভয়কে অবিশ্বাস-কূপে নিক্ষেপ করে। বন্ধুগণ, তোমরা এখনও এই ভয়ানক অবস্থায় পতিত হও নাই তাহা আমি জানি, কিন্তু তোমরা এই পথে আছ কি না তাহা আমি জানিতে চাই। প্রথম, ঈশ্বর আছেন, ভক্তকে তিনি দেখা দেন, ইহাতে তোমাদের কোন সন্দেহ হইতে পারে কি না ? আত্মার বাল্যকালে যেমন তোমরা ঈশ্বরকে দেখিয়া সুখী এবং উৎসাহী হইতে, এখনও কি তোমরা তাঁহাকে সেইরূপ যথার্থ উজ্জ্বলরূপে দেখিতেছ ? না ঈশ্বর-দর্শন স্বপ্নের ব্যাপার মনে করিতেছ ? স্বপ্নে যেমন মনুষ্য অতি মনোহর ব্যাপার সকল দেখিয়া পুলকিত হয়, তোমরাও কি বাল্যকালে আত্মার নিদ্রিতাবস্থায়, ধ্যানের সময় কিম্বা হৃদয়-প্রফুল্লকর-ব্রহ্মোৎসবে কেবল স্বপ্ন দেখিতে যে, ঈশ্বর তোমাদিগকে দেখা দিতেছেন, তিনি তাঁহার নিজের অশব্দ স্বর্গীয় ভাষায় স্নেহালাপ করিয়া, তোমাদের নিকট তাঁহার শুভাভিপ্রায় সকল ব্যক্ত করিতেছেন ? তোমাদের মধ্যে এমন কি কেহ নাই

যিনি বলিতে পারেন, উপাসনা করিয়া আমি সুখী হইতাম যথার্থ; কিন্তু সে সকল স্বপ্ন ও কল্পনার ব্যাপার; এখন বুদ্ধিমান্ হইয়াছি, এখন আর অলীক ব্যাপারে চিত্ত অনুরঞ্জিত হইতে পারে না, কেন না কে জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতে ইচ্ছা করে? কিন্তু যে বলে, কে জাগিয়া কিম্বা উন্মীলিত নয়নে ধ্যান করিয়াছে—ঈশ্বর-দর্শন করিয়াছে? সে অবিশ্বাসী, সে নাস্তিক। এই ঘৃণিত নামে তাহাকে ডুবিতে হইতেছে। সাবধান, কোন ব্রাহ্মের জিহ্বা হইতে যেন এ সকল গরল বাহির না হয়। ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বরকে দেখিয়াছি, চিরদিন দেখিব, চিরকাল এই সত্য বলিব।

একবার যদি কোন মিষ্ট বস্তু আস্বাদন করিয়া থাক, মুখের মধ্যে বারবার সেই মিষ্টতা গ্রহণ করিতে স্বভাবতঃ ইচ্ছা হয়। তাহা যথার্থই মিষ্ট কি না যতবার পরীক্ষা করিয়া দেখি, ততবারই সুখী হই। ভাল বস্তু পরীক্ষা করিলেই পরীক্ষক যিনি তিনি সুখী হন। একবার জল পান করিয়া তাহা জল কি না এ বিষয়ে যদি সন্দেহ থাকে আবার জল পান কর, আবার শরীর সুশীতল হইবে, এইরূপে যতবার জল পান করিবে প্রতিবারই তৃপ্ত হইবে। সমস্ত আকাশে চন্দ্রের জ্যোৎস্না বিকশিত হইয়াছে, তাহা চন্দ্রের জ্যোৎস্না কি না এ বিষয়ে যদি সন্দেহ থাকে, নয়নকে বল উৰ্দ্ধে দৃষ্টি কর; তথাপি যদি সন্দেহ হয় আবার চন্দ্র দর্শন কর, আবার পরিতৃপ্ত হইবে। এইরূপে কি সুন্দর সুমিষ্ট বস্তু, কি সুশীতল জল, কি মনোহর চন্দ্র, এ সকল বস্তু যতবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবে ততবারই সুখী হইবে। এ সকল পরীক্ষাতে ক্ষতি নাই, বরং এ সকল পরীক্ষাতে সুখভোগই বৃদ্ধি হয়। সেইরূপ

ঈশ্বর-দর্শন। আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয় এই যে তোমরা আমাকে পরীক্ষায় আনিতেছ। চারিদিকে পরীক্ষায় অগ্নি জ্বলিতেছে ইহা দেখিয়া বারম্বার আমি ঈশ্বরের শরণাগত হইব, তাঁহাকে ডাকিব, তাঁহাকে দেখিব, তাঁহার সুশীতল কথা শুনিব, ইহা অপেক্ষা আর আমার অধিকতর সৌভাগ্য কি হইতে পারে? হে ঈশ্বর, ধন্য তুমি! এ সকল পরীক্ষাতেই তুমি আমার আত্মার পরিত্রাণ এবং উন্নতি সাধন করিতেছ। কি আশ্চর্য্য তোমার ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব! আমার কথায় যদি লোকের সন্দেহ না হইত, আমার জীবন যদি কেহই বিচার না করিত, তাহা হইলে আমার পুনঃ পুনঃ ঈশ্বর-দর্শন হইত না। কিন্তু যতবার পরীক্ষিত হইতেছি, ততবারই হে ঈশ্বর, তোমার প্রেমমুখ দেখিয়া নির্ভয় হইতেছি। প্রতিবার পরীক্ষায় আনন্দের কথা বলিতেছি। ঈশ্বর, তোমার দয়ায় পরীক্ষা সুখের ব্যাপার হইল। ভাই, ভগ্নী, বন্ধু, স্ত্রী, পুত্র সকলেরই নিকট প্রতিদিন এই পবিত্র সত্যের পরীক্ষা দিতে হইতেছে। অন্যান্য বিষয়ে বারবার পরীক্ষিত হইলে মন বিরক্ত হইয়া যায়, কিন্তু যে পরীক্ষায়, হে ঈশ্বর, তুমি মাভৈঃ মাভৈঃ বলিতেছ, তাহাতে আমার ভয় কি?

যে প্রাণেশ্বরের দর্শনকে পরীক্ষা করিয়াছে সেই সুখী হইয়াছে। যতবার ব্রহ্ম-দর্শন করিয়াছি ততবারই সুখী হইয়াছি, তবে বারম্বার এমন সুখের বস্তুর পরীক্ষা দিব, ইহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু এই যে ব্রাহ্মসমাজের দুর্দ্দশা দেখিতেছি, ব্রহ্ম-দর্শনে অবিশ্বাস, নিরাশা এবং মায়াবাদ ইহার কারণ। ব্রাহ্মজীবনের বাল্যকালে যখন তোমরা ঈশ্বরকে দেখিতে তখন কেহই তোমাদের অন্তরে নিরাশা এবং অবিশ্বাস-বিষ ঢালিয়া দিতে পারিত না। মনে নাই কি? কয়েক

বৎসর পূর্ব্বে তোমরা কত আশার কথা কহিতে? আজ কেন তবে ভয়ানক মায়াবাদী হইয়া বলিতেছ, কেহ ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না, কোন লোক স্বর্গে যাইতেছে না? তুমি রাজপথে বসিয়া কি না বলিতেছ—কিছুই নাই সকলই কল্পনা, সকলই মিথ্যা; পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য আসিবে, সত্যের জয় হইবেই হইবে, এ সকল অলীক কথা। এই যে আমরা দেখিতেছিলাম পাঁচ জন বিশ্বাসী শত শত লোককে ধর্ম্মরাজ্যে লইয়া যাইতেছিলেন, ইহাঁরাই এখন অবিশ্বাসী হইয়া সকলকে পাপ-সাগরে নিক্ষেপ করিতেছেন। এই যে হৃদয়াকাশে উজ্জ্বল আশা-তারা দেখিতেছিলাম, এখন দেখিতেছি তাহা নিরাশা-মেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছে। যে ব্রাহ্ম কল্য আশান্বিত হইয়া আশা-সরোবরে সন্তরণ করিতেছিলেন আজ দেখি তিনি নিরাশ-কূপে নিমগ্ন। কোথা হইতে তিনি এই নিরাশা-গরল পান করিলেন? যে মায়াবাদী, নাস্তিক, সেই বলে, মনুষ্যজীবন অসার, ইহাতে কিছুই আশার কথা নাই; কিন্তু যে বিশ্বাসী তাহার অন্তরে উৎসাহাগ্নি চিরকাল নিরাশাকে দগ্ধ করিতেছে। পৃথিবীর মায়াবাদী বলে চন্দ্র নাই, সূর্য্য নাই, এই পৃথিবী অসত্য। ব্রাহ্ম, তুমি বলিতেছ, ধর্ম্মরাজ্যে আশার কথা নাই। কি ভয়ানক! আত্মার বাল্যকালে কত আশার কথা বলিয়াছ, আজ শঠ ধূর্ত্ত হইয়া তাহার বিপরীত কথা বলিতেছ। এত অল্পকালের মধ্যে তোমার ভাবান্তর হইল! এতদিন কণ্টকে যদি বিদ্ধ হইতে, বলিতে ইহা গোলাপ ফুলের কাঁটা, আজ গোলাপ ফুলকে কাঁটা বলিতেছ! কেন তোমার বিশ্বাসের এরূপ ব্যভিচার হইল? তুমি, বাল্যকালে ঈশ্বরের যে সকল সত্য পাইয়াছিলে তাহা যদি বিশ্বাস এবং আশার সহিত রক্ষা করিতে,

তাহা হইলে তোমার এ দুর্দ্দশা হইত না। এইজন্য স্নেহের সহিত তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, চিরকাল তোমরা বাল্যকাল রক্ষা কর। বাল্যকালে তোমরা যাঁহাকে দেখিয়াছ সেই ঈশ্বর এখনও তোমাদিগকে স্নেহের সহিত তাঁহার কাছে বসিতে ডাকিতেছেন। তাঁহার সহবাস পুরাতন হইতে পারে না। যতবার তাঁহার কাছে বসিবে ততবারই তাঁহাকে সুন্দর হইতে সুন্দরতর দেখিবে। বারম্বার পরীক্ষাতে সত্যের সৌন্দর্য্য সত্যের লাবণ্য, এবং সত্যের মিষ্টতা গভীরতররূপে অনুভব করিবে। যতবার প্রাণেশ্বরকে পরীক্ষায় আনিবে ততবার আরও আনন্দিত হইয়া কৃতার্থ হইবে।

দীনবন্ধু। *

রবিবার, ৭ই অগ্রহায়ণ, ১৭৯৬ শক; ২২শে নবেম্বর, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

সংসার আমাদের দুর্জ্জয় রিপু—সকলের জীবনের পরীক্ষা এই কথা বলিয়া দেয়। কে না জানে যে সংসার মনুষ্যের দুর্জ্জয় রিপু? সংসার আমাদিগকে অধর্ম্মের পথে লইয়া গিয়া নানা প্রকার কষ্ট যন্ত্রণা এবং অবশেষে নিরাশ-কূপে নিক্ষেপ করে, ইহা কে অস্বীকার করিবে? ধার্ম্মিককে অধার্ম্মিক করে কে? স্বর্গবাসীকে নরক-গামী করে কে? সংসার। বাস্তবিক, সর্ব্বদাই সংসারে ভয়ানক পরীক্ষা এবং যন্ত্রণানল জ্বলিতেছে। এইজন্য এই দুঃখ বিপদময় পরীক্ষাপূর্ণ সংসারে বন্ধু চাই, নিশ্চয়ই বন্ধু চাই। অন্ধকার যে পথে, সে পথে কি আলোক চাহি না? যেখানে উত্তপ্ত বালুরাশির মধ্যে মনুষ্য নিতান্ত কাতর এবং পরিশ্রান্ত হয়, সেই ক্লান্ত পথিক

কি স্বভাবতঃই সেখানে সুশীতল জল অন্বেষণ করে না? তবে কেন আমরা এই সংসার মরুভূমিতে বন্ধু চাহিব না? বাস্তবিক সংসার যেরূপ অরণ্য সমান বিপদময় স্থান, ইহার মধ্যে বন্ধুতা ভিন্ন বাঁচিবার আর অন্য উপায় নাই। অন্ততঃ এমন একজন বন্ধুও চাই যাঁহার নীতিপূর্ণ সুমধুর উপদেশ শুনিয়া সর্ব্বদাই জীবনের ঘোর বিপদ পরীক্ষা হইতে নিস্তার পাইতে পারি। ব্রাহ্ম হইয়াছি বলিয়া কি আমাদের বন্ধুর প্রয়োজন নাই? না, ব্রাহ্ম হইয়াছি বলিয়া আমাদের আরও অধিক পরিমাণে বন্ধু চাই। বন্ধু অন্বেষণ করা মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক। ব্রাহ্মগণ, বন্ধু কি আমাদের নাই? যদি বন্ধু না থাকিত, সংসারে আমরা বাঁচিতাম না। বন্ধু বিহীন হইলে কেহই জীবনের ভার বহন করিতে সক্ষম হইতেন না।

ইঙ্গিতে বলিলাম আমাদের বন্ধু আছেন। কে তিনি? যিনি জগতের বন্ধু—যাঁহার নাম দীনবন্ধু তিনি কোথায় আছেন? অন্তরে। সংসারের কষ্ট যন্ত্রণায় যখন ভয়ানকরূপে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছে, তখন সেই অন্তরের অন্তরে, একজনকে দেখিয়াছি বলিয়া এখনও বাঁচিয়া আছি, এবং তাহাই এ প্রাণ ধারণের এক মাত্র হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি। বাস্তবিক এ সংসারে যে কেহই বাঁচিতে পারেন না, যদি তিনি অনুরাগের সহিত ঈশ্বরকে বন্ধু বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া না থাকেন। "ঈশ্বর আমার বন্ধু" এই কথা বলাতে আমাদের অনেক সাহস প্রয়োজন; কিন্তু ঈশ্বর যখন নিজে "দীনবন্ধু" এই নাম মনোনীত করিয়াছেন, যখন তিনি স্বয়ং আদরপূর্ব্বক পাপীকে ডাকিয়া এই কথা বলিয়া দিলেন "আমি তোমার বন্ধু হইলাম।" যখন তিনি স্বয়ং তাঁহার এই সুন্দর নাম জগতে প্রচার

করিলেন, তখন পাপী তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া ডাকিলে কোন্ যুক্তি তাহাকে অপরাধী করিতে পারে? কি আশ্চর্য্য! স্বর্গের রাজা পৃথিবীর মহাপাপীকে কি না বলিলেন "আমি তোমার বন্ধু।" ঈশ্বর আর বন্ধু পাইলেন না? কার বন্ধু তিনি? জগতের লোক বলিবে তিনি সাধু পুণ্যাত্মার বন্ধু। যাহার অন্তরে সাধুতা আছে, বরং তিনি আপনাকে তাহার বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন; পাপীর এমন কি গুণ আছে যাহা ঈশ্বরকে তাহার নিকট টানিয়া আনিতে পারে? কিন্তু ঈশ্বর যখন স্বীয় মুখে আপনাকে পাপীর বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তখন আর আমাদের সঙ্কুচিত হইবার কারণ কি? এতকাল শুনিয়াছিলাম ঈশ্বরকে গুরুজনের সমান জানিয়া অবনত মস্তকে তাঁহার পদতলে পড়িয়া থাকিতে হইবে, কিন্তু এক্ষণে এ কি শুনিতেছি তিনি দীনবন্ধু, পাপীর বন্ধু। তিনি যথার্থই আমার বন্ধু।

যিনি বন্ধু হইলেন তাঁহার কাছে বসিতে, তাঁহার মুখের কথা শুনিতে, তাঁহাকে প্রাণের কথা খুলিয়া বলিতে সহজেই মনের মধ্যে ব্যাকুলতা হয়। যখন তিনি নিজে দীনবন্ধু নাম জগতে প্রচার করিলেন, তখন কোন্ পাপী না তাঁহাকে আদর করিয়া ডাকিবে? তিনি পিতা হইয়া সন্তানদিগকে স্নেহ দেখাইবার জন্য, রাজা হইয়া জগৎকে শাসন করিবার জন্য এবং পরিত্রাতা হইয়া পাপী জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্য, নানা প্রকার নাম জগতে প্রকাশিত করিলেন, কিন্তু এ সকল নাম যখন পাপীর নিকট পরাস্ত হইল, যখন পিতার প্রেম জননীর স্নেহ, রাজার শাসন, এবং পরিত্রাতার কৃপা, এ সকল কথা শুনিয়াও পাতকীর কঠোর মন

ফিরিল না, তখন তিনি কি সুমিষ্ট "অনাথবন্ধু" নাম লইয়া পাপীর নিকট প্রকাশিত হইলেন। ঈশ্বর পিতা, ঈশ্বর রাজা, ঈশ্বর পরিত্রাতা এ সকল নামে পাপীর মন ফিরিল না; কিন্তু পাপীকে পরাস্ত করিবার জন্য ঈশ্বরের কাছে, আরও অস্ত্র আছে, আরও মনোহর ভাব আছে। যখন ঈশ্বর কাছে আসিয়া পাপীকে ক্রমাগত সন্তান বলিয়া ডাকিয়া দেখিলেন যে তথাপি তাহার চৈতন্য হইল না; তিনি আরও মধুর স্বরে বলিলেন "বৎস! আমি তোমার বন্ধু।" পাপী বলিল এ কথা কি কল্পনা? যখন ঈশ্বর দুঃখী পাপী নরাধমের নিকট বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিলেন, তখন পাপী এবং দুর্জ্জয় সংস্কার পরাস্ত হইল। যিনি ঈশ্বরের মুখে এই কথা শুনিলেন, তিনি সংসারকে বলিলেন, সংসার! তুমি নিমেষের জন্য আমাকে একটী গোপন গৃহে প্রবেশ করিতে দাও, সেখানে একবার বন্ধু দর্শন করিয়া লই। বন্ধু এমন ঔষধ দিয়াছেন, যাহাতে হে সংসার! তোমার সমস্ত যন্ত্রণা, পরীক্ষা সহ্য করিব। বন্ধুর কৃপায় এমন লাবণ্য আত্মার মধ্যে দেখিয়াছি যে, সংসারের আর কোন মোহিনী শক্তি আমাকে আকর্ষণ করিতে পারিবে না।

এই যে নির্জন দর্শন, এই যে ঈশ্বরের অত্যন্ত নিকটে বসিয়া ঈশ্বরের বন্ধুত্ব সম্ভোগ, এই যে ক্ষণকালের জন্য প্রাণেশ্বরকে বন্ধু বলিয়া হৃদয়ে আলিঙ্গন করা, ইহাতেই জীবন কৃতার্থ হয়। বাণ মারিতে চায় সংসার, মারুক, বন্ধু পাইয়াছি যখন, তখন আমাদের ভাবনা কি? সকল উপদেশ পাইব তাঁহার মুখে। যাই বিপদ সম্মুখে দেখিলাম, তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া গেলাম সেই প্রাণসখার নিকট। যখন সংসারের বন্ধু বান্ধবদিগের নিকট আঘাত পাইলাম,

অভিযোগ করিলাম পরম বন্ধুর নিকট। একবার কেবল তাঁহার কাছে পৌঁছিতে পারিলেই হইল, যিনি আপনাকে দীনের সখা বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। দর্শনে শ্রবণে সমুদয় দুঃখ নিরানন্দ চলিয়া যাইবে। এমন সামগ্রী বন্ধু? পৃথিবী ইহা বুঝিতে পারে না। এত অরণ্যের ব্যাপার চারিদিকে, চারিদিকে নিরাশার বাণ; কিন্তু যিনি দীনবন্ধুকে দেখিয়াছেন, এ সমুদয় প্রতিকূল ঘটনার মধ্যে তাঁহার মনে আনন্দের উত্থান। সকলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া শ্মশানে রাখিয়া গেল, তথাপি তাঁহার প্রফুল্লতা যায় না কেন? এ সংসারে তাঁহার কেহই নাই; কিন্তু তাঁহার প্রসন্ন মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে কে যেন তাঁহার সঙ্গে স্নেহালাপ করিতেছেন, কে বলিতেছেন, সকলই যায় যাক্, "আমি" চিরকাল তোমারই। বাস্তবিক যথার্থ ব্রহ্ম-সাধক মৃত্যুর মুখে পড়িয়াও মরে না কেন? কতবার দেখিলাম মৃত্যুগ্রাসে পড়িয়া যে মরিতেছিল প্রহ্লাদ সমান সেই ব্রাহ্ম বাঁচিল। কে বাঁচাইল? সেই দীনবন্ধু। তিনিই নিরাশ্রয়কে রক্ষা করিলেন। যাহার কোন সঙ্গতি নাই, কাল কি আহার করিবে জানে না, ঐ দেখ, সেই ব্রাহ্ম সাধক তথাপি কাঁদিতেছে না। মানুষ তাহাকে ছাড়িল; কিন্তু তাহার বন্ধু যে তাহাকে ছাড়িলেন না। এই সাধকের হৃদয় ভগ্ন হইল না। অভেদ্য, দুর্ভেদ্য তাহার প্রাণ কিছুতেই তাহাকে মারিতে পারিল না। সংসারী ব্যক্তির ধন কাড়িয়া লও, সে তখনই আপনাকে নিঃসম্বল এবং নিরাশ্রয় মনে করিয়া ভূতলে পড়িয়া কাঁদিবে; কিন্তু ব্রহ্ম-সাধকের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লও, তাহার কিছুতেই দুঃখ নাই; যতদিন পরম ধন স্বরূপ বন্ধু কাছে থাকেন, ততদিন তাহার দুঃখ কি, ভাবনা কি? কিছুই

যদি না থাকে, আর বন্ধুতা যদি থাকে তাহাতেই পরম সুখ। ব্রাহ্ম কেবল জগদীশ্বরের পূজা করেন না, -অথবা কেবল, পিতা রাজা এবং পরিত্রাতার পূজা করেন না; কিন্তু তিনি দীনবন্ধুর পূজা করেন। এই ভয়ানক রিপুময় সংসারের মধ্যে বন্ধু অন্বেষণ করা মনুষ্যের স্বভাব। আমাদের কত সৌভাগ্য যে ঈশ্বরকে বন্ধু বলিয়া আমাদের প্রাণ শীতল হইল। স্বর্গে বন্ধু পাইলাম, পৃথিবীতে বন্ধু কোথায়? নিরাকার দেববন্ধু পাইলাম, সাকার নরবন্ধু কোথায়? সেই কথা পরে হইবে, এখন তোমরা এই স্বর্গের বন্ধুকে, প্রাণ মন দিয়া, দয়াময় পিতাকে দীনবন্ধু বলিয়া মনের দুঃখ দূর কর।

নরবন্ধু।

রবিবার, ৬ই পৌষ, ১৭৯৬ শক; ২০শে ডিসেম্বর, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

ইহা অতি বিচিত্র এবং আশ্চর্য্য ব্যাপার যে, উচ্চ যাহা তাহা সুলভ হইল, নীচ যাহা তাহা দুর্ল্লভ হইল। যাহা সর্ব্বোচ্চ তাহা আমাদের নিকটে। নিকটে কেন? আমাদের অধিকৃত হইল; কিন্তু যাহা অত্যন্ত নীচ তাহা বহু দূরে রহিল, এমন কি তাহা যে কখনও লাভ করিব তাহার আশা পর্য্যন্ত একেবারে নির্ব্বাণ হইল। যিনি সর্ব্বোচ্চ, স্বর্গের রাজা, পাপী জগৎ তাঁহাকে সুলভ বন্ধু বলিয়া ডাকিল। কেবল প্রেমিক ভক্তেরা যে তাঁহাকে অধিকার করিয়াছেন তাহা নহে, জঘন্য পাপীও তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিল। আমরা যে মহাপাপী আমরাও কি, না জগতের, মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে পারি, জগতের বন্ধু যিনি আমাদের বন্ধু তিনি।

আমরাও তাঁহাকে হৃদয়ের প্রেম দিয়া কৃতার্থ হইতেছি। ঈশ্বর এমন উচ্চ অধিকার আমাদিগকে দিলেন! এই উচ্চ অধিকার পাই নাই কে এই কথা বলিবে? স্বর্গের দেববন্ধু পাপীদের কাছে আসিলেন; কিন্তু নীচ সংসার-বাজারে আমরা বন্ধু পাইলাম না। ব্যাকুল হইয়া কাতর-প্রাণে জিজ্ঞাসা করিলাম বন্ধু কোথায়? স্বর্গ বলিল,—এখানে। নিরাকার বন্ধু, যাঁহাকে চক্ষু দেখিতে পায় না তাঁহাকে দেখিলাম; কিন্তু সাকার বন্ধু যাহাদিগকে দেখিতেছি তাহাদিগকে পাইলাম না। উচ্চ সুলভ হইল, নীচ দুর্লভ হইল, এ কথা কেহই কখনও শুনে নাই। বাস্তবিক যেখানে কিছুই দেখা যায় না, যেখানে ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি কিছুই করিতে পারে না, সেখানে নিরাকার দেবতা আপনাকে পাপীর বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিলেন। পাপী কি সাহসে বলিল, আমি জগতের রাজাকে আজ বাঁধিয়া ফেলিয়াছি? যাহাকে সহস্রবার পৃথিবী পদাঘাত করিতেছে, সেই নীচ, সকলের দ্বারা অপমানিত ব্যক্তি কোন্ সাহসে আজ বলিতেছে জগতের রাজা আমার ঘরে বন্ধু হইয়াছেন?

শাকান্ন ভোজী আমি, যাহার কিছুই নাই, সেই পাপী দুঃখীর ঘরে জগতের বন্ধু আসিয়াছেন, আমার ঘর আলোকিত হইয়াছে। জগদীশ্বর বলিয়া কেবল তাঁহার পূজা করি এমন নহে; কিন্তু আমি তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া ডাকি, কেন না তিনি নিজে তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া ডাকিতে অনুরোধ করেন, যতবার তাঁহাকে দেবতা বলিয়া ডাকি তিনি ততবার প্রতিবাদ করিয়া বলেন, আমি তোমার মুখে বন্ধু নাম শুনিব। তাঁহার মুখে এই কথা শুনিয়া পাপী কাঁদিতে লাগিল। যখন ঈশ্বর নিজ মুখে বলিলেন, আমাকে দীনবন্ধু

বলিয়া না ডাকিলে আমার মহিমা বুঝিতে পারিবে না, তখন পাপী কি করিবে? পাপী বাধ্য হইয়া বলিল, তোমার দীনবন্ধু নামের জয় হউক। যিনি স্বর্গের রাজা, নীচ পাপীর ঘরে বসিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। কোন গরিব লোক কাছে আসিলে পৃথিবীর রাজার লজ্জা বোধ হয়, অপমান হয়। অভিমান এবং রাগেতে নরপতির শরীর শিহরিয়া উঠে যদি কোন গরিব ছিন্ন বস্ত্র লইয়া তাঁহার নিকটে যায়। এমন সম্বল-বিহীন গরিব দুঃখী তাঁহার কাছে বসিবে ইহা রাজার প্রাণ সহ্য করিতে পারে না। এইজন্য বারবার বলিতেছি নিরাকার সর্ব্বোচ্চ ঈশ্বর যিনি তিনি জগতের কাছে সুলভ হইলেন, তিনি আমাদের বন্ধু হইলেন; কিন্তু নীচ সংসারের সাকার বন্ধু দুর্লভ হইল। সংসারে বন্ধু পাইলাম না তথাপি আমাদের প্রাণ এমনই বন্ধুতা-প্রিয় যে আমরা স্বভাবতঃ সাকার বন্ধু চাই। কেন চাই? সেই নিরাকার বন্ধুর অনুরোধ।

স্বর্গে না গেলে আর বন্ধু পাইব না, ইহা যদি সত্য হয় তবে যে, পৃথিবীতে জীবন ধারণ করা অত্যন্ত কষ্টকর। সমস্ত দিন যে পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছি, যাহাদের মধ্যে সমস্ত দিন থাকিতে হয়, তাহাদের মধ্যে কি বন্ধু পাইব না? কোথায় বন্ধু, কোথায় বন্ধু, বলিয়া হাহাকার করিয়া চীৎকার করিলাম, ধর্ম্মের যিনি পূর্ণ আদর্শ, তিনি স্বর্গ হইতে বলিলেন, এই আমি তোমার বন্ধু; স্বর্গের বন্ধুকে লাভ করিলাম; কিন্তু তথাপি প্রাণ সাকার বন্ধুদিগের জন্য আরও ব্যাকুল হইল। যিনি ধর্ম্মের আকর তাঁহাকে পাইলাম, তাঁহারই অনুরোধে আবার যাঁহারা ধর্ম্ম-পরায়ণ তাঁহাদিগকেও বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিতে মন ব্যাকুল হইল। মনুষ্যের শরীর যখন

আছে শরীর সাধন করিতে হইবেই। পবিত্রতা এবং প্রেম নিরাকার ঈশ্বরেতে পূর্ণভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, মানুষ ইহা জানিয়াও সর্ব্বদা ভাবিয়া উঠিতে পারে না, এইজন্য কোন সাকার ব্যক্তির মধ্যে পুণ্য ও প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখিলে মনুষ্য সহজেই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই ভাবের ব্যভিচার হইলেই মনুষ্য পৌত্তলিক হইয়া অবতার স্বীকার করে। কিন্তু যতই কেন মনুষ্যের এই স্বভাবের বিকৃতি হউক না, ইহা যে পরিত্রাণ-পথে আবশ্যক তাহাতে আর সন্দেহ হইতে পারে না। অনেকে বলেন, জগদীশ্বর যদি আমাদের বন্ধু হইলেন তবে পৃথিবীর বন্ধুতার প্রয়োজন কি? এই কথা মানি না। মনুষ্যের মধ্যে বন্ধু চায় না কে? অনেকক্ষণ ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া থাকিতে পার, অভ্যাস ও সাধন-বলে চরিত্র নির্ম্মল করিয়াছ, এ সকল কথা স্বীকার করিলাম; কিন্তু বন্ধু পাও নাই বলিয়া কি দেহ প্রাণ জর্জ্জরিত হয় নাই? নর-দেহ-বিশিষ্ট বন্ধু চাহি না যদি কেহ এই কথা বলে, সেই ব্যক্তি অনেক চেষ্টা করিয়া বন্ধু পায় নাই বলিয়াই নিরাশ হইয়াছে। বন্ধুতার জন্য অনেক পরিশ্রম করিয়াছিল, অনেক উচ্চ দাম দিতে পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছিল; কিন্তু কিছুতেই তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল না, সেই জন্য সে ব্যক্তি এই যুক্তি বাহির করিল; যখন ঈশ্বর বন্ধু হইলেন তখন অন্য বন্ধু চাহি না, ঈশ্বরেতে বন্ধুতা বদ্ধ কর, নরদেহে বন্ধুতা অন্বেষণ করিবার প্রয়োজন নাই।

কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি যদি নরবন্ধুর আবশ্যকতা না থাকিত, তবে ঈশ্বর সংসার সৃজন করিলেন কেন? ইহা যদি সত্য হয় যে মানুষ বন্ধু বিহীন হইয়া একাকী থাকিতে পারে তবে আমরা

অরণ্যবাসী জন্তু হইলাম না কেন? ঈশ্বর তবে কেন আমাদিগকে পিতা, মাতা, ভার্য্যা, প্রিয় পুত্র ইত্যাদি পরিবার মধ্যে বাস করিতে দিলেন? নীচই হউক, জবন্যই হউক আমাদের সকলেরই সাকার বন্ধুর প্রয়োজন আছে। দুঃখের দুঃখী, সুখের সুখী হইবার জন্য ঈশ্বর পিতা পুত্র, স্বামী ভার্য্যা ইত্যাদি সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দিয়াছেন। পৃথিবীতে এ সমুদয় বন্ধু বান্ধবদিগের প্রয়োজন হইবে মনুষ্যের এই নিগূঢ় প্রকৃতি জানিয়াই ঈশ্বর বাহিরে এ সকল উপকরণ সৃজন করিয়া দিয়াছেন। ঈশ্বর আমাদিগকে এমন প্রকৃতি দিয়াছেন যে, স্বভাবতঃই আমরা বন্ধু অন্বেষণ করিব। যদি সমস্ত অভিধানে কোন শব্দ থাকে, যাহা শ্রবণ করিলে অন্তরের গভীর দুঃখ দূর হয়, সেই শব্দ বন্ধুতা। সকল রোগের একমাত্র ঔষধ এই বন্ধুতা। দুঃখ ঘুচিবে না বন্ধু বিনা। প্রাতঃকালে জাগিয়া উঠিবা মাত্র মনুষ্যের চক্ষু বন্ধুতার জন্য ব্যাকুল হয়। স্ত্রী পুত্র সংসার ছাড়িয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিলাম কেন? বন্ধু চাই। প্রাণ কাঁদে বন্ধুতার জন্য মনুষ্য ইহা বুঝিতে পারে না। এই গুপ্ত দুঃখের কথা বলি কাহাকে? পর্য্যটক আমরা সকলেই, আহার নাই, নিদ্রা নাই, কিসের জন্য ভ্রমণ করিতেছি? কি অন্বেষণ করিতেছি? তোমরা বল ব্রাহ্মসমাজ চাই, ভক্ত ব্রাহ্ম চাই, আমি বলি বন্ধু চাই, আমি বারবার বলি, আর কিছু চাহি না, বন্ধুতা চাই। কতকগুলি বন্ধু চারিদিকে, আর মধ্যে দীনবন্ধু, তাহা হইলেই স্বর্গরাজ্য হয়। যার এতগুলি বন্ধু তার দুঃখ কি? এ বন্ধুরা যাহা পারিবে না, তাহা স্বর্গের বন্ধুকে জানাইব। একবার স্বর্গের বন্ধু, একবার পৃথিবীর বন্ধু, একবার উচ্চদেশে, একবার নিম্নদেশে, বন্ধুতা সম্ভোগ, এইরূপে

দেখিব বন্ধুতা-সাগরে ভাসিলাম, বন্ধুতা-সমীরণে ডুবিলাম। অতি সুন্দর ছবি, কিন্তু অদ্যাবধি পৃথিবীতে ইহা কেহ কখনও দেখে নাই। ব্রাহ্মসমাজে ইহা দেখিব আশা করিয়াছিলাম। তোমাদের যেমন ইহা প্রয়োজন, আমারও ইহা তেমনই প্রয়োজন।

প্রাণের বন্ধু চাই। বন্ধু দিবে বলিয়া পৃথিবী একদিন আশা দিয়াছিল, অঙ্গীকার করিয়াছিল; কিন্তু পৃথিবী সেই অঙ্গীকার লঙ্ঘন করিয়াছে। পৃথিবীতে পিতা মাতা বড়; কিন্তু পিতা মাতা কেহই আত্মার বন্ধু হইলেন না। পিতা, তুমি ধন্য! মাতা, তুমি ধন্য! কেন না তোমরা সন্তানের জন্য অনেক করিয়াছ; কিন্তু পিতা, তুমি আত্মার বন্ধু নহ। মাতা তুমিও আত্মার বন্ধু নহ। আত্মার যখন বস্ত্র না থাকে, তুমি তাহাকে আচ্ছাদন করিতে পার না, আত্মার যখন ক্ষুধা তৃষ্ণা হয়, তুমি তাহাকে অন্ন জল দিতে পার না। আত্মা যখন কাতর হয়, তুমি তাহাকে সান্ত্বনা দিতে পার না। ভার্য্যা, তুমিও আত্মার বন্ধু নহ। স্বামী ভার্য্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি আমার আত্মার বন্ধু? ভার্য্যা কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি সংসারের বন্ধু। স্বামীর অনুগামিনী হইয়া তিনি স্বামীর সংসারের দুঃখ কষ্ট দূর করেন, কিন্তু স্বামীর আত্মার তত্ত্ব তিনি লইতে পারেন না। ভাই ভগিনী ও প্রতিবাসীরাও কত অনুরাগভাজন, কিন্তু কেহই আত্মার বন্ধু, ধর্ম্মপথের সহায় হইল না। এই দুঃখে সংসার পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিলাম, মনে করিলাম সুপ্রভাত হইল। ব্রাহ্মসমাজের কত লোককে মনে করিলাম, ইনি বুঝি বন্ধু হইলেন; কিন্তু কিছুদিন যাইতে না যাইতে দেখি যাঁহাকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিলাম, তিনি হৃদয়ে অস্ত্রাঘাত করিয়া চলিয়া

গেলেন। উচ্চ হইতে উচ্চতর, নির্ম্মল হইতে নির্ম্মলতর চরিত্র ব্রাহ্ম দেখিলাম; কিন্তু তাহাতে আমার কি? আমার বন্ধু কৈ তাঁহারা হইলেন? হায়! কোন ব্রাহ্ম কি বলিতে পারিবেন না, ঐ আমার বন্ধু? পাপী হই, সাধু হই, ঐ আমার চিরকালের বন্ধু। কিন্তু দুঃখের কথা বলিতে হইল, এই কথা লিখিয়া রাখ, আজ পর্য্যন্ত কোন ব্রাহ্ম বন্ধু পান নাই। মতের মিলন, এবং রুচির মিলন বন্ধুতা নহে; কিন্তু দীনবন্ধু যাঁহার জীবনবন্ধু তিনিই প্রকৃত বন্ধু; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সাকার বন্ধু পাই নাই, অতএব যাই বন্ধুহীনের বন্ধু যিনি তাঁহার কাছে। সকল বন্ধুর বন্ধু যিনি, তিনি একমাত্র বন্ধু আজ কাল হউন।

হে দীননাথ! এ সম্বোধন যদি তোমার ভাল না লাগে, তোমারই অনুরোধে তোমাকে ডাকি হে দীনবন্ধু, প্রাণবন্ধু, এই বন্ধুহীনের বন্ধু! কেহই ত বন্ধু হইল না এ পৃথিবীতে। তুমি পাপীর বন্ধু হইলে; কিন্তু মানুষ আপনাকে এত বড় মনে করে যে, সে পাপীর বন্ধু হইবে না। এমন নীচ, জঘন্য অপমানিত ব্যক্তির বন্ধু আর কে হইবে? তুমি স্বাভাবিক লালসা দিয়াছ বন্ধুতা অন্বেষণ করিতে। সংসারে পাইলাম না, ব্রাহ্মসমাজে আসিলাম, এখানেও পাইলাম না, এখন কোথায় যাই? এইজন্য কোন প্রাচীন ঋষি বলিয়াছেন "স্বর্গে তোমা ভিন্ন আর কে আছে এবং ভূমণ্ডলেও তোমা ভিন্ন আমার আর কে আছে?" ধন্য দয়াময় পরমেশ্বর! তোমার দয়ায় অনেকগুলি উপকারী ভাই ভগ্নী পাইয়াছি, তাঁহাদিগকে তুমি আশীর্ব্বাদ কর; কিন্তু যে বন্ধুর কথা বলিলাম তাহা ত সংসারে নাই। নববন্ধুদিগের সঙ্গে মিলিয়া হে দীনবন্ধু! তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা কত সুখ। হে

বন্ধুহীনের বন্ধু। দয়ার সাগর! বন্ধু তোমার নাম। সেই পথ কোথায় যে পথে গেলে উচ্চ দেবতা! তুমি বন্ধু হইবে এবং পৃথিবীর সাকার মনুষ্যও বন্ধু হইবে। হে দয়াল পিতা! তুমি পৃথিবীতে বন্ধু আনিয়া দিও, নতুবা মনুষ্যের জীবন ভারবহ হইবে। কিন্তু যতদিন না বন্ধুতা পাইব, ততদিন যেন, প্রাণেশ্বর! তোমার নিকটে বসিয়া প্রাণের দুঃখ যন্ত্রণা দূর করি। কত ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা এই তোমার চরণতলে বসিয়া আছেন; কিন্তু ইহাঁদের মধ্যে কি দুইজনও পরস্পরের সখা, বন্ধু হইতে পারেন না? বন্ধুতা বিনা কিরূপে নর নারী পৃথিবীতে একা একাকিনী বাঁচিবে? নাথ, তোমার কাছে বসিয়া সকল দুঃখ দূর করিতে শিখিয়াছি, আমরা ধন্য! কিন্তু দুঃখী মনুষ্যদিগকে পৃথিবীতেও বন্ধুতা দাও। আমরা একত্র হইয়া হে অনাথবন্ধু! চিরপ্রাণসখা! ভাই ভগ্নী সকলে ভক্তির সহিত তোমার শ্রীচরণে প্রণাম করি।

মুদিয়ালী ব্রাহ্মসমাজ।

ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য।

শুক্রবার, ১১ই পৌষ, ১৭৯৬ শক; ২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

ব্রাহ্মধর্ম্ম পৃথিবীতে আসিয়াছেন কেবল সন্ধিস্থাপন করিবার জন্য। সকল বিরোধী মতের সামঞ্জস্য এবং সকল বিরোধী দলের মধ্যে স্বর্গীয় বন্ধুতা স্থাপন করা ইহাঁর উদ্দেশ্য। মীমাংসা শাস্ত্রের কথা

তোমরা শুনিয়াছ, শান্তি-সংস্থাপক বন্ধুর কথা তোমরা শুনিয়াছ, তাহা এই ব্রাহ্মধর্ম্ম। যেখানে ঐক্য হইবার সম্ভাবনা ছিল না, সেখানে ঐক্য স্থাপন করা ইহাঁর লক্ষ্য। পূর্ব্বকালে আর্য্যজাতির মধ্যে যোগ এবং সমাধির ধর্ম্ম প্রবল ছিল। যখন মহর্ষিগণ সংসারের প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া দূরস্থ পর্ব্বত-শিখরে বসিয়া আপনার হৃদয়কে ঈশ্বরে সমর্পণ করিতেন এবং একাকী প্রাণের মধ্যে প্রাণেশ্বরকে দর্শন করিতেন। তখন সেই এক প্রকার ধর্ম্মপ্রণালী ছিল। চারি শত বৎসর অতীত হইল নবদ্বীপ মধ্যে ভক্তশ্রেষ্ঠ চৈতন্য ভক্তির সাধন করিয়াছিলেন। কেবল জ্ঞান ও বাহ্যিক অনুষ্ঠান মধ্যে নিমগ্ন থাকিলে ব্রহ্মকে হারাইতে হয়, এইজন্য ভক্তচূড়ামণি চৈতন্য কি করিলেন? হৃদয়াসনে প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরকে বসাইয়া সেখানে তাঁহার পূজা করিলেন। নামামৃত সকলকে পান করাইলেন। এক শত কেন, সহস্র সহস্র লোক নামামৃত পান করিয়া উন্মত্ত হইল। যে দেশ নির্জীব হইয়া পড়িয়াছিল, এই নামের গুণে সেই দেশ সজীব হইল; যে স্থান মরুভূমি হইয়াছিল, সেই স্থানে হরিনাম-বীজ বপন করাতে প্রেম ভক্তি-পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইল। এই হরিনামামৃত পান করিয়া সহস্র নর নারী আত্মাকে পোষণ করিল। কোথায় পর্ব্বত-শিখরে নির্জনে ব্রহ্মচিন্তা, কোথায় সহস্র সহস্র উন্মত্তদিগের মধ্যে একত্রিত হইয়া পিতার প্রেমে উন্মত্ত হওয়া, ইহা ভাবিলে মনে হয় এই মত পরস্পর কত বিরুদ্ধ। কিন্তু শুষ্ক ব্রহ্মচিন্তা এবং কোমল ভক্তির সাধন এই দুইটীকে একত্র করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম। ধ্যানশীল মহর্ষির ঈশ্বর যিনি, প্রেমিক ভক্তের ঈশ্বরও তিনি, ইহা কে বুঝাইয়া দিলেন? ব্রাহ্মধর্ম্ম। সহস্র

লোক প্রেম ভক্তিতে উন্মত্ত হইলে কল্পনার পথে পড়িতে হয়, কে এ কথার প্রতিবাদ করিলেন? ব্রাহ্মধর্ম্ম। মীমাংসার শাস্ত্র আমরা পাইয়াছি। শান্তি-সংস্থাপক বন্ধুর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছে। যে দিন ইহাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে, সেই দিন হইতে বুঝিয়াছি, পৃথিবীতে কোন প্রকার বিচ্ছেদ থাকিবে না, প্রেমের মিলন আসিবে।

বন্ধুগণ, ধৈর্য্য অবলম্বন কর বিলম্বে আসিবে। সকল বিরোধী দল একত্রে বসিবে। ভক্তবৎসল ঈশ্বর সকলের মুখে তাঁহার নামসুধা ঢালিয়া দিবেন। অসম্ভব যাহা তাহা সম্ভব করিবেন ব্রাহ্মধর্ম্ম। ধ্যান এবং ভক্তিসাধনের ঐক্য হইবে ব্রাহ্মধর্ম্মে। নিমীলিত নয়নে যদি সমস্ত দিন ব্রহ্ম ধ্যান করি, ইনি ব্রহ্ম নন, ইনি ব্রহ্ম নন, নেতি, নেতি, এইরূপ সাধন ক্রমাগত করিয়া অবশেষে সকলের অতীত এক নিরাকার পুরুষকে দেখিব। সকলকে ভুলিয়া গিয়া একাকী ধ্যানগৃহে প্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন বোধ হয়। নির্জনতার মধ্যে আপাততঃ অন্ধকার দেখিয়া মনে হয়, এ পথে কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? এ পথে কি সুন্দর ঈশ্বরকে দেখা যায়? পূর্ব্বকালের সেই কঠোর সাধনতত্ত্ব যদি আমরা অবগত হই তাহা হইলে দেখিব তাহার ফলও কেবল শুষ্ক। সেই সাধনে পৃথিবী ভাল লাগে না, স্ত্রী পুত্র সকলকে বিষবৎ মনে হয়, পৃথিবীর তাবৎ বস্তুর উপর বিরাগ জন্মে, কেবলই নিমীলিত নয়নে ব্রহ্মানুসন্ধান করিতে ইচ্ছা হয়। ইহাতেই ধ্যান-পরায়ণ লোকের আনন্দ। পক্ষান্তরে অনেকে ভয় করেন যদি আমরা প্রেমোন্মত্ত হই, অবশেষে হয় ত ধ্যান-বিহীন হইতে পারি, একাকী থাকা, বৃক্ষ লতার নিকট উপদেশ গ্রহণ করা কঠিন হইবে, ধ্যানের নাম শুনিবা মাত্র মনে বিরাগ

হইবে। নির্জনে থাকা কঠিন হইবে। তাঁহারা বলেন যেথানে ভ্রাতা ভগ্নী নাই সেথানে উপাসনা হয় না। এই উভয় দলের প্রতি ব্রাহ্মধর্ম্ম আশার কথা বলিতেছেন। ধ্যানশীল ব্যক্তিদিগের আশঙ্কা নাই, কেন না ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন প্রেমের ধর্ম্ম, ইহা তেমনই ধ্যানের ধর্ম্ম। সকলের নিকটে থাকিলেও নির্জন, নির্জনে থাকিলেও সজন এ কথা কেবল ব্রাহ্মধর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়াছেন। অতি সুন্দর কথা। সজনে নির্জন, নির্জনে সজন। সুকোমল ভক্তি-পুষ্পের মধ্যে অত্যন্ত কঠোর সাধন।

ভক্ত ঈশ্বরের প্রেমামৃত পান করিয়া মূর্চ্ছার অবস্থা প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাহার মধ্যেও যথার্থ সাধকের আত্মাতে জ্ঞান চৈতন্য নিয়ত প্রস্ফুটিত হইতেছে। জ্ঞান-বিহীন তিনি হন না যিনি প্রেমে উন্মত্ত হন, চৈতন্য নিজে ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। দূর হউক সেই কল্পিত কৃত্রিম ধ্যান, যাহা মনুষ্যকে অন্তরে অন্ধকার দেখাইয়া ভীত করে। যাহাতে স্ত্রী পুত্র, সকলকে হারাইতে হয়। সেই বিবেকশূন্য, শান্তিশূন্য ধ্যান পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইবে। থাকিবে সেই ধ্যান যাহার মধ্যে সুন্দর হইতে সুন্দরতর, মিষ্ট হইতে মিষ্টতর ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। কে বলে ব্রহ্মধ্যানে প্রাণ শুষ্ক হয়? যেথানে পাঁচটী গোলাপ ফুল ফুটিয়াছে, যেথানে বেল, মল্লিকা প্রভৃতি আপনার আপনার স্বর্গীয় শোভা দেখাইয়া নয়ন মোহিত করে, যেথানে নদীর স্রোত অতি মধুর স্বরে প্রবাহিত হইতেছে, সেথানে একাকী তাঁহার ধ্যান করিলে আনন্দ বৃদ্ধি হয়; কিন্তু স্ত্রী পুত্র বন্ধু বান্ধবদিগের মধ্যে বসিয়া ঈশ্বরের ধ্যান কেমন মিষ্ট তাহা কেবল ব্রাহ্মধর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়াছেন। একাকী ভক্ত ব্রহ্মধ্যানের অমৃত পান করিলেন, পিতা

মুক্তহস্তে তাঁহার হৃদয়ে প্রেম ঢালিয়া দিলেন। তিনি এই বলিয়া আনন্দে কাঁদিতে কাঁদিতে দৌড়িলেন, কোথায় আমার পিতা মাতা, কোথায় আমার স্ত্রী পুত্র, কোথায় আমার প্রিয়জন,—"এমন আনন্দ একাকী ভোগ করিতে পারি না।" এমন সুখ সকলকে ভোগ করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রাণের আনন্দ আরও উথলিয়া উঠিল। তিনি আনন্দে বলিলেন স্বর্গ দেখিয়াছিলাম অন্তরে, এখন বাহিরে। বান্ধব-বিহীন হইয়া গিয়াছিলাম স্বর্গে, এখন বান্ধবদিগের মধ্যে স্বর্গ ভোগ করিতেছি। পৃথিবীর নরপতির এমন সুখ নাই। ধ্যানে এত সুখ প্রেমে এত সুখ, সজনে পিতার পূজায় এত সুখ, নির্জনে একাকী পিতাকে দেখিলে এত সুখ ইহা কে শিখাইলেন? ব্রাহ্মধর্ম্ম। কি জানি কি হইতাম যদি ভক্তির বাগান ছাড়িয়া কঠোর ধ্যানের পথ অবলম্বন করিতাম। আবার কি জানি কি হইতাম যদি জ্ঞান চৈতন্য পরিত্যাগ করিয়া বাহ্যিক উন্মত্ততায় মগ্ন হইতাম। কিন্তু প্রেমসিন্ধু তাহা হইতে দিবেন কেন? যেখানে তিনি আমাদের পরিত্রাতা সেখানে ভক্তি ধ্যানের সঙ্গে কলহ হইবে কেন? ভক্ত যেখানে মহর্ষি সেখানে। কেন না যিনি সত্যের আধার তিনিই প্রেমের আধার। এক চক্ষে দেখিব সূর্য্যকে, অন্য চক্ষে দেখিব চন্দ্রকে। সত্য প্রেমের বিরোধ থাকিবে না। ভক্ত ও ঋষিরও বিরোধ থাকিবে না। এই নামামৃত সমুদ্রের উপরে ভাসিলে, ভাসিয়া যাইব। ভিতরে প্রবেশ করিলে নূতন নূতন সত্য পাইয়া আমরা ধনী হইব। প্রথমতঃ আমরা দুঃখী কাঙ্গাল ছিলাম; কিন্তু আমাদের পিতা না কি ধনী, তাঁহার নামরত্নে তাঁহার নামানন্দে আমরা আনন্দিত হইলাম। তাঁহার নাম-স্বর্গে বাস করিয়া আমরা

সুখী হইব। পৃথিবীর দুঃখ আর থাকিবে না। আনন্দের সংবাদ আসিয়াছে। বন্ধুগণ, এই নামানন্দে আনন্দিত হইয়া তোমরা পৃথিবীকে সুখী কর।

হে প্রেমময় পরমেশ্বর! তোমাকে আমরা দেখি জ্ঞান-চক্ষে, তোমাকে আমরা দেখি ভক্তি-চক্ষে। যেমন তোমাকে দেখি সত্য বলিয়া, তেমনই তোমাকে দেখি আনন্দময় বলিয়া। ধ্যানশীল হইয়াও তোমাকে দেখি, ভক্ত হইলেও তোমাকেই দেখি। কত লোক কঠোর ধ্যান করিয়াও তোমাকে দেখিল না, আবার কত লোক কৃত্রিম প্রেমে মত্ত হইয়াও তোমাকে সত্যরূপে দেখিল না। আমাদের কত সৌভাগ্য, আমরা তোমার সত্যমুখ এবং প্রেমমুখ দুইই দেখিয়া কৃতার্থ হইতেছি। ভ্রম নাই, অসত্য নাই, সকলই সত্য, এই আমাদের প্রাণনাথ, কেমন সুকোমল, ইহাঁর মুখ দেখিলে আবার ইচ্ছা হয়, সকলকে দেখাই। প্রিয় পরমেশ্বর! ব্রাহ্মের কত সৌভাগ্য যে এমন সময়ে তোমার সত্যমুখ, এবং প্রেমমুখ দেখিতে অধিকারী হইয়াছেন। একটী ভিক্ষা চাই, যাহাতে ইহা অন্তরে রক্ষা করিতে পারি এই ক্ষমতা দাও। প্রভু দয়াল! যদি তুমি সহায় হও তবে আমরা ধ্যান ধারণ, এবং প্রেম ভক্তি একত্র সাধন করিতে পারিব। যেমন ধ্যানশীল, তেমনই প্রেমিক হৃদয়ে তোমার পূজা করিব। যেন এই সুমিষ্ট পথ অবহেলা না করি। যোগীও হইব, ভক্তও হইব। এমন সুখের অবস্থা আর কোথায় পাইব? আরও প্রেমিক কর, আরও ধ্যানশীল কর। দেখ যেন এই দুঃখীদের কিছুতেই আর পতন না হয়। যতদিন বাঁচিব আশীর্ব্বাদ কর তোমার পবিত্র চরণ সেবা করিয়া যেন কৃতার্থ হই।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

ঈশ্বর লাভ সহজ। *

রবিবার, ২০শে পৌষ, ১৭৯৬ শক; ৩রা জানুয়ারি, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

নিগূঢ় ধর্ম্মরাজ্যের ভিতরে প্রবেশ করিয়া ভাবিলে মনে হয় যেন ঈশ্বর পূর্ব্বেকার সাধন প্রণালী পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। ছিল যাহা মনুষ্যের হস্তে তাহা তিনি নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। যাহা অতি কষ্ট এবং আয়াস সাধ্য ছিল, তাহা সহজ হইয়াছে। এমন সময় ছিল, ছিল কেন, এখনও আছে, মনুষ্য বহুদূর গিয়া তীর্থ স্থানে উপস্থিত হইত, সেখানে তাহাদের দেব দেবী দর্শন করিত, ইহাতে কেবল মনের কষ্ট নহে, শরীরেরও কষ্ট হইত। এই প্রণালীতে পরিত্রাণ পাওয়া দূরে থাকুক, ইষ্ট দেবতা দর্শনও মহা কষ্টকর। দেবতাকে দেখিবার জন্য মন কাঁদিয়া উঠিল; কিন্তু উপায় নাই, সহায় নাই, অর্থ নাই, ইষ্ট দেবতা সহস্র ক্রোশ দূরে। পথে যদি হিংস্র জন্তু এবং তস্করদের উৎপাত থাকে, দেব-দর্শন আরও ভয় ও আরও কষ্টের ব্যাপার। শরীরের সুস্থতা চাই, অর্থ চাই, এবং তীর্থ যদি বহু দূরে হয়, ছয় মাস কাল ক্রমাগত পথ ভ্রমণ করিয়া যদি প্রাণ বাঁচিয়া থাকে, তবে সেই দেশে উপস্থিত হইব যেখানে দেব-মন্দির। তীর্থ মানিলে দেখ কত কষ্ট সহ্য করিতে হয়। কিসের জন্য? পরিত্রাণের জন্য নহে, কেবল ঈশ্বর-দর্শন জন্য, আগে দেব-দর্শন করিবার জন্য এই প্রকার কঠোর সাধন প্রণালী ছিল। যখন সেই

সকল ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে আমাদের অবস্থা তুলনা করি, তখন বলি ধন্য জগদীশ্বর! তুমি নিকটে আসিয়া দেখা দিয়া আমাদিগের সকল দুঃখ কষ্ট দূর করিলে।

যাঁহারা বহু কষ্ট করিয়া তীর্থ দর্শন করিতেন, যখন তাঁহাদের দুঃখের কথা স্মরণ করি, তখন বুঝিতে পারি কত সৌভাগ্য তোমাদের! সেই জন্য বলিয়াছি, নিগূঢ় ধর্ম্মরাজ্যের ভিতরে প্রবেশ করিয়া চিন্তা করিলে মনে হয়, যেন ঈশ্বর পূর্ব্বকার সাধন প্রণালী পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। পূর্ব্বে কষ্ট, যন্ত্রণা, ভয় এবং নানা প্রকার রোগ সত্ত্বেও মনুষ্যদিগকে তীর্থ-স্থানে যাইয়া দেব-দর্শন করিতে হইত। এক্ষণে তোমরা ঈশ্বরকে দেখিতে যাও না; কিন্তু তিনি আসিয়া তোমাদিগকে দেখা দিলেন। এত কষ্টের পর তীর্থে যাইয়া আর দেব-দর্শন করিতে হয় না, পথিমধ্যে হিংস্র জন্তুদের হাতে পড়িয়া প্রাণ যায় যায় এ সব দুর্ঘটনা আর নাই। ছিল তীর্থ-স্থান কাশী বৃন্দাবনে, হইল তীর্থ-স্থান হৃদয়-মন্দিরের মধ্যে। ঈশ্বর ব্রাহ্মের অন্তরের অন্তরে আপনাকে প্রকাশিত করিলেন। তাঁহার দর্শনকে আমাদের কত সুলভ করিলেন। ঈশ্বর-দর্শন লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র, গৃহ ছাড়িয়া চলিলাম, দুই হস্ত পথ যাইতে না যাইতে হৃদয়ের ভিতর হইতে তিনি বলিলেন, যাও কোথায়? ঘরে বসিয়া যিনি আপনাকে প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন তাঁহাকে দেখিবার জন্য কি দূরে যাইতে হয়?

ঈশ্বর দর্শনের জন্য বিলম্বও করিতে হয় না। কালেও ব্যবধান নাই, দেশেও ব্যবধান নাই। মনের দুঃখ জানাইব আজ, পঞ্চাশ বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে তাহা নহে। যখন দেখি আমাদের পক্ষে

ঈশ্বর-দর্শন কত সহজ তখন কি হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে ধন্যবাদ করিব না? কত সময় ঈশ্বর এই সত্য বুঝাইয়া দিতেছেন যে, তাঁহার দর্শন-সুখ সর্ব্বদাই আমরা সম্ভোগ করিতে পারি; কিন্তু নির্ব্বোধ মনুষ্য তাহার মূল্য বুঝিল না, তাহার জন্য কৃতজ্ঞ হইল না। পৌত্তলিকদিগের কাছে তীর্থ বহু মূল্যবান রহিল, ব্রাহ্মের নিকট ব্রহ্ম-দর্শনের মূল্য সামান্য হইল। যদি ঈশ্বরকে দেখিবার জন্য অনেক দূর যাইতে হইত, তাহা হইলে কত আয়াস এবং কত পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইত; কিন্তু ঘরে বসিয়া যখন তাঁহাকে পাইলাম, কোথায় তাঁহাকে আরও ভাল করিয়া দেখিব, না আমরা তাঁহার অপমান করিতেছি। আমরা যে যতবার ইচ্ছা করি ততবার ঈশ্বরকে দেখিতে পারি। তাঁহাকে পাইবার জন্য দূরে যাইতে হইল না। যেখানে ছিলাম, সেখানেই রহিলাম, হয় নিমীলিত, নয় উন্মীলিত নয়নে তাঁহাকে দেখিলাম। প্রতি ব্রাহ্ম দেখিয়াছেন, যাই তিনি প্রার্থনা করিতেছেন, প্রার্থনার পূর্ব্বে ঈশ্বর ঘরে আসিয়া বসিয়া আছেন। প্রার্থনা করিবার আগে তিনি দেখা দিয়া বসিয়া আছেন, কত সময় প্রার্থনার একটী শব্দও উচ্চারিত হয় নাই, মনে করিয়াছিলাম অনেক দিন তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই, আজ তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিব, দেখি ইহা মনে করিবার পূর্ব্বে তাঁহার পবিত্র প্রেমমুখ প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে। উপাসনার কোন কথা উচ্চারণ করিতে হইল না, আয়োজন কিছুমাত্র নাই, ব্রহ্ম ঘরে আসিয়া বসিয়া আছেন।

বহুদূর ভ্রমণ করিয়া তাঁহার কাছে যাইতে হয় না, বরং তিনি উপদ্রব করিয়া প্রতি ঘরে ঘরে যাইতেছেন। যাঁহার জন্য এত

আয়োজন করিয়াছিলাম, তিনি আগেই অনিমন্ত্রিত হইয়া আমার ঘরে বাস করিতেছেন। একটী কথাও বলিতে হইল না। প্রার্থনা করিলে ঈশ্বর আসেন, এই যুক্তি কোথায় রহিল? পূর্ব্বে শুনিতাম অনেক কণ্টকময় পথ অতিক্রম করিলে তবে সুরম্য স্থান দেখা যায়, কত লোকে কত বৎসর স্তব স্তুতি করিল তথাপি ঈশ্বরকে দেখিতে পাইল না; কিন্তু আমাদের কি সৌভাগ্য, প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বেই দেখি আমাদের অন্তরে সেই প্রেমানুরঞ্জিত মুখ প্রকাশিত। যাহা মনে করিয়াছিলাম, দয়াময়ের রাজ্যে যখন তাহার বিপরীত দেখিতেছি, তখন সাধন এবং ঈশ্বর-দর্শন কষ্টকর বলিব কিরূপে? যখন দেখিতেছি আমাদিগের দেখা দিবার ভারও তিনি আপন হস্তে লইয়াছেন, তখন আর ব্রহ্ম-দর্শন কঠিন বলিব কিরূপে? আগেকার লোকদের কি কষ্ট ছিল, আর এখনকার অতি সামান্য ব্রাহ্মেরও কি উচ্চ অধিকার! আমি কত আয়োজন করিয়া ঘর সাজাইয়া তাঁহাকে ডাকিব মনে করিয়াছিলাম, একটু কষ্ট না লইলে কি তাঁহাকে দেখিতে পাইব এই ভাবিয়া, এই যুক্তি মানিয়া, এই কথা ঠিক মনে করিয়া, স্ত্রী পুত্র পরিবার ছাড়িয়া, প্রতিজ্ঞা করিয়া ঈশ্বরকে অন্বেষণ করিতে বাহির হইলাম, মনে করিলাম স্ত্রীর সঙ্গে, পুত্র কন্যার সঙ্গে দেখা না হয়, নাই হইল, যদি ঈশ্বরকে দেখিতে না পাই কি হইবে এই প্রাণ লইয়া?

বাস্তবিক ঈশ্বরকে দেখিবার জন্য যখন প্রাণ আকুল হয়, তখন এই জগতের আর কিছুই আমাদিগকে আকর্ষণ করিতে পারে না; কিন্তু তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুলিত মনে বাহির হইয়া দেখি কি, পুণ্যের আদর্শ প্রেমসিন্ধু ঈশ্বর সম্মুখে! তাঁহাকে দেখিয়া

লজ্জিত হইলাম, অবাক্ হইলাম। তিনি বলিলেন সন্তান! আমাকে দেখিবার জন্য তোমাকে পথের পথিক হইতে হইবে না, শ্রান্ত হইতে হইবে না। দেখ তুমি অন্বেষণ করিবার পূর্ব্বেই আমি তোমার ঘরে আসিয়া বাস করিতেছি। কি বলিব, তাঁহাকে দেখিয়া আর নয়ন ফিরাইতে পারিলাম না, কথা সরিল না, কৃতজ্ঞতাতে অবনত হৃদয় তাঁহার চরণ আলিঙ্গন করিল। তাঁহাকে দেখিবার জন্য পরিবার সংসার হইতে বিচ্ছেদ হইবে মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু ঈশ্বর তাহা হইতে দিলেন না। তিনি বলিলেন সন্তান! পরিবার মধ্যে আমি তোমাকে দেখা দিব। কত উচ্চ অধিকার! পাপীর দুঃখ করিতে হইল না। আমাদের এই সৌভাগ্য, এই উচ্চ অধিকার স্মরণ পথে আসে; কিন্তু আবার বিলুপ্ত হয়। কেন আমরা ইহা সর্ব্বদা ভাবি না? কেন আমরা এ সকল চিন্তারূপ অমূল্য রত্ন সর্ব্বদা হৃদয়ে ধারণ করি না? আমাদের তীর্থ গেল, কষ্ট গেল, আমাদের ঈশ্বর চারিদিক আলোকিত করিয়া বসিলেন। তিনি বলিলেন, দেখি কোন্ ব্রাহ্ম আমাকে না দেখিয়া থাকিতে পারে? দেখি বর্ত্তমান শতাব্দীর শত সহস্র জ্ঞানাভিমানী পণ্ডিত একত্র হইয়া আমাকে কুটিল যুক্তি-অস্ত্রে ছেদন করিতে পারে কি না? দেখি পৃথিবীতে কাহারও ক্ষমতা আছে কি না যে, আমাকে না দেখিয়া থাকিতে পারে? তীর্থের ইষ্ট দেবতা যিনি তাঁহাকে দেখিবার জন্য কত আয়াস কত পরিশ্রম, কত কষ্ট, কিন্তু সত্য ঈশ্বর যিনি তিনি বলিলেন, দেখি কোন্ মহাপাপী আমাকে তাহার নয়ন-পথ হইতে বাহির করিয়া দিতে পারে? বস্তুতঃ কাহার সাধ্য ঈশ্বরকে নয়ন-পথ হইতে ফিরাইয়া দেয়। আমরা ইচ্ছা করি না করি তিনি আমাদের সম্মুখে। ইচ্ছা

না করিলেও তাঁহাকে দেখিতে হইবে। এমন অমূল্য অধিকার পাইয়াও কি আমরা অকৃতজ্ঞ থাকিব? কখনও যেন না ভুলি, ঈশ্বর ব্রাহ্ম বলিয়া আমাদিগকে কেমন মহোচ্চ অধিকার দিয়াছেন।

পঞ্চচত্বারিংশ মাঘোৎসব।

ঈশ্বর ভিখারী।

প্রাতঃকাল, রবিবার, ১২ই মাঘ, ১৭৯৬ শক;
২৪শে জানুয়ারি, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

নির্ব্বোধ মনুষ্য জিজ্ঞাসা করে আকাশে কেন ইন্দ্রধনু উঠিল না? আকাশ পরিষ্কার, সেই আকাশে তবে ইন্দ্রধনু প্রকাশিত হইয়া কেন সৌন্দর্য্য বিস্তার করিল না? নির্ব্বোধ মনুষ্য বিজ্ঞান পড়ে নাই, তাই এই কথা বলিল। স্বর্গ হইতে বৃষ্টি আসুক, তবে সেই মনোহর ইন্দ্রধনু প্রকাশিত হইবে। সূর্য্য প্রকাশিত, আকাশ পরিষ্কার, কিন্তু জলের প্রয়োজন। ভক্ত এই বিজ্ঞান পাঠ করিয়াছেন। হৃদয়-আকাশে প্রেম-রবি আছেন; কিন্তু যতক্ষণ না ভক্তের চক্ষে ভক্তিধারা পড়ে, ততক্ষণ সেই মনোহর বস্তু ইন্দ্রধনু দেখা যায় না। সূর্য্যোদয় হইলে কি হইবে, যদি ভক্তের চক্ষু হইতে সেই বারিধারা না পড়ে? একবার চক্ষু হইতে এক ফোঁটা জল ফেল, দেখিবে স্বর্গের সেই সুন্দর দৃশ্য প্রকাশিত হইবে। নির্ব্বোধ মনুষ্য জিজ্ঞাসা করে, পৃথিবীতে আকাশের বস্তুগুলির প্রতিবিম্ব হয় না কেন?

বিজ্ঞান জানে না, তাই মূর্খ এই কথা বলে। জলাশয় না থাকিলে কি চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পড়ে? পৃথিবী যদি পাথরের মত থাকে, পরিষ্কার হইল তাহাতে কি? স্বর্গের আলোক, স্বর্গের বস্তু ত তাহাতে প্রতিভাদ হইতে পারে না। আকাশের বস্তুগুলির প্রতিবিম্ব দেখিতে হইলে জলাশয় চাই, নদী চাই, সমুদ্র চাই। যদি একটী ক্ষুদ্র জলপাত্রের ভিতরেও চন্দ্রের প্রতিবিম্ব দেখিয়া থাকি, তাহা হইলে বুঝিয়াছি আমাদের প্রাণেশ্বরকে আমরা কিরূপে দেখিব।

শুষ্ক কঠোর ভূমিতে কিছুই দেখিতে পাই না। কত উপদেশ শুনিলাম, কত সাধু বাক্য পাঠ করিলাম কিছুই হইল না; একটী জলাশয় খনন করিলাম, তাহার মধ্যে স্বর্গের প্রতিবিম্ব দেখিলাম। কোন্ গূঢ় নিয়মে স্বর্গের রাজা মনুষ্যের হৃদয়ে অবতীর্ণ হইলেন? চাষাও বলে, একটী ক্ষুদ্র জলপাত্রেও স্বর্গের সামগ্রী দেখিতে পাই। প্রেমিক যদি হই, চক্ষুকে যদি ভক্তিতে আর্দ্র করিতে পারি, তাহা হইলে ঘরে বসিয়াই প্রাণেশ্বরকে দেখিতে পারি। ভাবনা কেবল তাহাদের যাহারা শুষ্ক। যাহার কিছু নাই, সে কাঁদুক, অমনই সে দেখিবে, তাহার চক্ষের জলে স্বর্গের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। ভক্ত সেই শাস্ত্র পড়িয়াছেন, পড়িয়াছেন বলিয়াই মজিয়াছেন। সামান্য ভক্ত যিনি তাঁহার কত আহ্লাদ! তিনি বলেন, যে দিন আমার ঘরে অন্ন বস্ত্র থাকিবে না, আমি একবার কাঁদিব, আমার সকল অভাব দূর হইবে, বিপদে মানুষের সকলই যায়; কিন্তু কাঁদিবার শক্তি ত যায় না? সেই বিপদই তাহাকে কাঁদায়। দেখ, তবে ঈশ্বরের আশ্চর্য্য জগতে রোগ বিপদ আপনার প্রতীকার আপনি করিয়া লয়। অতএব ক্রন্দন ভক্তের পক্ষে অমূল্য ধন, ইহা মানিও। যখনই ভক্তগণে

ভক্তি-জল পড়িবে, তৎক্ষণাৎ তাহার মধ্যে অত্যন্ত দূরস্থ স্বর্গীয় বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়িবে।

যে দুঃখ কাঁদায় সেই দুঃখই প্রাণেশ্বরকে নিকটে আনিয়া দেয়। যে দুঃখ শত্রু হইল, সেই দুঃখই মিত্র হইল। যে চক্ষু কাঁদিয়াছিল, সেই চক্ষুই হাসিল। ভক্তিতে চক্ষুকে আর্দ্র করিয়া দেখ সম্মুখে কি ব্যাপার হইতেছে। দেখ সেই অপরূপ রূপ, সেই মুখের সৌন্দর্য্য এবং মহিমা সহস্র কবি এবং সহস্র চিত্রকর বর্ণনা করুক, তথাপি অতুল থাকিবে। কাহার মহিমা আজ উৎসবের জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত? আজ কি দেখিতেছি? যিনি সকলের রাজা, সমুদয় ঐশ্বর্য্যের অধিপতি তিনি আজ পাপীদের সঙ্গে উৎসব করিতে আসিলেন। ঐশ্বর্য্য কথাটী ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং যাবতীয় ঐশ্বর্য্য তাঁহারই। ভূমণ্ডল তাঁহার পদতলে, স্বর্গ তাঁহার দক্ষিণ হস্তে। এত বড় রাজা, যাঁহার প্রতাপে গিরি পর্ব্বত কম্পিত, আমাদিগের দ্বারা এই মলিন পৃথিবীতে তিনি অপমানিত! পৃথিবীর রাজা কিম্বা অত্যন্ত উচ্চপদাভিষিক্ত সম্রাট যদি বিপদগ্রস্ত এবং ভিক্ষুক হইয়া অন্ন দাও, বস্ত্র দাও, এই বলিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা চায়, এবং কোথাও ভিক্ষা না পাইয়া ক্রন্দন করে, আমাদের মন পাষাণের মত কঠিন হইলেও দ্রব হইয়া যায়। যাঁহার ভাণ্ডার হইতে লক্ষ লক্ষ লোক অন্ন বস্ত্র পাইয়াছে, তাঁহার আজ এই দুর্দ্দশা, ইহা দেখিলে কাহার অন্তরে না দুঃখের উদয় হয়? কিন্তু সমস্ত রাজপথে দেখ, পর্ণকুটীরে দেখ, একজন দাঁড়াইয়া আছেন, যিনি সমুদয় ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া তোমার আমার ঘরে ভিক্ষা চাহিতেছেন। যদি চক্ষু থাকে তবে প্রতিদিন তোমরা দেখিয়াছ

একজন—যিনি স্বর্গের রাজা—অত্যন্ত জঘন্য দুঃখীর ঘরে গিয়াও তাহার আত্মা হৃদয় ভিক্ষা করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন স্বর্গে আমার অতুল ঐশ্বর্য্য আছে সত্য; কিন্তু আমার সন্তানগণের যতদিন পাপ দুঃখ থাকিবে ততদিন আমার এই ভিক্ষাব্রত থাকিবে। কোথায় আমরা ভিখারী হইব, না স্বর্গের অধিপতি স্বয়ং আমাদের দ্বারে ভিখারী হইলেন। তিনি ভিখারী হইয়া প্রত্যেক রাজপথে ভিক্ষা চাহিয়া সমস্ত লোকের হৃদয় প্রাণ কাড়িয়া লইতেছেন। তাঁহার দয়ার কি শেষ হয়? যতদিন না আমরা সম্পূর্ণরূপে তাঁহাকে আমাদের হৃদয় আত্মা দিব, ততদিন তিনি ভিক্ষা করিতে ক্ষান্ত হইবেন না। কঠিন প্রাণ হইয়া একদিন তাঁহাকে ভিক্ষা দিলাম না, কিন্তু তিনি কিছুতেই নিরাশ হইবার নহেন; দ্বিতীয় দিন আবার সেই সুন্দর মুখ লইয়া আসিলেন, সেই দিনও ঈশ্বরের প্রতি অনুগ্রহ হইল না, তাঁহাকে ভিক্ষা দিলাম না; আবার তৃতীয় দিন আসিলেন, সেই দিনেও তাঁহাকে দূর করিয়া দিলাম; কিন্তু তাঁহাকে দূর করিয়া দিলেও কি তিনি দূর হইতে পারেন? আবার চতুর্থ দিনে আসিয়া সেইরূপ মনোহর ভাবে ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। যতই তাঁহার প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিলাম, ততই দেখি তিনি তাঁহার অশেষ দয়াবলে কঠিন হৃদয় পরাস্ত করিতে লাগিলেন।

মানুষ কি ভিক্ষা করিতে জানে? দেবদেব মহাদেবই যথার্থ ভিখারী। দয়াল পিতার অভিধান ভিক্ষায় পরিপূর্ণ। তিনি এমন করিয়া ভিক্ষা করেন যে, মানুষ তাঁহাকে ভিক্ষা না দিয়া থাকিতে পারে না। প্রাণ হৃদয় যথার্থরূপে কেমন করিয়া কাড়িয়া লইতে হয় তিনিই কেবল জানেন। পৃথিবীর ভিখারীরা কি ভিক্ষা করিতে জানে? পথের ভিখারী

ভিক্ষা চাহিল, তাহাকে বলিলাম তণ্ডুল দিব না, বস্ত্র দিব না, তবু সে কাঁদিতে লাগিল, অবশেষে যদি ধনী হই দ্বারবান্ দ্বারা তাহাকে দূর করিয়া দিলাম, তাহার সকল সহিষ্ণুতা ধৈর্য্য ফুরাইয়া গেল, সে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেল। কিন্তু স্বর্গের রাজাকে আমরা কতবার এইরূপে বিদায় করিয়া দিয়াছি, কতবার নির্দ্দয় হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছি, তোমাকে কিছুই দিব না। আমার বিলাসপ্রিয় হৃদয় কদাচ তোমাকে দিতে পারি না। এখনও আমার অনেক সুখের বাকী আছে; কিন্তু আমাদের মুখে এ সকল নিষ্ঠুর কথা শুনিয়া তিনি কি করিলেন? তিনি যেমন অবিচলিত ভাবে আমাদের হৃদয় আত্মা ভিক্ষা করিতেছিলেন, তেমনই ভাবে পড়িয়া রহিলেন, নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন না, কথা শুনিয়াও যেন শুনেন না। ইহা দেখিয়া আমার মনের সমুদয় শক্তিকে ডাকিয়া বলিলাম এ লোককে দূর করিয়া দাও, না হইলে যে আমার কার্য্যের ক্ষতি হয়, এ যে আমাকে জ্বালাতন করিল, এ যে আমার সকল ধন কাড়িয়া লইতে চায়। মনের সমস্ত বলের সহিত উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম, যাও জগদীশ, চলিয়া যাও, অন্য ঘরে যাও। কিন্তু কিছুতেই তিনি চলিয়া গেলেন না।

ওরে পাষণ্ড মন! কৈ আর তোর কি বল আছে আন্ না। কাহার সঙ্গে তুই লাগিয়াছিস্? তেমন ভিখারী ত ইনি নন, ইনি যে স্বর্গের ভিখারী। তোর মন কাড়িয়া লইবেন, এই তাঁহার পণ। বাস্তবিক ঢের ভিখারী দেখিয়াছি; কিন্তু এমন ভিখারী দেখি নাই। পৃথিবীর ভিখারী খেতে পায় না, তাই তোর কাছে ভিক্ষা চায়; কিন্তু স্বর্গের ভিখারী কি খেতে পান না যে, তোর কাছে

ভিক্ষা করিতেছেন? ওরে পাষণ্ড মন! তোর এমন কি আছে যাহার আকর্ষণে স্বর্গের রাজা মুগ্ধ হইবেন? তোর এত পাপ, তোর এমন কি মোহিনী শক্তি আছে যে, স্বর্গের রাজা তোর দ্বারে ভিখারী হইয়া পড়িয়া থাকিবেন? তোর আপনার বন্ধুরা তোকে পরিত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু স্বর্গের রাজা দীনবন্ধু প্রাণনাথ কেন তোর কাছে আসিয়াছেন? তোর কি এই দুর্গন্ধময় শরীর মন লইতে? নতুবা তোর এমন কি সৌন্দর্য্য আছে যে তাহাতে স্বর্গের ঈশ্বর ভুলিয়া গিয়া তোর দ্বারে ভিখারী হইবেন? ঈশ্বর! তোমার কি মহত্ত্ব এবং গৌরব নাই? তুমি যদি এই পাষণ্ডদিগের নিকট ভিখারী হইয়া না আসিতে, তবে যে তোমার মান্য রক্ষা হইত। পৃথিবীতে তোমার এত অপমান আর দেখিতে হইত না। কিন্তু আমাদের দয়াময় পিতা কি বলেন? তিনি বলেন, আমার আবার গৌরব মর্য্যাদা কি? আমি যে সন্তানদিগের প্রাণ মন ভিক্ষা না করিয়া থাকিতে পারি না। ভিখারী হইয়া সন্তানদিগের প্রাণ গ্রহণ করিবার জন্যই আমি পৃথিবীতে আসিয়াছি। কোথায় আমরা তাঁহার দয়ার ভিখারী হইয়া বলিব, এই তোমার চরণতলে আমরা চিরদিনের জন্য ভিখারী হইয়া রহিলাম, না সমুদয় ঐশ্বর্য্যের অধিপতি আমাদের দ্বারে আসিয়া ভিখারী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কতবার আমরা রূঢ়-বচনে বলিলাম, তোমাকে ভিক্ষা দিব না, তুমি দূর হও; কিন্তু এই ভিখারী যাইবার ভিখারী নহেন।

ব্রাহ্ম! আমাদের পিতা তোমার কাছে হৃদয় চাহিয়াছিলেন, তাই তাঁহার এত অপমান এবং এই দুর্গতি হইল। স্বর্গের রাজা নীচ হইলেন পৃথিবী উচ্চ হইবে বলিয়া। তুমি তাঁহার সুন্দর কোমল বক্ষে অস্ত্রাঘাত

করিলে কেন? আবার গত বৎসর পরস্পরকে যত মারিলে, সেই শাণিত অস্ত্র সকলও ঐ দেখ প্রাণেশ্বরের বক্ষে বিদ্ধ হইয়াছে। ওরে নিষ্ঠুর ব্রাহ্ম! তুই কেন ভাই ভগ্নীকে মারিতে গিয়াছিলি? ঐ দেখ, তোর সমুদয় অস্ত্র গিয়া পড়িয়াছে আমাদের কোমল ঈশ্বরের হৃদয়ে। মানুষ! তুমি কাহাকেও মার না, যে আঘাত ঈশ্বরের বক্ষে না লাগে। তুমি একটী কটু কথা ভাইকে বল না, যে বাক্যবাণে পিতার প্রাণ বিদ্ধ না হয়। তিনি আপনার মুখে বলেন, যে আমার দুঃখী সন্তানকে নিদারুণ হৃদয়ভেদী কথা বলে সে আমার হৃদয়ে আঘাত করে। ওরে ব্রাহ্ম ভাই! গত বৎসর কি করিয়াছ? ভাই ভগ্নীকে এমন একটীও দুর্ব্বাক্য বল নাই যাহা পিতা শুনেন নাই। যত অস্ত্র পরস্পরের বক্ষে নিঃক্ষেপ করিয়াছ, ঐ দেখ আমাদের জগদীশ্বর সমুদয় কুড়াইয়া লইয়া আপনার বক্ষে নিয়াছেন। হায় পিতা! তোমার এত দুর্গতি হইল? তোমার যদি অপরাধ থাকে তাহা এই যে, তুমি মন্দকে ভাল করিতে গিয়াছিলে। কি পাষণ্ড আমরা, আমরা তোমার প্রতি এবং পরস্পরের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিয়া তোমার বক্ষে এত অস্ত্রাঘাত করিলাম। আমাদের কি গতি হইবে? নিরপরাধ ঈশ্বর, তাঁহার এই দুর্গতি হইল?

যদি ভাল থাকিতাম, পিতাকে যদি প্রাণ দিতাম, পরস্পরের বক্ষে যদি অস্ত্রাঘাত না করিতাম, আজ পিতার এমন অস্ত্রপূর্ণ বক্ষ দেখিতে হইত না। হায়! আমাদের হস্তে আমার পিতার এমন দুর্দ্দশা হইল! আমাদের কি উপায় আছে? পাষণ্ড হইয়া আমাদের দুর্গতির শেষ হইল। তবে কি আমরা বাঁচিব না? দয়াল প্রভুর মত যদি ভিখারী হইতে পারি তবেই আমরা বাঁচিব। ওরে আমার ব্রাহ্ম ভাই সকল!

তোমরা জগদ্বাসীদের নিকট ভিখারী হও। তোমাদিগকে ভালবাসি তাই বলি, যদি ভিখারী হও এই জীবনে তোমরা বাঁচিবে। গলবস্ত্রে, করযোড়ে গিয়া বল, ওরে দুঃখী জগদ্বাসী! তোমার কাছে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। যখন এইরূপে আমরা একটী জগদ্বাসীর প্রাণও ঈশ্বরের দিকে আকর্ষণ করিতে পারিব তখন আমাদের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। এই সঙ্কেত জানিলে। পিতা যদি ভিখারী হইলেন, সন্তান কেন ভিখারী না হইবে? যাঁহার কোন অভাব নাই, যিনি ধনী, তিনি যদি ভিখারী হইলেন, যাহারা নির্ধন তাহারা কি ভিখারী হইবে না? বন্ধুগণ, তোমাদের সেবা করিতে গিয়া রোগী হইয়াছি, অবসন্ন হইয়াছি, তোমরা মান আর না মান তোমাদের সেবায় প্রাণ দিয়াছি, দুঃখী সেবককে নির্যাতন করিতে হয় করিও, কিন্তু এই আশীর্ব্বাদ কর, যতদিন আমার প্রাণ থাকিবে সহস্র নির্যাতনেও যেন তোমাদের প্রতি আমার হৃদয়ের প্রেম অনুরাগ না যায়। যদি শত্রু হও তথাপি তুমি ভাই, তুমি আশীর্ব্বাদ কর। যে আমাকে নির্যাতন করে তাহাকেও যেন চিরকাল আমি ভালবাসিতে পারি। ভগ্নি! তোমার পদতলে পড়িয়া এই আশীর্ব্বাদ চাহিতেছি।

ঈশ্বর আমাদের দ্বারে ভিখারী হইলেন, আমরা পরস্পরের নিকট ভিখারী হইব না কেন? যখন তাঁর এত অপমান হইল, তখন আমরা কি অপমানকে ভয় করিয়া ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিব? এই বৎসর দুঃখে গেল ক্ষতি নাই, ও ব্রাহ্ম ভাই, ভগ্নি! আর ভবিষ্যতে নির্যাতন করিও না। অনেক বৎসর হইতে তোমাদের সেবা করিতে নিযুক্ত হইয়াছি, আর আমার মুখ দেখ্‌বে

না বলে প্রতিজ্ঞা কর না। এই অধীন সেবককে ছেড় না। আমার দেবার এখনও অনেক আছে। যখন পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইব তখন যাহা ইচ্ছা করিও; কিন্তু যতদিন তোমাদের কাছে আছি, ততদিন এই ভিখারীকে বিদায় করিয়া দিও না। ভালবাসা শিখিয়াছি, তোমাদিগকে ভালবাসা দিব বৈ কি। আমি যে ভাল উপাসনা করিতে পারি না যদি তোমাদিগকে ছেড়ে যাই। তোমা-দিগকে ছাড়িলে যে আমি দুঃখেতে পাপেতে মরিব। আমার প্রতি দয়া করে কাছে থেক। তোমরা আমার প্রিয়দর্শন ভাই ভগ্নী। যার এতগুলি প্রাণের ভাই ভগ্নী তার কি দুঃখ আছে? আমি এই দেখিতে চাই যে, আমার ভাই ভগ্নী একটীও কমিল না। আমার একটী ভাই কমিলে আমার হৃদয় ফাটিয়া যায়। কেহই চলিয়া যাইও না, আমাকে কটুবাক্য বলিতে হয় কাছে আসিয়া বল। কখনও যেন আমাকে বলিতে না হয়, ঐ যা! আমার সেই ভাই, সেই ভগ্নীটীকে কে নিল রে?

যে দিন একটী ভাইয়ের মুখ শুষ্ক দেখি, আমার কত যন্ত্রণা হয়, আমার সে দুঃখ কেহ বুঝিতে পারে না। আমি যদি তোমাদের না পাই, তবে আমি কাহাদের সেবা করিব? আমার ভাই ভগ্নী আমার প্রাণ। আমার ধন, মান, তোমরা; সত্য বল্‌ছি। আমার বন্ধুগণ, তোমরা আমাকে ছেড়ে যেও না। যতদিন পৃথিবীতে বাঁচিব আমার কাছে থেক। তোমাদেরই জন্য আমি পৃথিবীতে আছি। তোমাদের প্রফুল্ল মুখ দেখিলে আমার সুখ হয়। যখন যাওয়ার সময় আসিবে তখন চলে যাব। যতদিন পৃথিবীতে আছি তোমাদের কাছে থাকিব। তোমাদিগকে পিতার

প্রেমের কথা বলিব। আরও বলিব, এই প্রেম গ্রহণ কর, এই অমৃত পান কর। এই জীবনে পিতার সঙ্গে থেকে, দুটী পাঁচটী কথা শিখেছি; তাঁহারই কাছে আমি কাঁদিয়া বলি, আমার দুঃখী ভাইয়ের কি হইবে? ও পিতা! এস, তোমাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার ঘরে যাই। এইরূপে পিতাকে লইয়া ভাইয়ের ঘরে গিয়া সুখী হই। আমি দুঃখী নই, আমার সুখ হয়েছে। এত দুঃখ বিপদের মধ্যেও আমার প্রাণ হাসে। ঘোর বিপদের মধ্যেও আমি সুখী থাকি। তোমরাও ভাই সুখী থেক, তোমাদিগকে সুখী দেখে যেন আমি সুখী হই। তোমাদের মধ্যে প্রেমরাজ্য আসুক। প্রেমরাজ্য আসিবার সময় হইয়াছে। প্রাণের ভাই ভগ্নী সকল! তোমরা আজ আমাকে কাঁদাইলে; এই কান্নাতেই আমি সুখী হইলাম। এই শুভক্ষণে তোমাদের হাত ধরে এই কথা বলে যাই, প্রেমরাজ্য আস্‌ছে আর বাধা দিও না।

প্রাণেশ্বর! আজ এই প্রার্থনা যে, এই বেলা, এই শুভ মুহূর্ত্তে আমাদিগকে তুমি ভুলাইয়া লও। এখন যাহা বলাবে, আমরা সকলে তাই বলিব। এই বেলা আমাদের হৃদয় প্রাণ কেড়ে লও। এখন আমরা তোমারই, তুমি আমাদের সব কেড়ে লও; কিছু যেন আর আমাদের না থাকে। আজ যেমন তোমার, তেমনই চিরকাল আমি এবং আমরা সকলেই তোমারই হইয়া থাকিব। জননি! জননি! আজ যে আমাদের অধিক বয়স হইয়াছে এমন মনে হইতেছে না। বালকের মত তোমার কাছে বসিয়া আছি। আজ এক বৎসরের শোক চলিয়া গেল। এ কি স্বর্গের যাদু? তোমার নামে সকল শত্রু পলায়ন করিল। সুযোগ হইয়াছে প্রাণনাথ!

পরিষ্কৃত আকাশে সন্তানদিগকে আজ পাইয়াছ। আজ যদি সন্তান-দিগকে চির-প্রমত্ত করিয়া লইতে পার, তবে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। আজ আমাদের পুরাতন চক্ষু নূতন হইল। কোন্ দেশ হইতে কি মন লইয়া আসিয়াছিলাম, কাহাদের সঙ্গে বিবাদ করিতাম, আজ কি হইল! এই নিগূঢ় কৌশল কে জানে? কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিলাম, এই ভক্ত-ঘরে বসিয়া, ভক্তবৎসল তুমি, তোমাকে আমরা প্রেম ভক্তি দিচ্ছি। একদিন মনে ব্যথা হইত, পাছে কিছুদিন পরে আমাদের ভক্তি-প্রেম-ফুল শুষ্ক হইয়া যায়; কিন্তু এই সব ফুল কি শুকাইতে পারে? তোমার স্বর্গেতে ইহাদের জন্ম। ভক্ত-হৃদয়ে তুমি যে ফুল বিকশিত করিয়াছ, তাহাতে তুমি যে জলাশয় খনন করিয়াছ, এবং তুমি যে নদী প্রবাহিত করিয়া দিয়াছ, সে সকল কি শুষ্ক হইতে পারে? তুমি যে ভক্তি-জল পাঠাইতেছ, তাহা যে ফুরাইবে না। মা হয়ে শিখাইয়া দিচ্ছ, বৎস! বল্ না তোর এই ভক্তি-জল ফুরাইবে না। তুমি বিশ্বাস দিতেছ, আমি মরিব না। অজর, অমর তোমার এই বালক বালিকাগুলি। জীবননাথ! প্রাণগতি! তোমাকে ভালবাসিব, আজ যাঁহারা তোমার সন্তান তাঁহাদিগকেও ভালবাসিব। ভিতরে তোমার মুখের বচন শুনিব। হে প্রাণেশ্বর! প্রাণ দিতে তুমিই পার। সৌন্দর্য্য দেখাইতে তুমিই পার। মত্ত তুমিই করিতে পার। আমাদিগকে তোমার প্রেমে প্রমত্ত করিয়া পৃথিবীতে তোমার স্বর্গের শোভা দেখাও, তাহা হইলে আমাদের মৃত্যুর পর এই পৃথিবীতে যে সকল সাধু লোক আসিবেন তাঁহারা অন্বেষণ করিয়া দেখিয়া বলিবেন, ঐ কতকগুলি লোকের মন হইতে ভক্তির মধুর অগ্নির ধূঁয়া উঠিতেছে। আমরা পৃথিবীতে ইহা দিয়া

যাইব। এই কি তোমার সেই স্বর্গের ঘর? সেই শান্তি-নিকেতন? এই ঘর কেহই ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। ঐ সোণার শৃঙ্খল হাতে লও, আর আমাদের মুখে ক্রমাগত প্রেম-মদ ঢাল। আর যখন দেখিবে আমরা মদ পানে মত্ত হইয়াছি, তখন ঐ শৃঙ্খল দিয়া বাঁধিয়া ফেলিও। যদি অচেতন করিতে হয়, এই ভক্তিরসে আমাদিগকে অচেতন কর। হে সুচতুর হইতেও সুচতুর পরমেশ্বর! তুমি দুষ্ট সন্তানদিগকে বাঁধিয়াছ। আরও প্রেমের কল, ভক্তির কল চালাইতে থাক। এস পিতা! এতদিন পর আজ তোমাকে ধন্যবাদপূর্ণ প্রণাম করি, ভক্তি-ফুল-মালা লইয়া তোমার চরণে দিই। অবাক্ ভক্তদিগের অবাক্ ঈশ্বর! সৌন্দর্য্যপূর্ণ প্রেমময়ী জননি! প্রাণ ভগ্ন হয় যখন ভাবি কেমন করে তোমাকে ভুলিয়া যাই। হে প্রাণেশ্বর! অত্যন্ত আহ্লাদিত অন্তঃকরণে, তোমার ভক্ত সন্তানগণ, তোমার ভক্ত প্রজাগণ, তোমার দাস দাসীগণ, দেখ সকলে মিলে তোমার চরণে ভক্তির সহিত প্রণাম করিতেছি।

প্রমত্ত অবস্থা।

সায়ংকাল, রবিবার, ১২ই মাঘ, ১৭৯৬ শক;
২৪শে জানুয়ারি, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

মনুষ্য ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মজীবনের আরম্ভে কত সুখ, কত উন্নতি তাহা বুঝিতে পারেন। পশুত্ব বিনাশ করিয়া ধর্ম্মের সুখাস্বাদ করা কত সৌভাগ্য তাহা অনুভব করেন। কিন্তু যতদিন না তাঁহার হৃদয় প্রেমে মত্ত হয়, ততদিন তিনি ধর্ম্মের নিগূঢ়

বিশুদ্ধতম কূপে প্রবেশ করিতে পারেন না। যতদিন সাধক ঈশ্বরের প্রেমে প্রমত্ত না হন, ততদিন তিনি ধার্ম্মিক হইতে পারেন ; কিন্তু তাঁহার উপর বিশ্বাস করিতে পারি না। কত ব্রাহ্মজীবনের প্রথম বিভাগে উল্লাসের ব্যাপার দেখিতে পাই, কিন্তু মনুষ্য পশুত্ব ত্যাগ করিয়া কি আবার পশু হইতে পারে না? ধর্ম্মের উচ্চাবস্থা প্রাপ্ত হইলেও তাহা হইতে পতন সম্ভব। এইজন্য প্রকৃত সাধক সেই স্থানে উপস্থিত হন যেখানে পতন অসম্ভব। মনুষ্য ঈশ্বরপ্রীতিতে ক্রমাগত উন্নত হইয়া যতদিন না মত্ত হইয়া যায়, ততদিন পতনের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যেখানে প্রমত্ততা মনুষ্যকে উন্মাদ প্রায় করিয়া তুলিল, সেখানে আর তাহার নিজের কর্ত্তৃত্ব রহিল না, সে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অধীন হইল। তখন কেবল যে তাহার পশুজীবন গিয়াছে তাহা নহে, কিন্তু তাহার অন্তর দয়াল-নামরসে মত্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ হৃদয়ের ভিতরে ব্রহ্মনামের প্রমত্ততা না জন্মিলে ভক্তশ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হইতে পারি না। নামের ভিতর যে গভীর মধুর রস আছে তাহা পান করিয়া উন্মত্ত না হইলে কেহই সম্পূর্ণরূপে পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। প্রমত্ত ভক্ত যিনি তিনি আপনার ইচ্ছাকে ঈশ্বরের হস্তে বিক্রয় করিয়াছেন। তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছার প্রতাপ, আপনার কর্ত্তৃত্বের গৌরব, এবং তাঁহার সকল প্রকার কুপ্রবৃত্তি বিনষ্ট হইয়াছে।

নিকৃষ্ট ব্যক্তিরা যেমন মাদক দ্রব্যের বশীভূত হইয়া আপনার উপরে আপনার কর্ত্তৃত্ব রাখিতে পারে না, সেইরূপ যে সকল সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভক্ত স্বর্গের মাদক দ্রব্য সেবন করেন, তাঁহারা এমনই ঈশ্বর-প্রেম-রসোন্মত্ত এবং মুগ্ধ হইয়াছেন যে, ইচ্ছা করিলেও

তাঁহারা পাপ করিতে পারেন না। ব্রহ্মভক্তের পতন নাই, যতই তিনি ব্রহ্মরস পান করেন ততই তাঁহার পানেচ্ছা বৃদ্ধি হয়; অগ্নিতে ক্রমাগত ঘৃত ঢালিলে যেমন উহার শিখা আরও প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ ভক্ত যতই নামরস পান করেন ততই তাঁহার স্পৃহা বলবতী হয়। পৃথিবীর জঘন্য চরিত্র পানাসক্ত ভ্রাতাদিগের জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত আছে। ভক্তের আত্মা ঈশ্বরের প্রেমসুরা পান ব্যতীত কখনই স্থির থাকিতে পারে না। আত্মার গভীরতম স্পৃহা চরিতার্থ হইবে ব্রহ্মসুরা পানে। সুরার হাতে যে জীবন সমর্পণ করে সে ক্রমাগত গভীর হইতে গভীরতর পাপ-নরক-সাগরে ডুবিল। কিন্তু ভক্ত যে সুরা পান করিতে লাগিলেন, তাহাতে ক্রমাগত তাঁহার ঊর্দ্ধগতি হইতে লাগিল। তাহাতে ভক্তের প্রকৃতি দিন দিন উচ্চতর হইতে লাগিল। যে ব্যক্তি পাপের ইচ্ছা করে সে পাপকে ছাড়িতে চাহিলেও পাপ তাহাকে ছাড়ে না। তেমনই ভক্তিরস আজ যাহা পান করিয়াছি তাহা ত কাল ভুলিতে পারিব না; যতই সেই রস পান করিব ততই আরও রস-সাগরে ডুবিব। ভক্তের প্রেম, ভক্তের ভক্তি, ভক্তের আনন্দ ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইবে। আরও একটী উপমা দেখ সুরাপায়ীরা যে সময়ে সুরা পান করে, সেই সময় উপস্থিত হইলেই তাহাদের লালসা উত্তেজিত হয়। এই সময়ে সেই স্পৃহা চরিতার্থ করিবে, কে যেন অভ্রান্ত বাক্যে ইহা বলিয়া দিল। দেখ ইহা প্রাকৃতিক নিয়মে হয়। সেইরূপ ভক্তের প্রাণও উপাসনার সময় উপস্থিত হইলেই অধীর হইয়া পড়ে।

যাঁহারা প্রতিদিন প্রাতঃকালে ঈশ্বরের ভক্তিরস পান করেন, প্রাতঃকাল আসিবা মাত্র সেই রস পান করিবার জন্য তাঁহাদের প্রাণ

ব্যাকুলিত হয়। সেই সময়ে ব্রহ্মরস পান না করিলে তাঁহাদের সুখ নাই, তৃপ্তি নাই। ব্রাহ্ম যদি ভক্ত হন তাঁহাকে এই কথা স্বীকার করিতেই হইবে। সহস্র কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেও ভক্ত তাঁহার প্রাণেশ্বরের উপাসনার সময় ভুলিতে পারেন না। সেই নিয়মিত সময়ে উপাসনা না করিলে ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন না করিলে তাঁহার প্রাণে আরাম নাই। সেই উপাসনা-স্পৃহাই তাঁহার দীক্ষাগুরু, নেতা, এবং ধর্ম্মপথের প্রদর্শক। সেই স্পৃহা সেই মত্ততাই তাঁহার নেতা, সুতরাং তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। যদিও প্রথমাবস্থায় তিনি ক্ষুদ্র পরিমাণে সেই রস পান করেন; কিন্তু অনন্তকাল, এবং অনন্ত উন্নতি তাঁহার সম্মুখে। বস্তুতঃ বলবতী স্পৃহা যতদিন মনুষ্যের সহায় না হয় ততদিন তাহার নিরাপদ হইবার সম্ভাবনা নাই। এই স্পৃহাই ঠিক সময়ে উপাসনা করায়, ঠিক সময়ে ভক্তি, প্রেম, আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন করে। বল দেখি তোমরা এতদূর চলিয়া গিয়াছ কি না যে, তোমাদিগকে আর ইচ্ছা করিয়া, কর্ত্তৃত্ব করিয়া উপাসনা করিতে হয় না? ইহা যদি না হইয়া থাকে এই নববর্ষে প্রমত্ততার সাধন আরম্ভ কর। স্পৃহাতে পরিত্রাণ, স্পৃহাতে আনন্দ, ভক্তেরা স্পৃহা দ্বারা উপাসনাতে নিয়োজিত হন। ইহাতেই ভক্তেরা প্রমত্ত হইয়া পড়িয়া আছেন। যখন এই স্পৃহা বলবতী হইবে তখন আপনার ইচ্ছা ছাড়িয়া দিলেও বাঁচিব। যাহার এই স্বর্গীয় স্পৃহা জন্মিয়াছে, সে কি বলিতে পারে আমি একদিন ঈশ্বর-প্রেম-রস পানে নিবৃত্ত থাকিতে পারি?

সমস্ত দিন পথ ভ্রমণ করিয়া পথিক প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় দাগ দিয়া লয়, অদ্য এত ক্রোশ চলা হইল, আবার পরদিন

প্রাতঃকালে সেই স্থান হইতে নূতন পথে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। সেইরূপ ক্রমশঃ আমরা উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছি। উপাসনা এক সময় আমদের যথাসর্ব্বস্ব ছিল। পরে পরিবার-সাধন আমাদের যথাসর্ব্বস্ব হইল। কিন্তু সর্ব্বোচ্চ সাধন তাহা, যাহা দ্বারা কি বিরলে, কি পরিবার মধ্যে যেখানে থাকি সেখানেই ঈশ্বরকে দেখিয়া সুখী হইতে পারি। যে অবস্থায় প্রমত্ত হইয়া ভিতরে ঈশ্বরকে দেখিব, সেই অবস্থায় প্রমত্ত হইয়া বাহিরেও ভাই ভগ্নীদের মধ্যে তাঁহাকেই দেখিব। যখন আমাদিগকে এরূপ প্রমত্ত দেখিবে, তখন পৃথিবী বলিবে এ সমুদয় লোককে আর তর্ক কিম্বা কোন প্রলোভন দ্বারা কেহই ফিরাইতে পারিবে না। ইহারা আপনাদের আপনারা নহে, ইহারা পরের আপনার। এই প্রকারে পৃথিবীও প্রমত্ত সাধকদিগকে চিনিয়া লইবে। পৃথিবী বলিবে শত্রুদিগের সাধ্য নাই ইহাদিগকে পরাস্ত করে। মার, কাট, ইহাদের চাঞ্চল্য নাই। ইহারা ঈশ্বরের প্রেমে এমনই উন্মত্ত যে আপনাদের স্বর্গ আপনারা করিয়া তাহার ভিতরে বসিয়া আছে। বৃথা আক্রমণ আর ভক্তকে ক্লেশ দিতে পারে না। তোমাদের মন যদি স্তুতি নিন্দাতে বিচলিত হয় তোমরা প্রেম-মদ পান কর নাই। যে ব্রহ্মপ্রেমে পাগল, তাহাকে কি পৃথিবীর বস্তু আকর্ষণ করিতে পারে? তাহার প্রাণ আস্বাদ করে ব্রহ্মকে। তাহার চক্ষু বাহিরে, কিন্তু তাহা বাহিরের বস্তু দেখিতেছে না, সেই চক্ষু ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য দেখিতেছে। তাহার কর্ণ বাহিরে, কিন্তু তাহা বাহিরের কোন শব্দ শুনিতেছে না। তবে শুনিতেছে কি? ঈশ্বরের কথা। তাহার হস্ত বাহিরে, কিন্তু তাহা বাহিরের কোন কার্য্য করিতেছে না। তবে কি

করিতেছে? ঈশ্বরের পদসেবা। পৃথিবী সম্পর্কে সে স্পন্দহীন, মৃতবৎ।

শত্রু! মিত্র! এ ব্যক্তির উপর তোমাদের কোন ক্ষমতা নাই, পরাস্ত হইয়াছ বলিয়া চলিয়া যাও। বাতুলের সঙ্গে যুক্তি করা বিফল, তবে কেন আর বিশ্বাসী ভক্তকে নির্যাতন কর? যে দিন প্রমত্ততার অবস্থা হইবে সে দিন এ সকল ব্যাপার দেখিবে; কিন্তু দুঃখের কথা, এখনও ব্রাহ্মসমাজে সেই অবস্থা হয় নাই। যে দিন হইবে সেই দিন তোমাদের আচরণে, তোমাদের ব্যবহারে তাহা বুঝিতে পারিবে। এই নববর্ষে প্রমত্ততা সাধন কর। উপাসনা করিয়া সুখী হইলে, আরও উপাসনা কর; গানে মত্ত হইলে, আরও গান কর; ঈশ্বর-চিন্তায় মন সজীব হইল, আরও চিন্তা কর। বাহিরের উৎসব শেষ হইবে; কিন্তু অন্তরের উৎসবের আলোক কে শেষ করে? বাহিরের বন্ধু আর সঙ্গীত করিবেন না; কিন্তু তাহা বলিয়া কি ভিতরের পক্ষিগণ আর গান করিবে না? অন্তরে যে উৎসব আরম্ভ হইয়াছে অনন্তকালে তাহা ফুরাইবে না। সত্য বটে, ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া গিয়া অনেক সময় আমরা ব্রহ্ম-রস পানে প্রমত্ত হইয়াছি; কিন্তু আরও কি উত্তরোত্তর অধিকতর পান করিবার জন্য লালায়িত হইব না? বাহিরে বন্ধুগণ বিদায় লন; কিন্তু ভিতরে হৃদয়রাজ্যের উৎসব ছাড়িয়া কি তাঁহারা দূরে যাইতে পারেন? বিচ্ছেদ হয় হউক, বিচ্ছেদের পর মিলন মিষ্টতর হইবে। যে ব্রহ্মরস পান করিয়াছ, তাহা কি আর ভুলিতে পার? ছাড় তবে সংসারের মদ পান। নানা প্রকার মান, মর্য্যাদা, কাম, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা ইত্যাদি মদ গরল বলিয়া ছাড়। এ সমুদয় মদ পশুরা পান করে। ব্রহ্মসন্তান!

সেই মদ তোমার জন্য যাহা হইতে আর উচ্চতর মধুরতর কিছুই নাই। এই ব্রহ্মমন্দিরের উৎসবে সেই অমৃত উঠিয়াছে যাহা আমরা অনন্তকাল পান করিব। ইহা পান করিয়া আমরা মাতিব এবং জগৎকে মাতাইব। দয়াল পিতা আশীর্ব্বাদ করুন যেন এই ভক্তির প্রমত্ত অবস্থা আমাদের শরীর মনের ভূষণ হয়।

জগজ্জননীকে দেখা।

সোমবার, ১৩ই মাঘ, ১৭৯৬ শক ; ২৫শে জানুয়ারি, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

প্রার্থনা।

হে নর নারীদিগের পরম দেবতা! এই উৎসব সময়ে তোমার নিকট জগদ্বাসিনী সমস্ত ভগ্নীদের যাহাতে কল্যাণ, পরিত্রাণ হয় এই জন্য যাচ্ঞা করিতেছি। তুমি যেমন পুরুষদিগকে অল্পে অল্পে উন্নত করিতেছ সেইরূপ কোমল প্রকৃতি নারীগণও যাহাতে তোমার নিকটে বসিয়া জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত হন এই বিধান কর। যে সকল ভগ্নীরা এখনও তোমাকে পিতা বলিয়া ডাকিতে শিখিলেন না, এখনও যাঁহারা পাপ কুসংস্কারে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন, তুমি বিনা কে তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিবে? না পান তাঁহারা সাহায্য স্বামীর নিকট, না পান তাঁহারা সাহায্য পিতা মাতার নিকট। পিতা! তোমার সে সকল দুঃখিনী কন্যাদের কি করিবে? তোমার সত্যের আলোক কি পৃথিবীর অর্দ্ধ ভাগেই বদ্ধ থাকিবে? তুমি ত পক্ষপাতী নহ। পুত্রকে চরণতলে স্থান দিবে, আর কন্যাকে বিদায় করিয়া দিবে, পিতা! এমন নিষ্ঠুর ত তুমি নহ। কন্যাদিগের দুঃখ দূর

করিবে তাই ত এই আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছ। আশীর্ব্বাদ কর, যাঁহারা এই আশ্রমে বাস করেন তাঁহারা যেন পৃথিবীর জঘন্য অপবিত্র ভাব পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গের দেবভাব এবং দেবীভাব পাইয়া পৃথিবীতে পারিবারিক পবিত্র শান্তির উদাহরণ প্রদর্শন করেন। জগতের ভাই ভগ্নী সকলে মিলিয়া নাথ! কবে একত্র তোমার নিকট উপস্থিত হইব? নাথ! জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আমাদের যত জাতির ভগ্নী আছেন সকলের উপর তোমার আশীর্ব্বাদবারি বর্ষিত হউক। সকল নারী তোমাকে দেখিয়া মুগ্ধ হউন। যেমন আজ এই ভগ্নীরা তোমার চরণতলে বসিয়াছেন, এইরূপ তোমার সমুদয় কন্যারা তোমার কাছে বসিতে শিক্ষা করুন। তোমার প্রেমরাজ্য সমস্ত নারী জাতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত কর। ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।

উপদেশ।

জগদীশ্বরের বিশেষ দয়া না হইলে অদ্যকার এই ব্রাহ্মিকাসমাজ হইত না। দয়াল প্রভুর বিশেষ করুণা বর্ষিত না হইলে, আজ ভগ্নীদের সঙ্গে উৎসবে মিলিত হইতে পারিতাম না। ভ্রাতাদিগের ধর্ম্মোৎসাহ দেখিয়া কতবার সুখী হইয়াছি; কিন্তু কুসংস্কার, পাপরজ্জু হইতে মুক্ত করিয়া, কতগুলি ভগ্নীকে যে দয়াল পিতা এই উৎসব করিতে ডাকিলেন, ইহা বিশেষ দেবপ্রসাদ। ইহা কখনও হয় নাই, ইহা নূতন। যাহারা পরিত্যক্ত, গৃহে অবরুদ্ধ, যাহাদের জন্য অতি অল্প লোকের চক্ষু হইতে দয়াজল পড়িয়াছে, সে সকল অসহায়া নারীদিগকে এখানে কে আনিলেন? দয়াময় বাঁচিয়া আছেন। ভগ্নীগণ, বঙ্গদেশ এবং ভারতবর্ষের দেশাচার নিষ্ঠুর হইল বলিয়া

আমাদের জগদীশ্বর যে তোমাদিগের প্রতি নিষ্ঠুর হইবেন ইহা হইতে পারে না। তিনি দেখিলেন তাঁহার অল্পবয়স্কা কন্যাদিগের না হইল ধর্ম্মে উন্নতি, না হইল ভক্তির উদয়। একটু একটু বিজ্ঞানের আলোক দেখিয়া তাঁহাদের চক্ষু প্রস্ফুটিত হইল বটে; কিন্তু সেই আলোক আরও ভয়ানকরূপে তাঁহাদের পতনের অবস্থা দেখাইয়া দিতে লাগিল। বিদ্যা শিখিয়া লোকে সুখী হয়; কিন্তু বঙ্গদেশের নারীরা বিদ্যার আলোক পাইয়া আরও দুঃখিনী হইলেন। উচ্চ আদর্শ পাইয়াও তাহা তাঁহারা ধরিতে পারিতেছেন না, এই তাঁহাদের দুঃখ, এবং এইরূপে তাঁহাদের হীনাবস্থা দেখিয়া তাঁহারা আরও নিরাশ এবং নিরুৎসাহ হইয়াছেন। যদি আশা পূর্ণ না হইবে, কেন মনে উচ্চ আশা হইল? তাঁহারা বলিতেছেন, হইত ভাল, যদি কুসংস্কারের পদতলে পড়িয়া থাকিতাম, কেন না, তাহা হইলে আর এ সকল উচ্চ আশা মনে প্রকাশিত হইত না এবং দুর্দ্দশার মধ্যে থাকিয়া উৎকৃষ্ট অবস্থার পরিচয় পাইতাম না। হায়! এ কি আমাদের দুর্দ্দশা হইল।

জানিলাম ঈশ্বর অনেক নহেন, তিনি এক। কেন শুনিতে পাইলাম ব্রাহ্মসমাজ আসিয়াছে জগতের নারীদিগকে বাঁচাইবার জন্য? কেন চক্ষে দেখিলাম ভক্তদিগের আনন্দ? কেন স্বর্গে যাইতে আশা হইল? বল নাই, অবলা নারী, কেমন করিয়া অগ্রসর হইব? রোগ বুঝিলাম, ঔষধ দেয় কে? অন্ধকার দেখিলাম, অন্ধকার কাটিয়া যাইবে কিরূপে? যখন পাপ কুসংস্কার, অন্ধকারের মধ্যে ছিলাম তখন ত কেহই অনুতাপের আগুন হৃদয়ে জ্বালিয়া দেয় নাই। তবে বুঝি বিদ্যা শিখিলে আর সুখ

হয় না। বুঝি ঈশ্বরের কথা শুনিয়া তাঁহার দেখা না পাইলে আর দুঃখ যায় না, এই বলিয়া বঙ্গদেশের নারীরা কাঁদিতেছিলেন। স্বর্গের দেবতা কন্যাদিগের এ সকল দুঃখের কথা শুনিলেন। তিনি দেখিলেন, বিদ্যাতে ইহাদের সুখ হইল না। ইহাদের স্বামীরা, ভ্রাতারা ব্রহ্মমন্দিরে যাইয়া ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন করিয়া, তাঁহার চরণ ধরিয়া সুখী হইতেছে; ইহারা জানিল ঈশ্বর নিকটে আসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। স্বর্গের কোন্ পথ দিয়া যাইয়া ঈশ্বরকে দেখিতে হয় ইহারা জানিল না। এইজন্য ভগ্নিগণ, দয়াময় ঈশ্বর তোমাদের হাত ধরিয়া তোমাদিগকে এই উৎসবে আনিলেন। যাহাদের জন্য কেহই চিন্তা করিল না, তাহাদিগকে অসহায় দেখিয়া ঈশ্বর এখানে আনিয়াছেন। অতএব তাঁহাকে তোমরা সর্ব্বপ্রথমে ভক্তির সহিত পিতা ও রক্ষক বলিয়া ডাকিবে। তাঁহাকে ডাকিলেই তোমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে।

তোমরা যে ঈশ্বরকে ডাকিতে পার ইহা সাধারণ দয়া নহে, নারীদিগের প্রতি তাঁহার এই বিশেষ দয়া। তাঁহার বিশেষ প্রসাদে তোমরা তাঁহাকে ডাকিতে শিখিয়াছ। কিন্তু এই কথা কি তোমরা স্মরণ করিবে না যে ঈশ্বরকে জানিয়া না দেখিলে দুঃখ দূর হয় না? নিশ্চয়ই তোমরা পাপে মরিবে, দুঃখে জ্বলিবে, যদি তোমরা তাঁহাকে দেখিতে না পাও। তোমরা কার কন্যা? মাকে যদি না দেখিলে তবে যে তোমরা মাতৃহীন। যার মা নাই সে বরং এক প্রকার আপনাকে আপনি সান্ত্বনা করিতে পারে; যে জানে মা সমস্ত দিন দ্বারে বসিয়া আছেন, অথচ তাঁহাকে দেখিতে পায় না, তাহার কত যন্ত্রণা সেই অন্ধকে জিজ্ঞাসা

কর। আমি যদি বলিতাম, তোমাদের মা ছিলেন, আজ নাই, কিম্বা তিনি দূরে গিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে দেখা হইবে না, তাহা হইলে তোমাদের কষ্ট হইত না। কিন্তু যখন দেখিতেছি, ঐ তোমাদের মা, তাঁহার আশীর্ব্বাদহস্ত তোমাদের মস্তকে রাখিয়াছেন, তখন তাঁহাকে না দেখিয়া কিরূপে তোমরা সুস্থির থাকিবে? কতদিন আর তোমরা এই কথা বলিবে, ইহাঁকে না দেখিলে যে কিছুতেই প্রাণ বাঁচে না। তাঁহার দর্শন বিনা আমাদের লেখা পড়া শিক্ষা আমাদের বিষ হইয়া উঠিয়াছে। ভগ্নি! ব্রহ্মকন্যা! যদি তোমাকে বিশ্বাস করাইয়া দিতে পারি যে, তোমার প্রতি যথার্থই তোমার মার দয়া আছে, তুমি ইচ্ছা করিলেই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে, তাহা হইলে আমার জীবন কৃতার্থ হয়। একবার তোমার মস্তক উঠাইয়া লও, দেখ এতদিনের কুসংস্কার অন্ধকারের পর কে তোমাকে দেখা দিবার জন্য আসিয়াছেন। স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া দিতেছেন, কন্যা! পৃথিবী এতকাল তোমার উচ্চ সুখের পথ বন্ধ করিয়াছিল, বলিয়াছিল, তুমি আর ঈশ্বরকে দেখিতে পাইবে না, আমি সেই কথার প্রতিবাদ করিতে আসিয়াছি। আর পৃথিবী তোমাকে পদাঘাত করিতে পারিবে না। এই সমাচার ভক্তের পক্ষে অতি সুখের সমাচার। কিন্তু যে ভগ্নী পিতাকে দেখিতে পান না তাঁহার পক্ষে ইহা হৃদয়ভেদী।

ভগ্নিগণ, একবার ঐ মুখ দেখিয়া যদি তোমাদের মৃত্যু হয়, ভয় নাই, দুঃখ নাই। আমাদের জননী কেমন, তাঁহাকে চিনিয়া তাঁর অঞ্চল ধরিয়া অনন্তকাল তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিয়া সুখী হইতে পারিবে। কতকাল আর তোমরা এই বলিয়া ক্রন্দন করিবে,

মা নিকটে, কিন্তু এই দগ্ধ চক্ষু যে খোলে না; যদি অকালে মৃত্যু হয় তবে ত আর পৃথিবীতে মার সঙ্গে দেখা হইল না। কিন্তু যদি মার সঙ্গে দেখা না হয়, তবে এই উপদেশ শুনিলাম কিসের জন্য? আর সকলই হইল, ধন চাহিয়াছিলাম, ধন পাইলাম, সন্তান কামনা করিয়াছিলাম, সন্তান হইল; কিন্তু এই দগ্ধ চক্ষু যে খোলে না, মাকে না দেখিলে যে দুঃখ যায় না। পৃথিবীতেও আমার কোন অভাব রহিল না; কিন্তু সংসারের সুখ যে আমাকে সুখী করিতে পারিল না। হায়! আমার দুঃখ দেখে একদিন জগতের লোক কাঁদিয়া বলিবে, ঐ বঙ্গীয় কন্যা মাকে না দেখিয়া পরলোকে চলিয়া যায়। এত উপদেশ এবং এত সাধুসঙ্গ পাইয়াও মার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল না। এইজন্য কি বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম? অন্য লোকে দুঃখ করে তাহার কারণ আছে, তাহারা ত দয়াল নাম শুনে নাই। আমাদের কাছে এত সমাচার আসিল, "তোর মা তোকে এখনই ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন" আমরা স্বকর্ণে এই কথা শুনিলাম; তথাপি কি আমাদের এই দগ্ধ চক্ষু খুলিবে না? যদি ঈশ্বর আমাদিগকে এই কথা না শুনাইতেন, তবে দুঃখ হইত না। কে যে আমাদিগকে বিশ্বাস করাইয়া দিয়া গেল যে আমরা মার ক্রোড়ে বসিয়া আছি? কে বলিয়া দিল, তাঁহার সুন্দর হস্ত দেখিলে না, যে হস্ত তৃষ্ণার সময় জল তুলিয়া দেয়, এবং শোক দুঃখে অশ্রু মোচন করে? হায়! সেই জননীর হাত ত একদিনও দেখিতে পাইলাম না। হায়! পোড়া এই চক্ষু ত তাঁহাকে দেখিতে পাইল না লোকে বলে তিনি পাপীর ঘরে নামেন, তাই আমাকে অবলা দেখিয়া আমার শয্যাতে মা হইয়া বসিয়া থাকেন।

ওরে নির্ব্বোধ মন! তুই কি জানিস্ না মাকে না দেখার মত যন্ত্রণা আর নাই? মা কাছে আছেন, অথচ তাঁহাকে দেখিতে পাই না; এই অন্ধকার কেহ সহ্য করিতে পারে না। আর এই যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না। থাক্ আমার সংসারের ধন, মান এবং বিদ্যা, আমি মাকে দেখিতে যাই। লোকে আমাকে ব্রাহ্মিকা বলিয়া প্রশংসা করে; কিন্তু আমি কি দেখিয়াছি? কি পাইয়াছি? মাকে না দেখিলে যে আর সুখ নাই। ভগ্নিগণ, বিশেষ সময় আসিয়াছে, আর বিলম্ব করিও না, তোমরা মাকে দেখিতে বাহির হও। তিনি বলিতেছেন, এই আমি তোমাদের কাছে বসিয়া আছি, আমার অঞ্চল ধর। তোমাদের ভাই হইয়া, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি আমাদের পিতার মুখ অত্যন্ত সুন্দর। একবার যে সেই মুখ দেখে সে চিরকালের জন্য মোহিত হয়। সেই মুখ দেখিলেই প্রাণের মধ্যে আপনা আপনি মত্ততা হয়। এমন মুখ কেহ কখনও দেখে নাই। মানুষের রূপ গুণ দেখিয়াছ; কিন্তু মার মুখ দেখ নাই। আমাদের মার কত গুণ, কত সৌন্দর্য্য, আজ উৎসবের দিন তাহা দেখিয়া প্রাণের ভিতর কেমন ভালবাসা উথলিয়া উঠিতেছে। এমন মাকে তোমরা ভালরূপে চিনিলে না, তোমাদের এই দুঃখ দেখিয়া দুঃখ হয়। তাঁহাকে দেখিয়া কেন তোমরা তাঁহার বশীভূত হইলে না? তোমাদেরও সুখ হইবে, আমরাও তোমাদের সুখে সুখী হইব। এই আশার কথা শুনিয়া একবার তোমরা মাকে অন্বেষণ কর। যে একবার মাকে দেখিয়াছে সে পাগলের মত হইয়াছে। আমরা কার মুখ দেখিয়া সকল যন্ত্রণা সহ্য করিতেছি? আমরা কি মূর্খ? আমরা কি প্রবঞ্চিত হইতেছি? আমরা যে পৃথিবীতে এত নির্যাতন সহ্য করিতেছি কাহার বলে?

এক একদিন যখন আমাদের বুক দুঃখে বিদ্ধ হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন কার মুখ দেখিতে যাই? যিনি দুঃখীদের ক্রন্দন চিরকাল শুনেন, তাঁহারই চরণ আমাদের একমাত্র আরাম স্থল।

যদি দুঃখ দূর করিতে চাও ইহাঁকে হৃদয়ে রাখ। আমাদের সকলের মা ইনি, বাপ ইনি। ইহাঁকে যত্ন করে রেখ, ভালবাসার আসনে ইহাঁকে রেখ। শুষ্ক কঠোর, পর বলিয়া ইহাঁকে তাড়াইয়া দিও না। বড় আশা ছিল এই আশ্রম সম্পূর্ণরূপে দয়াল পিতার আশ্রম হইবে; কিন্তু তোমরা তাঁহাকে গ্রহণ করিলে না। তোমরা বারম্বার আমাকে আসিতে অনুরোধ কর, আমি আসি না কেন? এখানে আমার মাতা পিতার বড় অপমান হয়, এইজন্য আমি আসিতে পারি না। যে বাড়ীতে আমার পিতা মাতার অপমান, সেখানে আসিয়া আমি কিরূপে আহ্লাদ করিব? পূর্ব্বে তোমাদের আশ্রমে আসিয়া আমি কত বলিয়াছি, তোমাদের সঙ্গে প্রতিদিন পিতার পূজা করিয়া কত আনন্দিত হইয়াছি, তাহা কি তোমাদের মনে নাই? এত যত্ন করে যে বাড়ী নির্ম্মাণ করিলাম সেই বাড়ীতে আমার পিতা মাতার অপমান ইহা কি আমার প্রাণে সহ্য হয়? আজ তোমাদিগকে বলিলাম, কি জন্য আমার বিরাগ হইয়াছে। আবার যদি তোমরা মার অপমান কর, আমার বুকে আরও তীক্ষ্ণতর, আরও বিষম শেল বিঁধিবে। তোমাদের এই ঘর শ্মশান নহে ইহা অতি যত্নের, সুন্দর এবং উচ্চ ঘর। এক একটী পুত্র কন্যাকে দেখা দিবেন বলিয়া পিতা সমস্ত দিন এখানে বসিয়া থাকেন। ভগ্নিগণ, নিরাশ হইও না, তোমাদের ভাইয়েরা যেমন পিতাকে দেখে সুখী হচ্ছেন, তোমরাও তাঁহাকে দেখে সুখী হও। অনেক দিন পাপের

অবিশ্বাসের বিষ পান করিয়া দুঃখ পাইলে, এখন প্রেমময় ঈশ্বর তোমাদের মুখে প্রেমমধু আনিয়া ঢালিয়া দিচ্ছেন। এই মধু পান করিয়া এবার অমর এবং অজর হও। এমন পিতাও দেখি নাই, এমন বন্ধুও দেখি নাই। ভগ্নি! তবে তোমার আশা আছে। বাঁচিবার জন্যই এমন পিতার আশ্রয় পাইয়াছ, মরিবার জন্য নহে। অমর হয়ে, অজয় হয়ে, দয়াল পিতার দিব্যধামে গিয়া জননীর হাত ধরে এ জীবন থাকিতে থাকিতে স্বর্গের সুখ সম্ভোগ কর।

প্রেমময়ী জননি! স্নেহের পিতা মাতা! কি দুঃখ তাঁহাদের যাঁহারা তোমাকে দেখিতে পান না। তোমার হাত দিয়া আমাদের চক্ষু খুলিয়া দাও। যে একবার তোমার দর্শন পায় তাহার ত দুঃখ থাকে না। পিতা! এই তোমার সমক্ষে কয়েকটী ভগ্নী বসিয়া আছেন ইহাঁরা তোমাকে কিরূপে দেখিবেন? আবার ইহাঁরা ছাড়া যে আমাদের আরও কত দুঃখিনী ভগ্নী আছেন তুমি তাঁহাদেরও উপকার কর। তুমি ত জান, অন্তর্যামী, তোমাকে বলিব কি? তোমার অদর্শন যন্ত্রণা যে সহ্য হয় না। প্রাণ থাকৃতে তোমার মুখ দেখিলাম না, এই দুঃখ সহ্য হয় না। আর কে আছে ইহাঁদের দুঃখ দূর করে? তুমিই অগতির গতি। তোমার ঐ চরণের সঙ্গে ইহাঁদের হৃদয়গুলিকে বাঁধ। যেমন রূপলাবণ্য দেখাইয়া ভক্তজনের লোভের বস্তু হইয়াছ, তেমনই যেন শুনিতে পাই, আজ আশ্রমের অমুক ভগ্নী, কাল অমুক ভগ্নী তোমাকে দেখিয়া সুখে মত্ত হইয়াছেন। নাথ! আশীর্ব্বাদ কর, তোমার আশীর্ব্বাদে সকলই হয়।

ঈশ্বর! তোমার সন্তান তোমাকে দেখিতে চায়, তুমিও তোমার সন্তানকে দেখা না দিয়া আর কাহাকে দেখা দিবে? এবং তোমার

রূপলাবণ্য আর দেখিবেই বা কে? পিতা! অনেকবার তোমাকে দেখিয়া মোহিত হইয়াছি। আরও ইচ্ছা হয় তোমাকে আরও ভাল করিয়া দেখি। হে প্রিয় পিতা! তুমিও ইচ্ছা কর দেখা দিবে, তোমার দুঃখিনী কন্যারাও তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন। ইচ্ছার ত মিলন হইল। দুঃখিনীকে এত দিনের পর পিতা দেখা দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন এই কথা তোমার প্রত্যেক কন্যা বলিতে শিখুন। বিচার কর বিচারপতি! যদি তোমার সন্তান তোমাকে না দেখিল তবে জীবন কি জন্য? আশীর্ব্বাদ কর, তোমার বঙ্গদেশের মেয়েরা তোমার দর্শনের আলোকে তোমাকে মা বলে ডেকে সুখী হউন, প্রফুল্ল হউন। সকলকে নিকটে ডেকে দেখা দাও। তোমার দর্শন পেতে যেন সকলের অভিলাষ হয়। আজ যেমন শোভা করিয়া বসিয়া আছ, এমনই তুমি তোমার স্বর্গে চিরকাল তোমার ভক্তদিগের সঙ্গে বসিয়া আছ। স্বর্গের লোকদের দুঃখ নাই, অদর্শন-যন্ত্রণা কি তাঁহারা জানেন না। কবে আমরাও স্বর্গে বসে তাঁহাদের ন্যায় চিরসুখী হইব? "হৃদে হেরিব, আর অভয়চরণ পূজিব?" আজ আর কাঁদিবার সময় নাই। হে দয়ার সাগর! এই যে উৎসব সুসম্পন্ন হইল, কৃতজ্ঞতা নাও। এই ভিক্ষা করি, এই যে কাঁদিলাম, এই জলে যেন ফল হয়। পিতা! এত অনুগ্রহ দেখালে এই কয়েক দিন। তোমাকে ছাড়িয়া যাই কিরূপে? তাই ডাকিতেছি, জননি, কাছে এসে বস, এই আমাদের অবিশ্বাসী মস্তকের উপর তোমার শ্রীচরণ স্থাপিত কর। তোমার প্রসাদে পরস্পরের সঙ্গে পবিত্র প্রণয়ের সম্পর্ক স্থাপন করিব। তোমার মুখ দেখিতে দেখিতে আমাদের হৃদয়ে গভীর আহ্লাদের জল উথলিয়া

উঠিবে। হে মাতৃহীনের মাতা! ভাই ভগ্নী সকলের জননি! এই আশা করিয়া তোমার শ্রীচরণে আমরা ভক্তির সহিত নমস্কার করি।

ইচ্ছাই ধর্ম্মের মূল।

রবিবার, ১৯শে মাঘ, ১৭৯৬ শক; ৩১শে জানুয়ারি, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

কিছুই ছিল না সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইল। কিছুই ছিল না তথাপি এই সুন্দর বিশ্ব ঘোর অন্ধকার হইতে উৎপন্ন হইল। হেতু কি? এক ইচ্ছা, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন, এই জগৎ আসিল। এক ইচ্ছা অন্ধকার হইতে জ্যোতি বাহির করিল, সেই ইচ্ছা ঈশ্বরেতে পূর্ণ এবং অনন্ত ভাবে রহিয়াছে। সেই ইচ্ছা প্রত্যেক মনুষ্যাত্মার মধ্যে রহিয়াছে; কিন্তু অনন্ত অসীম ইচ্ছা আমাদের নাই, ঈশ্বরের আছে। আমাদের যতটুকু পরিমাণে ইচ্ছা আছে, ততটুকু পরিমাণে আমরা অন্ধকার হইতে আলোক, নরক হইতে স্বর্গ, এবং কদাকার হইতে সুন্দর বস্তু লাভ করি। ইচ্ছা দুর্ব্বল এবং অসৎ হইতে পারে না। কিছু ছিল না আর এই ইচ্ছার প্রভাবে অনেক হইল। জয়লাভের আদি কারণ ইচ্ছা। যাহা কিছু হইয়াছে, যাহা কিছু হইতেছে, যাহা কিছু হইবে, সমুদয়ের কারণ ইচ্ছা। আলোক, সত্য লাভ করিতে যদি মনুষ্যের ইচ্ছা না হয় তাহার জীবনে অন্ধকার এবং অসত্য থাকিবেই। ইচ্ছা যেখানে সেখানে দুর্ব্বলতা নাই। ঈশ্বরের ইচ্ছা হইল, পৃথিবী সৃষ্ট হউক, অথচ পৃথিবীর সৃষ্টি হইল না ইহা কিরূপে হইতে পারে? ইচ্ছার বল অনতিক্রমণীয়।

সেইরূপ মনুষ্যের ইচ্ছা যদি বলে পাপ দূর হউক, পাপ কি থাকিতে পারে? মানিলাম অনেক জঘন্য পাপ পোষণ করা হইয়াছে, অনেক উপদেশ এবং সাধুসঙ্গ অবহেলা করিয়া অন্তরে পাপরিপুকে প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু ইচ্ছা হইলে কোন্ পাপকে না দূর করিয়া দিতে পার? ঈশ্বরের ইচ্ছার স্ফুলিঙ্গ অন্ধকার মধ্যে প্রবেশ করিল, আর তৎক্ষণাৎ আশ্চর্য্য জ্যোতি বাহির হইল, যদি তেমনই আমাদের একটী স্বর্গীয় ইচ্ছা হয়, তবে কি আমাদের মনে পাপ দুঃখ থাকিতে পারে? মনুষ্য দেবতা হইতে পারে, কেবল একটী সামগ্রী থাকিলে, সেই সামগ্রী ইচ্ছা। ঈশ্বরেচ্ছায় যেমন জগৎ জন্মিল, মনুষ্যের ইচ্ছায় তেমনই স্বর্গীয় জীবনের উৎপত্তি হয়। সত্যের প্রদীপ, প্রেমের নদ নদী কোথা হইতে বাহির হইল? এই এক ইচ্ছা হইতে। বস্তুতঃ এই ধর্ম্মজগতের সৃষ্টি তেমনই আশ্চর্য্য যেমন অনন্তগুণ অধিক পরিমাণে আশ্চর্য্য,—অন্ধকার হইতে এই জগতের সৃষ্টি। কিছুই ছিল না, আর কে রচিল এমন সুন্দর বিশ্ব ছবি, ইহা ভাবিয়া যেমন আমরা আশ্চর্য্য হই, তেমনই যখন দেখি পাপীর জঘন্য কদাকার হৃদয় হইতে সুন্দর স্বর্গীয় জীবন উঠিল, তখন সহজেই আমরা চমৎকৃত হই! যখন দেখি পাপী দুর্জ্জয় ইচ্ছাবলে ধর্ম্মজগৎ বাহির করিল, তখন বলি, ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য্য কি আছে? গভীর অন্ধকার যেখানে ছিল, কোথা হইতে সেখানে এত আলোক আসিল?

বাস্তবিক ইচ্ছার বলে আশ্চর্য্য ঘটনা সকল সংঘটিত হইতেছে। ইচ্ছার গুণ আমরা চিরদিন ঘোষণা করিব। ইচ্ছা সামান্য বল নহে। ঈশ্বরের শক্তি ভিন্ন ইচ্ছা আর কিছুই নহে। ঈশ্বরের দয়াও তাঁহার

ইচ্ছার ভিতরে কার্য্য করে। ইচ্ছা দ্বারা ঈশ্বর তাঁহার কার্য্য সকল সাধন করিতেছেন। মনুষ্য সেইরূপ ঈশ্বরের দাস হইয়া এই ইচ্ছার বলে ক্ষুদ্র পরিমাণে এক একটী সুন্দর ধর্ম্মজগৎ নির্ম্মাণ করিতেছে। কেমন আশ্চর্য্য সেই বল যাহা পাপকে জয় করে, এবং নরকের মধ্যে স্বর্গ সৃজন করে! সমস্ত ধর্ম্মজগতে এই ইচ্ছারই মহিমা দেখা যায়। যেখানে ইচ্ছার বিলোপ সেখানে মৃত্যু, অন্ধকার। অতএব যদি ধর্ম্মজীবন চাও তবে এই ইচ্ছাকে অবলম্বন কর। একদিন ব্রহ্মাণ্ডসম্পর্কে যাহা হইয়াছে, ধর্ম্মজীবনসম্পর্কেও তাহারই প্রয়োজন। যেখানে সাধু ইচ্ছার প্রভাবে সুন্দর পুণ্য জগতের নির্ম্মাণ, সেখানে অসাধুতার মৃত্যু। যে দিন মনুষ্য ভাল হইতে ইচ্ছা করে সেই দিন হইতেই তাহার নব জীবনের আরম্ভ হয়। সেই ইচ্ছার মূলে ঈশ্বরের কৃপা কার্য্য করে, এবং সেই ইচ্ছাই স্বর্গীয় জীবনের নেতা। যদি কেহ বলেন ইচ্ছাতে স্বর্গ হয় না, ইচ্ছাতে পাপ দমন হয় না, তিনি মিথ্যা বলেন। যেটুকু সাধু ইচ্ছা সেইটুকু ঈশ্বরের। যিনি সূর্য্যকে আকাশে প্রকাশিত হইতে বলেন তিনিই আমাদের অন্তরের সাধু ইচ্ছাকে উদিত হইতে বলেন। প্রকৃত ইচ্ছা তাহা যাহা সৃজন করে। যাহা অন্ধকার মধ্যে আলোক প্রকাশিত করে। আমাদের পক্ষে ধর্ম্ম সৃজন করিতে হইবে। আমাদের ছিল দুর্ব্বলতা এবং অন্ধকার, সেই দুর্ব্বলতা এবং অন্ধকারের মধ্যে বল এবং আলোক আনিতে হইবে। এইজন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা চাই, কেন না সেই ইচ্ছা আমাদের ইচ্ছার সঙ্গে যোগ দিয়া নূতন প্রেমের রাজ্য প্রকাশ করে। ঈশ্বরের সঙ্গে সাধু ইচ্ছার বিরোধ হইতে পারে না। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই মনুষ্যের পরিবর্ত্তন হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা না হইলে মনুষ্য

কি আপনার বলে অধর্ম্ম হইতে আপনাকে ধর্ম্মপথে লইয়া যাইতে পারে? ইচ্ছা হইল অথচ কার্য্য হইল না, ইহা হইতে পারে না। যেমন ইচ্ছাতে কোটী কোটী লোকমণ্ডলী নির্ম্মিত হইল, তেমনই সাধু ইচ্ছা হইলেই মনুষ্যের পরিত্রাণ হয়।

সমুদয়ের মূল কারণ ইচ্ছা। ইচ্ছা ভিন্ন ধর্ম্মোন্নতি কখনই সম্ভব হইতে পারে না। ইচ্ছাতেই পরিত্রাণ, এইজন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের সকল শাস্ত্র আশার ব্যাপার! এত অপরাধ করিয়াছ, ঈশ্বরের বক্ষে এত অস্ত্রাঘাত করিয়াছ, তথাপি সাধু ইচ্ছা হইলেই বাঁচিয়া যাইবে, ইহা ব্রাহ্মধর্ম্মের আশার কথা। মনের মালিন্য ধৌত হইবে না, পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, পাপ আপনাকে আপনি মারিবে কিরূপে? অন্ধকার কিরূপে আলোক আনিবে? পাপ করিলে পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পার না, পৃথিবীতে সর্ব্বদাই এ সকল নিরাশার কথা শুনিয়াছি; কিন্তু ব্রাহ্ম এক দিকে যেমন পৃথিবীর অবিশ্বাস এবং নিরাশার কথা শুনিতেছেন, অপর দিকে তিনি আবার ঈশ্বরের মুখে আশার কথা শুনিতেছেন। মহাপাপীও যখন ঈশ্বরের কথা শুনে, সে বলে আমি পাপী; কিন্তু যখন আমার ইচ্ছা হইয়াছে যে, আমি নির্ম্মল হইব, তখন কাহার সাধ্য আমাকে বাধা দেয়? আমি যদি যথার্থ ব্রাহ্মসন্তান হই, আমি বলিতেছি, পাপ-সাগর শুষ্ক হউক, এখনই তাহা শুষ্ক হইবে। শত বৎসরের পাপ চূর্ণ হইবে। এমন পাপী কেহ পৃথিবীতে নাই যে ইচ্ছা করিলে নিষ্পাপ হইতে পারে না। প্রত্যেক পাপী একবার হৃদয়ের ভিতরে নূতন ইচ্ছাকে স্থান দিয়া জিহ্বার অগ্রে এই কথা রাখুক যে পাপ যাইবে; নিশ্চয়ই তাহার পাপ চূর্ণ হইবে।

যখন হৃদয়ে শুভ ইচ্ছার উদয় হয়, তখনই পাপীর পরিবর্ত্তন হয়। আত্মার সাধু ইচ্ছা ব্যতীত সমুদয় দুর্ব্বলতা, সমুদয় অন্ধকার। ভাল হইবার অনেক উপায় আছে, কিন্তু যদি ইচ্ছা না থাকে কিছুই হইবে না। একবার বল, কোটীবার আমি পাপ করিয়াছি বটে; কিন্তু আমি এখন ইচ্ছা করিয়াছি ভাল হইব। যিনি এইরূপ ইচ্ছায় বলে ভাল হইয়াছেন তিনি জানেন ইচ্ছার কত প্রতাপ। সামান্য একটী জিহ্বা; কিন্তু ইচ্ছা থাকিলে ইহার একটী শব্দে মনুষ্য দেবতা হয়। জন্মাবধি আমি দুর্ব্বল, জন্মাবধি আমি পাপাসক্ত; কিন্তু যাই আমার ইচ্ছা হইল, আমি ঈশ্বরের বলে পুণ্যবান্ হইব, তখনই আমার জীবনে পরিবর্ত্তন হইল। এক ইচ্ছা, এক শব্দে সহস্র বৎসরের পাপ দূর করিতে পারে। একবার রসনা আজ্ঞা প্রচার করুক হস্তদ্বয় কি করে দেখিবে!

ঈশ্বরের ইচ্ছা ভিন্ন কেহ জন্মিতে পারে না। ইচ্ছাতে যাহার জন্ম, বলেতে তাহার জন্ম। আমার পাপ পশ্চাতে রহিল, ইচ্ছা হইল, আর আমি পুণ্য-পথে পরিত্রাণ-পথে চলিতে লাগিলাম। পশ্চাতে কি হইতেছে মনুষ্যের শরীরের চক্ষুও তাহা দেখিতে পায় না। অতএব যখন জানিতেছি ইচ্ছা হইলেই ভাল হইতে পারি, তখন আমরা বিশ্বাস এবং আশার চক্ষে কেবল ভবিষ্যতের দিকেই দেখিব। কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা পূর্ব্বে যেমন এখনও তেমনই প্রবল রহিল, মনুষ্যসমাজ পূর্ব্বে যেমন পাপে লুণ্ঠিত ছিল, এখনও তেমনই রহিল, প্রমত্ততা আসে না, প্রেম আসে না, পুরাতন অভ্যস্ত পাপ যায় না, নরকের সন্তান যদি আমরা হই, তবেই এ সকল কথায় বিশ্বাস করিতে পারি। যখন আমরা

সাধু ইচ্ছার দুর্জ্জয় বল দেখিতেছি তখন কিরূপে আমরা এ সকল অন্ধকারের কথা বলিব? আমরা দেখিতেছি ঈশ্বরের বল আমাদের প্রতিজনের ভিতরে আছে। এই রসনাই পরিত্রাণ করিবে। ইচ্ছার বলে এই রসনার শব্দগুণে জগতের পরিত্রাণ হইবে। শব্দ দ্বারা পশু-জীবনকে বিনাশ করিব। আমাদের যাবতীয় মঙ্গল ঘটনার মধ্যে এই ইচ্ছার প্রভাব দেখিতেছি। যদি বল আমাদের ইচ্ছা আছে তথাপি অসদ্ভাব যায় না, সেই বৃথা কথা পরিত্যাগ কর। কেন না, ইচ্ছা তেমন হয় নাই। যে ইচ্ছার কথা বলিলাম তাহা সামান্য ইচ্ছা নহে। ইচ্ছাশাস্ত্রে বিশ্বাস কর। ইহার জন্য স্বর্গের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা কর। যখন মনের সহিত বিশ্বাস করিবে তখন জীবনে বিশ্বাসের কার্য্য হইবে। অবিশ্বাসী ভণ্ড ব্রাহ্ম, তুমি মনে মনে এখনও এই ভয় পোষণ করিতেছ হয় ত ইচ্ছা করিলেও ভাল হইব না। যাঁহারা ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং ব্রহ্মসন্তানের ইচ্ছার বলে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বলেন, যাও পর্ব্বত, দূর হও, পর্ব্বত তখনই স্থানান্তরিত হয়। তাঁহারা বলেন আসুক প্রেমধাম, তখনই প্রেমধাম নির্ম্মিত হয়। এখনই যদি ইচ্ছা করি, এখনই পরিত্রাণ পাইব। ইচ্ছা কর পরিত্রাণ পাইবে।

হে প্রেমময় পরমেশ্বর! কতবার অন্তরের অন্তরে তুমি প্রকাশিত হইয়াছ। আমরা এত পাপ করিয়াছিলাম যে পৃথিবী বলিল এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই; কিন্তু তুমি বলিলে, আমরা ইচ্ছা করিলেই পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইব। ভাল উপাসনা যদি না হয় মনুষ্য ইচ্ছা করিলেই ভাল উপাসনা করিতে পারে। তোমার ইচ্ছা ভিন্ন কে কখন বাঁচিয়াছে? যথার্থ সাধু ইচ্ছা যখন উদিত হয়, তুমি ত

আপনি তাহার সহায়তা কর। সম্প্রতি যে তোমার এত ধন পাইলাম, বুঝিতেছি যদি ইচ্ছা হয় তবে রাখিতে পারিব। পিতা, ইচ্ছা থাকিলে কে তোমাকে দেখিতে পায় না? এমন কবে ঘটিয়াছে যে, তোমার জন্য কাঁদিয়া তোমার দর্শন পাই নাই? এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন আমরা সাধু ইচ্ছা দিন দিন পোষণ করিতে পারি। যাহাতে অসাধু মনে সাধু ইচ্ছার উদয় হয় কৃপা করিয়া তুমি এমন বিধান করিয়া দাও।

ব্রহ্মস্পর্শ। *

রবিবার, ২৬শে মাঘ, ১৭৯৬ শক; ৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

ঈশ্বর-দর্শন এবং ঈশ্বর শ্রবণ-যোগের তত্ত্ব ইতিপূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। আমরা পৃথিবীতে স্বতন্ত্র হইয়া বাস করি, ঈশ্বর স্বতন্ত্র ভাবে স্বর্গে বাস করেন। আমাদের পাপ হইতেই এই স্বতন্ত্রতা। মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছা যে দিন তাহাকে ঈশ্বরের ইচ্ছা হইতে বিচ্ছিন্ন করিল, সেই দিন হইতেই স্বতন্ত্রতা আরম্ভ হইল। এই স্বতন্ত্রতা বিনষ্ট হইয়া, আবার মনুষ্যের সঙ্গে ঈশ্বরের যোগ হইতে পারে, যখন মনুষ্য অনুতপ্ত এবং সংশোধন প্রয়াসী হইয়া দর্শন এবং শ্রবণ-যোগ দ্বারা ঈশ্বরকে আরাধনা, ধ্যান এবং প্রার্থনা করে। উপাসনা করিতে করিতে যতই আত্মার বিশ্বাস বৃদ্ধি হয়, ততই দর্শন উজ্জ্বলতর হয়। আবার যাঁহাকে উজ্জ্বলতররূপে দেখা যায় তাঁহার কথা শুনিতে স্বভাবতঃই অন্তরে ইচ্ছা হয়, গুরু বলিয়া তাঁহার কাছে উপদেশ না শুনিলে কেবল দর্শনে পূর্ণ তৃপ্তি হয় না।

এক দিকে যেমন সন্তানের অনেক দিনের পর যতই পিতাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা হয় ততই তিনি তাহাকে দেখা দেন, তেমনই অন্য দিকে যখন ঈশ্বর দেখেন যে তাঁহার সন্তান সমুদয় মনুষ্য কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ঘোর বিপদগ্রস্ত হইয়াছে, তখন তিনি স্বয়ং মধুর কথা বলিয়া তাহাকে উপদেশ দেন। এইরূপে ব্রহ্মের সুন্দর পবিত্র প্রেমমুখের দর্শন যেমন সাধকের চক্ষুকে অনুরঞ্জিত করে, তেমনই সেই মুখের কথা অমৃত বর্ষণ করে। যখন ব্রহ্মের সঙ্গে মনুষ্যের দর্শন এবং শ্রবণ-যোগের আরম্ভ হয় তখন আত্মা চক্ষে কর্ণে অমৃত তুলিয়া লয়। দর্শন-যোগ দ্বারা চক্ষু ঈশ্বরকে দেখিতে থাকে, শ্রবণ-যোগ দ্বারা কর্ণ ঈশ্বরের কথা শুনিতে আরম্ভ করে। এই দ্বিবিধ যোগ এখানে বিবৃত হইয়াছে।

কিন্তু আত্মার গভীরতর স্থানে প্রবেশ করিয়া তৃতীয় প্রকার যোগ দেখিতে পাই। ঈশ্বরকে দর্শন শ্রবণ করিলে তাঁহাকে স্পর্শ করিতে ইচ্ছা হয়। এই ইচ্ছা অন্যান্য ইচ্ছার অনুগামিনী এবং সহগামিনী। দর্শনেচ্ছা শ্রবণেচ্ছাকে উদ্দীপন করিল। তিনি যিনি মনুষ্যকে দেখা দিবেন এবং তাহার সঙ্গে কথা বলিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তিনিই মনুষ্যকে এই স্বভাব দিয়াছেন যে তিনি দেখা দিবেন, আর মনুষ্য তাঁহাকে দেখিবে, তিনি কথা কহিবেন আর মনুষ্য তাহা শ্রবণ করিবে। কিন্তু দর্শন হইল, শ্রবণ হইল, তথাপি মনুষ্য ভাবিতে পারে ঈশ্বর দূরস্থ রহিলেন, কেন না দূরস্থ বস্তু দেখা যায়, এবং দূরস্থ শব্দ শ্রবণ করা যায়। দেখা কিম্বা শুনা ইহার অর্থ ইহা নহে যে, যাহা দেখি কিম্বা শুনি, আমি তাহার অত্যন্ত নিকটে, এইজন্য ব্রহ্মদর্শন এবং শ্রবণের পরেও

ব্রহ্মকে স্পর্শ করিবার জন্য আত্মার প্রবল ইচ্ছা হয়। সাধকগণ! সাবধান, এ সমুদয় অতীন্দ্রিয় বিষয়ে শারীরিক উপমা আনিও না; কেবল আধ্যাত্মিক ভূমিতে থাকিয়া এ সকল বিষয় বুঝিতে হইবে। জড় বস্তুকে নিকটে রাখিয়া আমরা স্পর্শ করি, ঈশ্বরকে আত্মার মধ্যে নিকটস্থ দেখিয়া স্পর্শ করি; কিন্তু জড় বস্তুর নৈকট্যের সঙ্গে ইহার কোন সাদৃশ্য নাই। ব্রহ্মস্পর্শ কাহাকে বলে? জড়রাজ্যে তাহার উপমা নাই। কেবল এই মাত্র বলা যায়, যেমন দর্শন শ্রবণ সম্পর্কে একজন দেখা দেন, আর একজন দর্শন করেন, একজন কথা বলেন, আর একজন সেই কথা শ্রবণ করেন, সেইরূপ ব্রহ্মস্পর্শ সম্পর্কেও একজন সংস্পৃষ্ট হন আর একজন সংস্পর্শ করেন।

ঈশ্বর দেখা দিলে আমরা তাঁহাকে দেখি, তিনি কথা কহিলে আমরা তাঁহাকে শুনি, সেইরূপ তিনি স্পর্শ করিলে আমরা তাঁহাকে স্পর্শ করি। স্পর্শেতে দুই চেতন আত্মার এক সময়ে স্পর্শজ্ঞান হয়। ঈশ্বর প্রথম স্পর্শ করেন, আমরা পরে তাঁহার স্পর্শ অনুভব করি। পাপী আত্মার সাধ্য নাই একেবারে প্রথমেই সেই পূর্ণ পবিত্র নিষ্কলঙ্ক ঈশ্বরকে স্পর্শ করে। কিন্তু অনেক সাধনের পর স্পর্শ দ্বারা যে ফল হয় তাহা মনুষ্য ঢাকিয়া রাখিতে পারে না। এইজন্য স্পর্শজ্ঞান কখনও আমাদের নিকট কল্পনা জ্ঞান হইতে পারে না। স্পর্শ দ্বারা যিনি পরমাত্মাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, তিনি আর কোন মতেই ঈশ্বরকে ছায়া কিম্বা কল্পনা বলিতে পারেন না। যখন অনেক কালের সাধন ও আয়াসের পর ঈশ্বর শিষ্যের আত্মার উপরে তাঁহার আপনার দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিয়া বলেন, বৎস! কি বর চাও বল তখন প্রার্থী ব্রাহ্ম, ধন, জন, স্ত্রী, পুত্র, সুখ, সম্পদ কিম্বা

চিরস্থায়ী কীর্ত্তি ইহার কিছুই প্রার্থনা করেন না, তিনি কেবল এই ভিক্ষা করেন, "আমি অন্য কিছু নাহি চাই," আমি তোমার "ঐ পরশে পবিত্র হইতে চাই।" তুমি ক্রমাগত স্পর্শ কর, অর্থাৎ তোমার মঙ্গল হস্ত আমার আত্মার মধ্যে দৃঢ়রূপে স্থাপন কর, তাহা হইলেই আমি উদ্ধার হইব, আমি পুণ্যবান্ হইব।

যতদিন বর পাইবার সময় না হয় এই কথা আশার আকারে সাধকের আত্মাতে বাস করে। আশা সামান্য নহে, আশাই ভগ্ন হৃদয়কে রক্ষা করে। আমরা সকলেই এই আশায় জীবন যাপন করিতেছি। ভয়ানক পরীক্ষা বিপদের মধ্যে আশায় বুক বাঁধিয়া আছি। কিন্তু যখন আশা পূর্ণ হইবার সময় হয় তখন আর আশা অবলম্বন করিয়া প্রাণধারণ করা যায় না, তখন আশা বিষ হয়। যখন শস্য পরিপক্ক হয় তখন ত আর আশার সময় নহে, তখন শস্য সংগ্রহ এবং সম্ভোগ করিবার সময়। বীজ বপনের সময় আশা; কিন্তু শস্য সংগ্রহের সময় আশা নহে। যদি তখনও আশা আসিয়া বলে যে আমি তোমাকে এতদিন রক্ষা করিয়াছিলাম, এখনও তোমার সহায় হইব; তখন তাহাকে প্রবঞ্চক বলিয়া বিদায় করিয়া দিব। আশা ভবিষ্যতে বাস করে; কিন্তু আজ ফল পাইবার দিন, আজ আশা হইতে পারে না। যে সময় রোগী প্রতীকার লাভ করিবে সেই সময় যদি চিকিৎসক আশার কথা বলে তাহা মৃত্যু, তাহা প্রবঞ্চনা। আশা পূর্ণ হইবার সময় আশা নহে, তখন সম্ভোগ করিবার সময়। সাধক হয় ত চল্লিশ বৎসর আশা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু আশা পূর্ণ হইবার সময় তিনি আর আশার কথা শুনিবেন না। এতদিন আশা পূর্ণ হইবে বলিয়া ঈশ্বরের মুখের দিকে তাকাইয়া ছিলেন; কিন্তু

যখন বর পাইবার সময় আসিল তখন আর তিনি আশা পূর্ণ হইবে বলিয়া তাকাইয়া থাকিতে পারেন না। যত আশা পূর্ণ হইবার দিন নিকট হয় ততই তাঁহার ব্যস্ততা বৃদ্ধি হয়। সাধক কি বর চান? কি সামগ্রী চান? ব্রহ্মস্পর্শ। যে জন্য এতদিন মধুর ব্রহ্ম-দর্শন, মধুর ব্রহ্ম-শ্রবণ হইল, এখন তিনি সেই ফল ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন। সাধক এই চান পরমাত্মা তাঁহার আত্মার ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া দক্ষিণ হস্তে তাঁহাকে স্পর্শ করিবেন।

এতদিন যে জন্য নানা প্রকার সাধন করিলেন স্তুতি করিলেন, এখন সেই ফল সেই বর পাইবার সময় হইয়াছে। দশ বা চল্লিশ বৎসর সাধনের পর, স্বর্গ হইতে সমাচার আসিল, অমুকের সাধন হইয়াছে, এই বর পাইবার সময় ঈশ্বর জানাইয়াছেন। এই স্পর্শ হইল, তোমার অমুক পাপ চলিয়া গেল। ব্রহ্ম বলিয়া দিলেন এই তোমাকে স্পর্শ করিলাম, তোমার শরীর মন পবিত্র হইল। বাস্তবিক দেবস্পর্শে পাপ একেবারে গেল। স্পর্শে আত্মার মধ্যে গূঢ় পরিবর্ত্তন আনিল, ইহাতে আত্মার গভীরতম স্থান বিলোড়িত হইল, কোথায় সেই পাপের গাঢ় কলঙ্ক চলিয়া গেল তাহার চিহ্নমাত্র রহিল না। এই পরিত্রাণ স্পর্শ-সম্ভূত। যদিও মনুষ্য যে একেবারে সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে তাহা আমরা দেখি নাই; কিন্তু কোন কোন পাপ হইতে আমরা সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ পাইতে পারি ইহা আমরা জীবনে পরীক্ষায় দেখিয়াছি। এই প্রকার একটী সংস্কার এখনও অনেক জাতির মধ্যে রহিয়াছে যে, ঈশ্বরের অবতার, দেব-প্রতিনিধি, কিম্বা কোন কোন বিশেষ মহাসাধু স্পর্শ করিলেই মহারোগীর রোগ দূর হইত, এবং পাপীর পাপ চলিয়া যাইত।

একবার সেই মহাপুরুষ তাঁহার দক্ষিণ হস্তে রোগী কিম্বা পাপীকে স্পর্শ করিলেন, আর তৎক্ষণাৎ সেই বহুকালের রোগ হইতে সে আরোগ্য লাভ করিল ; সেই বহুকালের পাপ হইতে সে মুক্ত হইল। যদিও আমরা ব্রাহ্ম হইয়া এ সকল বিশ্বাস করি না ; কিন্তু এ সকল কথার মধ্যে একটী মূল তত্ত্ব রহিয়াছে।

নিশ্চয়ই একজন আছেন, যিনি তাঁহার স্বর্গীয় স্পর্শে পরিত্রাণ করিতে পারেন। পরিত্রাণ পাইব, উদ্ধার হইব, আমরা ব্রাহ্ম হইয়া চিরকাল কি এই কথা বলিব ? পরিত্রাণ পাইয়াছি, এই দেখ অমুক সময়ে আমার পাপ গিয়াছে, এই কথা তখন বলিতে পারিব যখন ব্রহ্মস্পর্শ লাভ করিব। যখন ঈশ্বর আত্মার উপরে তাঁহার হস্ত রাখিয়া বলিবেন, "উঠ ব্রাহ্ম" তখন মৃত ব্যক্তি বাঁচিয়া উঠিবে। যখন এই নিরাকার ঈশ্বরের নিরাকার হস্ত স্পর্শে মৃত প্রাণে নব জীবন সঞ্চারিত হইবে তখন মৃত ব্রাহ্ম বলিবে কে আমাকে পূর্ণ ও সুস্থ করিল ? আমি ছিলাম মৃত এবং বিকৃত কে আমাকে পূর্ণ ও সুস্থ করিল ? ব্রাহ্মগণ, যখন তোমরা ঈশ্বরকে স্পর্শ করিবে তখন তোমাদেরই জীবনে এ সকল অলৌকিক ব্যাপার হইবে। ব্রহ্মের নিকটে বসিলাম ; তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া ভক্তিভাবে একটীবার প্রণাম করিলাম, তিনি বলিলেন, তোমার মঙ্গল হউক। আমার রাগ দমন কর বলিয়া প্রণাম করিলাম, ঈশ্বর বলিলেন এই তোমার রাগ গেল। এই প্রকারে কাম, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা যাহা কিছু পৃথিবীতে নরক আনিয়াছে, ব্রহ্মের আশীর্ব্বাদে, তাঁহার চরণস্পর্শে সমুদয় বিদূরিত হইবে। ব্রহ্মস্পর্শে জীবাত্মা সঞ্জীবিত হয় ইহা কি তোমরা দেখ নাই ? কেমন পুণ্যপ্রদ, কেমন সুমধুর সেই স্পর্শ !

হস্ত নাই, অঙ্গুলি নাই অথচ স্পর্শ হইল। যখন এই সুখ, এই পুণ্য বুঝিতে পারিবে তখন দেখিবে তোমার আশাক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হইল কেন না তখন জানিবে পরমাত্মাকে কেবল দেখা যায় শুনা যায় তাহা নহে, কিন্তু তাঁহাকে জীবাত্মা স্পর্শ করিতে পারে।

ব্রহ্মস্পর্শ। *

রবিবার, ৩রা ফাল্গুন, ১৭৯৬ শক; ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

অতীন্দ্রিয় ব্যাপার সকল জড়ের দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করা দুরাশা। ইন্দ্রিয়াতীত আত্মা-রাজ্যে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, ইন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান হয় তাহার সঙ্গে কি সে সমুদয় ঘটনার তুলনা হইতে পারে? তথাপি উপমা দ্বারা যতটুকু প্রতিপন্ন করা যায়, এস ততটুকু প্রতিপন্ন করি, অবশিষ্ট যাহা থাকিবে তাহা সাধন দ্বারা বুঝিতে হইবে। দৃষ্টান্ত দ্বারা সে সকল নিগূঢ় তত্ত্ব উজ্জ্বল করিতে গেলে, আরও গভীরতর অন্ধকার দেখা যায়। ভাষা কেবল সহায় হইতে পারে, এইজন্য কতক পরিমাণে গ্রাহ্য। ঈশ্বর স্পর্শ সম্পর্কে উপমা দ্বারা আর অধিক কি বলা যাইতে পারে? যাঁহার গুরুত্ব নাই, তাঁহাকে স্পর্শ করিব কিরূপে? এবং তাঁহাকে স্পর্শ করিবার জন্য আত্মার শক্তিই বা কোথায়? কিন্তু যদিও কোন বাহিরের উপমা দ্বারা ইহা সপ্রমাণ করা যায় না, তথাপি ইহা প্রত্যেক সাধকের পরীক্ষিত সত্য। যদি দর্শন শ্রবণ আত্মার মধ্যে হইতে পারে, তবে স্পর্শও হইতে পারে। কারণ স্পর্শ এই দুই ইন্দ্রিয়ের সহকারী, বিশেষতঃ ইহা দর্শনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহায়।

চক্ষু দেখিল কোন বস্তু আছে; কিন্তু কুটিল বুদ্ধি তাহার সত্তায় সন্দেহ জন্মাইয়া দিল, কেন না চক্ষুর সময়ে সময়ে ভ্রম হয়। কিন্তু হস্ত প্রসারণ করিয়া যখন সেই বস্তু ধরিলাম, তখন যেখানে বস্তু ছিল না মনে করিয়াছিলাম, তৎক্ষণাৎ সেখানে স্পর্শ আসিয়া ভ্রম জাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল। তখন সেই বস্তুর অস্তিত্ব অতি উজ্জ্বলরূপে প্রমাণীকৃত হইল।

স্পর্শ দ্বারা ব্রহ্ম করতলন্যস্ত বস্তুর ন্যায় আয়ত্ত হন। বস্তুর সেই প্রমাণ কেমন দৃঢ়. যখন চক্ষু বলে ঐ ব্রহ্ম দেখা দিতেছেন, যখন কর্ণ বলে ঐ ব্রহ্ম কথা বলিতেছেন, এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে স্পর্শ বলে, এই আমি ব্রহ্মকে ধরিয়াছি। যখন এই তিন জন সাক্ষী, এই তিন জন বন্ধু একত্র হইয়া আমার সহায় হইল, তখন কোথায় বা অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত, কোথায় বা সাগর সমান বিঘ্ন? যেখানে এই তিন জন মহাবীর ঈশ্বরের সত্তা প্রমাণ করিয়া দিল, সেখানে কি সন্দেহ-জাল থাকিতে পারে? স্পর্শেতে এক দিকে যেমন যুক্তি ও প্রমাণ প্রবল হয়, আর এক দিকে তেমনই আত্মায় শান্তি ও আনন্দ বৃদ্ধি হয়। আত্মার গভীরতম স্থানে আত্মার কর সকল প্রসারিত হইল, আর ব্রহ্ম-সহবাস অনুভূত হইল। যাঁহার আত্মার হস্ত ভগ্ন, অথবা স্পর্শ শক্তি দুর্ব্বল, তিনি কিরূপে ঈশ্বরের স্পর্শ সুখাস্বাদ করিবেন? কিন্তু যাঁহার আত্মার শক্তি সকল সতেজ, যাঁহার চক্ষু বলে, ঐ দেখ তোমার সম্মুখে কে, কর্ণ বলে, ঐ শুন কে কথা বলিতেছেন, স্পর্শ বলে, এই দেখ কে তোমাকে স্পর্শ করিতেছেন, তিনি বলেন জগতে এমন কে আছে যে এমন পবিত্র সুখ হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতে পারে? যখন জীবাত্মা

এই প্রকার প্রগাঢ় ভাবে পরমাত্মাকে ধারণ করে তখন আত্মার আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল শরীরের মধ্যেও প্রকাশিত হয়।

ভক্তি হস্তে যখন সাধক ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধারণ করিলেন তখন তাঁহার শরীর পুলকিত হইল। ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছ সশরীরে স্বর্গে যাওয়া অসম্ভব নহে। আত্মা যদি ঈশ্বর-সহবাসে নির্ম্মল হয়, শরীরও তাহার সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র হয়। আত্মা যদি স্বর্গবাসী হয়, শরীরও স্বর্গবাসী হয়। ব্রহ্ম হইতে মহাতেজ আসিয়া যখন আত্মাকে সমুজ্জ্বলিত করে তখন শরীরও তাহা দ্বারা সতেজ হয়। তখন সাধক দেখিতে পান, তাঁহার আত্মা এবং শরীর দুইই এক স্বর্গীয় দাবানলে প্রজ্জ্বলিত হইতেছে। ইহাই ব্রহ্মস্পর্শের লক্ষণ। যখন আত্মার গভীর স্থানে ব্রহ্মস্পর্শ জ্ঞান হয়, তখন শরীর মনের মধ্যে জমাট ভাবের উদয় হয়। পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে যাহার মনে না আশার প্রবলতা না বল বীর্য্য, উদ্যম, না ছিল কিছুই ; কিন্তু কেবল সংসার-চিন্তা, জড়তা, শিথিলতা এবং মৃত ভাব ছিল, ব্রহ্ম সংস্পর্শ মাত্র সেই হৃদয়ের ভিতরে আশ্চর্য্য দৃঢ়তা, অটল নিষ্ঠা, এবং জ্বলন্ত উৎসাহ আসিল। তাহার আত্মার সমুদয় স্পন্দহীন বল সঞ্জীবিত এবং ঘনীভূত হইয়া আসিল। কোন মহারাজার সমক্ষে বসিলে যেমন সামান্য প্রজার শরীর মনে ভয় এবং গাম্ভীর্য্যের উদয় হয়, অগ্নির মধ্যে বসিলে যেমন শরীর চন্ করিয়া উঠে, তেমনই ঈশ্বরের সংস্পর্শ মাত্র সমস্ত শরীর মন পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ব্রহ্ম হইতে সহস্র স্ফুলিঙ্গ আসিয়া সাধকের মনের কলঙ্ক এবং শরীরের মালিন্য দগ্ধ করে। ব্রহ্ম সন্নিধানে পাপ, দুর্ব্বলতা, নির্জীবতা থাকিতে পারে না, সেখানে কেবলই তেজের ব্যাপার। সেই অগ্নিময় সহবাসে

বসিবা মাত্র আত্মার সমস্ত শিথিল এবং বিভক্ত শক্তি ঘনীভূত হইয়া যায়। অল্প সাধনেও আমরা ব্রহ্মস্পর্শের এই লক্ষণ দেখিয়াছি। যে পরিমাণে অন্তরে বল, বীর্য্য, আশা উৎসাহ এবং পুণ্য শান্তি বৃদ্ধি সেই পরিমাণে ব্রহ্মস্পর্শ অনুভূত হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। এই সাধক বলিলেন, ঈশ্বর নিকটে আসিয়াছেন ; কিন্তু আমি অনুভব করিতে পারিতেছি না, এক নিমিষের মধ্যে আবার বলিলেন আঃ! ঈশ্বর সংস্পর্শে প্রাণ জুড়াইল ; হৃদয় শীতল হইল ; এক নিমিষের মধ্যে পরিবর্ত্তন হইল। এই ব্যবধান কে বুঝাইয়া দিবে? ক্ষণকাল পূর্ব্বে ভয়ানক উত্তাপে পথিকের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছিল ; কিন্তু যখনই পবিত্র সমীরণ চলিতে লাগিল, তৎক্ষণাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন, আঃ প্রাণ জুড়াইল। সেইরূপ যখন ব্রহ্ম-সহবাস-বায়ু আত্মার মধ্যে সংলগ্ন হয়, তৎক্ষণাৎ ইহার বহুকালের রোগ এবং ক্লান্তি দূর হয়।

এই স্পর্শজ্ঞান অতি সহজে হয়। যাহারা ঈশ্বরের সত্তা প্রমাণ করিতে যায় ইহা তাহাদেরই বিলম্বে হয়। কিন্তু হে উচ্চ ব্রহ্ম-সাধক তোমাকে বলিতেছি, অনতি বিলম্বের যে সাধন তাহা তুমি গ্রহণ কর। এখনই তুমি বল, এই স্থানে ঈশ্বর আছেন, দেখিবে বলিবা মাত্র এক মহাগম্ভীর প্রকৃতি পুরুষ, তোমাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিলেন, তাঁহার স্পর্শ মাত্র তোমার আত্মার মধ্যে আর একটু মাত্রও শীতলতা, স্পন্দহীনতা রহিল না ; কিন্তু আত্মার সমুদয় বল, উৎসাহ ঘনীভূত হইয়া উঠিল। পাপীর পক্ষে এই স্পর্শসুখ সামান্য ঘটনা নহে। ইহা আকর্ষণের একটী আশ্চর্য্য দুশ্ছেদ্য জাল।

জগতের সমুদয় পাপীদিগকে ধরিবার জন্য সুচতুর ঈশ্বর অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র তাঁহার এই আশ্চর্য্য সহবাস জাল বিস্তীর্ণ করিয়াছেন।

যতই ভাবি এই জাল ছিঁড়িয়া বাহিরে যাই, আশ্চর্য্য আরও দৃঢ়তররূপে ইহাতে আবদ্ধ হই। না পারি বাহির দিয়া পলায়ন করিতে, না পারি ভিতরের জাল কাটিতে। এই জালে হইলাম জড়িত, এই জালেই হইব জড়িত। ব্রহ্মজাল কেমন অনতিক্রমণীয়। যে দিকে চাই সেই দিকেই দেখি ব্রহ্ম-সহবাস-রূপ একটী বিস্তীর্ণ প্রেমজাল আমাদিগকে অধিকৃত এবং বশীভূত করিয়া ফেলিয়াছে। যতই এই জালে বদ্ধ হইতেছি ততই ইহা দ্বারা আত্মা, মন, প্রাণ সমুদয় মোহিত হইয়া যাইতেছে। কি দেখিতেছি, অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র এই ব্রহ্ম-সহবাস, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু স্পর্শ করিতে পারি না।

যেমন আত্মারাজ্যে ব্রহ্মের সিংহাসন, তেমনই জড়জগতেও তাঁহার গম্ভীর বর্ত্তমানতা। প্রত্যেক জড়বস্তুর মধ্যে ব্রহ্মতেজ, ব্রহ্মদীপ্তি অনুভব করিতেছি। আহার করি অন্নের মধ্যে তাঁহার প্রেম হস্ত; বায়ু সেবন করি, বায়ুর মধ্যে তাঁহার স্নিগ্ধ সহবাস, জল পান করি, জলের মধ্যে তাঁহার সুশীতল স্নেহ-হস্ত। এইরূপ যে কোন বস্তু সম্ভোগ করি, প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে তাঁহার পবিত্র সংস্পর্শ অনুভব করি।

সংসারী মন! তোমারও গতি হইল, কেন না সংসারেও তুমি ব্রহ্মকে অতিক্রম করিতে পার না; সংসারের যে কোন বস্তু স্পর্শ করিবে তাহার মধ্যেই ব্রহ্ম লুক্কায়িত হইয়া বাস করিতেছেন। বিশ্বাসী সাধকগণ, দেখ, অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই এই অনতিক্রমণীয় সহবাস। ইহা অপেক্ষা কোন্ কবি উৎকৃষ্টতর স্বর্গ রচনা করিতে পারে? কোন্ চিত্রকর ইহা অপেক্ষা সুন্দরতর পবিত্রতর রাজ্য চিত্র করিতে পারে? এইরূপে অন্তরে বাহিরে সকল স্থানে সকল বস্তুতে

ব্রহ্মকে দেখিয়া ব্রহ্মকে স্পর্শ করিয়া সাধক তাঁহাকে বলিলেন, তুমি আমাকে ছাড়িতে পার না, আমিও তোমাকে ছাড়িব না। বাস্তবিক যিনি একবার ব্রহ্মকে দেখিলেন, তিনি বলিতে পারিলেন না আর আমি তোমাকে দেখিতে চাই না; কিন্তু তিনি বাধ্য হইয়া বলিলেন, হে সুন্দর ঈশ্বর! আরও তুমি দেখা দাও, এবং যিনি একবার ব্রহ্মের মধুর বচন শুনিলেন, তিনি বলিতে পারিলেন না, আর তোমার কথা শুনিব না, কিন্তু তিনি বলিলেন, আরও তোমার সুমধুর উপদেশ শুনিব। সেইরূপ যিনি একবার ঈশ্বরের স্পর্শ সুখ অনুভব করিলেন, তিনি বলিলেন, আরও তোমাকে স্পর্শ করিতে দাও। যতই তাঁহাকে দর্শন, শ্রবণ, এবং স্পর্শ করিবে, ততই তাঁহাকে দেখিবার, শুনিবার এবং স্পর্শ করিবার ইচ্ছা বলবতী হইবে। সাধকদিগের এই ইচ্ছা ব্রহ্ম পূর্ণ করুন! ব্রহ্মস্পর্শে যেন ব্রাহ্মদিগের পরিত্রাণ হয়।

শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল পাইনের বাটী।

দুই শ্রেণীর বিশ্বাসী।

শনিবার, ৯ই ফাল্গুন, ১৭৯৬ শক; ২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

ঈশ্বরের সকল উপাসকই বিশ্বাসী। যাঁহারা তাঁহার পূজা অর্চ্চনা করেন তাঁহারা সকলেই তাঁহার বিশ্বাসী সন্তান। কিন্তু ভীত বিশ্বাসী এক শ্রেণীর লোক, নির্ভয় বিশ্বাসী অন্য শ্রেণীর লোক। প্রথম শ্রেণীর লোকেরা ঈশ্বর যে তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই পরিত্রাণ দিবেন,

তাঁহাদের চরিত্র নির্ম্মল করিয়া যে তাঁহাদিগকে আনন্দধামে লইয়া যাইবেন ইহা বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের মনে এই ভয় আছে, এই যে কতকাল পাপের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া একটু শান্তিলাভ করিলাম, হয় ত আবার ইহা হারাইয়া মরুভূমির শুষ্কতার মধ্যে পড়িয়া অবিশ্বাসী হইতে হইবে। এই ভয়ই তাঁহাদের নিরাশা এবং মৃত্যুর কারণ হয়। কিন্তু এমন বিশ্বাসী আছেন যাঁহারা ঈশ্বরকে ধরিয়াছেন কেবল তাহা নহে; কিন্তু তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে নির্ভয় হইয়াছেন।

ভাল লোকের মধ্যেও মন্দ লোক আছে এবং মন্দ লোকের মধ্যেও ভাল লোক আছে; কিন্তু যদি শ্রেণীবদ্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে, এই দুটী শ্রেণী স্বীকার করিতেই হইবে। ব্রাহ্ম, তোমার জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্য আছে, ইহা মনে করিয়া তুমি অহঙ্কৃত হইও না, কেন না ইহা তোমার অভয় অবস্থা নহে; যদি ইহাতেই তুমি নিশ্চিন্ত থাক তবে তোমার উচ্চ অবস্থার উপরে বিশ্বাস নাই। তবে তুমি ধন্য, যদি বিশ্বাস করিতে পার। পরিত্রাণ পাইবেন যাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে তুমি চিহ্নিত। প্রাণেশ্বর তোমাকে তাঁহাদের মধ্যে গ্রহণ করিয়া অভয় দান করিয়াছেন। যতক্ষণ ভয় থাকিবে ততক্ষণ অধীর হইয়া থাকিতে হইবে। তোমাকে আমি পরিত্রাণ করিবই করিব, তোমার পরিত্রাণ নিশ্চিত, আজ তোমাকে এই বর দিলাম, যিনি এই কথা ঈশ্বরমুখে শুনিয়াছেন, তিনিই নির্ভয় হইয়াছেন। সহস্র সাধকের মধ্যে দুই চারিটী লোক এইরূপে চিহ্নিত। আসে অনেক; কিন্তু চিহ্নিত হয় অল্প লোক। আমরা সকলেই পিতার চরণ বক্ষস্থলে ধারণ করি; কিন্তু 'তোমাকে আমি পরিত্রাণ হইতে বঞ্চিত করিব না, তোমাকে একজন চিহ্নিত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি,'

পিতার মুখে কয়টী লোক এই কথা শুনিয়াছেন? আমরা যদি এই কথা শুনি, আমাদের পক্ষে সশরীরে স্বর্গে যাওয়া অসম্ভব নহে। সহস্র শত্রু যদি আমাদিগকে অধর্ম্মের দিকে টানিতে থাকে তথাপি আমরা স্বর্গে যাইব। পিতার মুখের কথা কখনই ব্যর্থ হইবে না। আমরা স্বর্গে গিয়া বসিবই বসিব। কেন না ঈশ্বর নিজ মুখে বলিয়াছেন, 'বৎস, আমি তোমাকে নিশ্চয়ই উদ্ধার করিব, তুমি নিরাশাকে বধ কর।' ধর্ম্মজগতের আর সকলই আড়ম্বর এবং ফাঁকি, সার কেবল পিতার এই অঙ্গীকার। এত বয়স হইল যদি পিতার মুখে এই আশার কথা না শুনি তবে আমাদের কি হইল? অতএব ব্রাহ্মগণ, একটু ব্যস্ত হও। দীননাথের মুখে এই কথা না শুনিলে বাঁচিবে কিরূপে? তিনি প্রসন্ন হইয়া এই বরটী যেন প্রত্যেক সাধককে দেন যে, 'আমি আর তোমাকে ছাড়িব না।' আমাদের নিজের কোন গুণ নাই যে আমরা সেই সহস্রের মধ্যে দুই পাঁচ জন হইব। পিতা যদি কাছে ডাকিয়া বলিয়া দেন, 'এত দিন পর তোমার সাধন সফল হইল, যাও তুমি নির্ভয় হইয়া সংসারে বিচরণ কর; আজ আমি তোমার হইলাম, তুমি আমার হইলে,' এমন শুভাশীর্ব্বাদ কবে পিতার মুখে শুনিব? এইজন্য প্রাণ ব্যাকুল হউক। ঈশ্বরের আশ্বাস বাক্য, তাঁহার অভয়দান ভিন্ন কি সাধক বাঁচিতে পারে? সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চদান এই অভয়বাক্য। পুত্রকে যদি পিতা অভয় দিলেন তবে আর তার ভয় ভাবনা কি? যদি আমরা অভয়পদ না পাই তবে আমাদের ধর্ম্মসাধনে ফল কি? এই কথা যেন পিতাকে বলিতে পারি, দুঃখ দাও, কষ্ট দাও ক্ষতি নাই; কিন্তু অভয় দিও তাহা হইলেই সুখী হইব।

কি একাকী কি ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে যতবার তাঁহাকে দেখিব ততবার তাঁহার কাছে এই ভিক্ষা চাহিব ততক্ষণই মস্তক পাতিয়া থাকিব, যতক্ষণ না ইহার উপরে তাঁহার পবিত্র অভয় হস্ত স্থাপন করিবেন। তার মত দুঃখী কে আছে যে এই কথা শুনিল না।

সার ধর্ম্ম গ্রহণ কর। পবিত্র হইবই হইব কেন না ঈশ্বর বলিয়াছেন। মানুষ এবং নিজের বিকৃত বুদ্ধি শত্রু হইয়া আমাদিগকে ভয় দেখায়; কিন্তু ঈশ্বর বলিয়াছেন, আমরা পবিত্র হইবই, তবে ভয় করিব কাহাকে? যথা সময়ে তাঁহার শ্রীমুখাৎ এই আশীর্ব্বাদ শুনিব। এই আশীর্ব্বাদের সঙ্গে সঙ্গে এক নূতন পবিত্র জীবন পাইব, অনন্তকালের আনন্দরাজ্যের দ্বার খুলিয়া যাইবে। দয়াময় আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ দিন, আমরা প্রতীক্ষা করিয়া তাঁহার চরণতলে পড়িয়া থাকি।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

ব্রহ্মস্পর্শ।

রবিবার, ১০ই ফাল্গুন, ১৭৯৬ শক; ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

অনেকে ধর্ম্মের উচ্চ সাধনের প্রতি দৃষ্টি করিতে গিয়া সাধনের সামান্য রীতি সকলের প্রতি উপেক্ষা করেন। মনুষ্য ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবে; কিন্তু অগ্রসর হইবে বলিয়া যাহা সামান্য তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে না। উচ্চ শিক্ষা পাইতেছি বলিয়া যে

পুরাতন প্রথম পাঠ সকল বিস্মৃত হইতে হইবে তাহা নহে। আমরা উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিব বটে; কিন্তু প্রত্যেক সাধন রীতিকে নূতন রাখিব।

আমাদের মধ্যে অনেককে দেখা যায় যাঁহারা প্রণাম করাকে সামান্য মনে করেন। অনেক সময় পদ্ধতির অনুরোধেও আমরা প্রণাম করি। প্রণামের মধ্যে কোন উচ্চ ভাব আছে কি না তাহা অনুধাবন করিয়া দেখি না। বাস্তবিক প্রণাম অর্থ, ঈশ্বর-চরণ-স্পর্শ।

উপাসনার অন্যান্য ভাব হৃদয়ের ভিতরে থাকে; কিন্তু প্রণাম করা শারীরিক ব্যাপার হইয়া উঠে; এইজন্য প্রণামটী যেন সর্ব্বদা সরলভাবে হয়, ইহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নতুবা বারম্বার শরীরকে প্রণাম কার্য্যে নিযুক্ত করিতে করিতে প্রণাম করা একটী বাহ্যিক পদ্ধতি হইয়া যাইবে। যখন আমাদের মন বিনীত হইয়া, স্বার্থ অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিভাবে ঈশ্বরের চরণ স্পর্শ করে তখনই যথার্থ প্রণাম হয়। যখন সর্ব্বত্যাগী হইয়া সাধক সেই চরণকে সর্ব্বস্ব মনে করে তখন আপনা আপনি ভক্তি উথলিয়া উঠে, এবং নির্ভরের ভাব সম্যক্‌রূপে চরিতার্থ হয়। এই প্রকার যথার্থ প্রণামে আত্মার ভক্তি এবং নির্ভরের ভাব বৃদ্ধি হয়। আজ প্রণাম এক ভাবে করি; পাঁচ বৎসর পর ইহা অপেক্ষা গূঢ় মিষ্টতর ভাবে ঈশ্বরকে প্রণাম করিব। যথার্থ প্রণামের অর্থ ঈশ্বরের চরণ স্পর্শ করিয়া পবিত্র হওয়া। যিনি সেই চরণ না দেখিয়া প্রণাম করেন তিনি অন্ধকারে প্রণাম করেন। প্রণাম করিলে হইবে না; কিন্তু ঈশ্বরের দিকে যে অপরার্দ্ধ আছে তাহা দেখিতে হইবে।

ঈশ্বরের চরণ এবং মনুষ্যের মস্তক, এই দুয়ের সংস্পর্শ না হইলে যথার্থ প্রণাম হয় না। মনুষ্য মস্তক রাখিল; কিন্তু কোথায় রাখিল? বৃক্ষের নিকট অবনত হওয়াকে প্রণাম বলা যায় না। মস্তক অবনত করা প্রণামের এক অর্দ্ধ ভাগ, অপরার্দ্ধ ভাগ ঈশ্বরের চরণ। যদি চরণ স্পর্শ করিতে না পারিলাম তবে প্রণাম করিব কাহাকে! যদি যথার্থ ধর্ম্মবুদ্ধি থাকে তবে মস্তক ঠিক সেই স্থানে ফেলিব, যেখানে নিশ্চিতরূপে ঈশ্বরের চরণ দেখিব। একজনের পবিত্র চরণ, একজনের কলঙ্কিত মস্তক। একজনের পাপের অগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, অগ্নিতে মস্তক দগ্ধ হইতেছে, আর একজনের চরণ শান্তির সমুদ্র, পুণ্যের সুশীতল জল। যেমন শীতল সলিল সংস্পর্শে উত্তপ্ত শরীর স্নিগ্ধ হয়, সেইরূপ যখনই পাপ-দগ্ধ-মস্তক ঈশ্বরের শান্তিপূর্ণ চরণ ধারণ করিল, তৎক্ষণাৎ প্রণত সাধকের অন্তরে বিশুদ্ধ সুখ অনুভূত হইল। ইহাতেই যথার্থ প্রণাম বা ব্রহ্মপদ স্পর্শ বলে। অন্যথা শূন্যে কিম্বা জড় বস্তুর চরণে প্রণাম করিলে পরিত্রাণ হয় না। তাহা কল্পনা এবং কুসংস্কার। বরং অর্দ্ধ ঘণ্টা, কিম্বা দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হয় করিব; কিন্তু যতক্ষণ ঈশ্বরের চরণ না দেখিব ততক্ষণ প্রণাম করিতে পারি না।

যথার্থ প্রণতি কাহাকে বলে? যাহা হইতে অমৃত ফল প্রসূত হয়। যে প্রণামে পাপের পরিবর্ত্তে পবিত্রতা, এবং দুঃখের পরিবর্ত্তে সুখ উৎপন্ন হয়। কিন্তু আমরা হয় ত প্রতিদিন পাঁচবার কি দশবার প্রণাম করি অথচ আমাদের অন্তরের পাপ বিষাদ দূর হয় না। ইহার কারণ এই আমাদের আত্মা যথার্থ ভাবে প্রণাম করে না, কেবল শরীর কপট ভাব ধারণ করিয়া প্রণত হয়। যথার্থ প্রণাম

হইল কি না ফল দ্বারা আমরা তখনই বুঝিতে পারি। প্রণাম সামান্ত নহে। প্রণাম ঈশ্বরের স্পর্শের আরম্ভ। যখন আত্মা ঈশ্বরকে প্রণাম করিতে শিখিল তখনই তাহার ঈশ্বর চরণ স্পর্শানুভূতি আরম্ভ হইল। সমস্ত দিনের মধ্যে যিনি একবার প্রণাম করিতে পারেন তিনি ধন্ত। ঈশ্বর সত্তায় নিঃসন্দেহ হইয়া যিনি একবার তাঁহার চরণতলে মস্তককে রাখিতে পারিলেন তিনি সামান্ত লোক নহেন। দুই ঘণ্টা দীর্ঘ উপাসনাতে যাহা হয়, একটী ক্ষুদ্র প্রণামে তাহা হয়। কেন না আত্মার বিশ্বাস, কৃতজ্ঞতা, ভক্তি, নির্ভর ইত্যাদি সমুদয় শক্তি ঘনীভূত হইয়া একটী ক্ষুদ্র প্রণামের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। তুমি দুঃখী, কিন্তু ভক্তির সহিত পিতাকে একটী প্রণাম করিলেই তোমার সকল দুঃখ দূর হইল, কেন না তুমি দেখিলে তিনি তোমার সহায়, তাঁহার আশীর্ব্বাদ হস্ত, তাঁহার পবিত্র মঙ্গল চরণ তোমার মস্তকের উপর স্থাপিত। তোমাকে আর কেহ বাঁচাইতে পারিবে না, কেবল ঈশ্বর বাঁচাইবেন। তাঁহারই কৃপাতে প্রাণের মধ্যে আনন্দ লাভ করিবে। অনেক উপাসনা কর অবশ্যই করিতে হইবে; কিন্তু প্রণামকে সামান্ত মনে করিও না। অন্তরের অন্তরে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে এই ঈশ্বরের চরণ, এই আমার মস্তক, যখন দেখিবে তাঁহার চরণে তোমার মস্তক সংলগ্ন হইল তখন নিশ্চয়ই এই স্পর্শ হইতে তোমার অন্তরে স্বর্গীয় অগ্নি উত্থিত হইবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রণাম স্পর্শের আরম্ভ; কিন্তু এমন সুন্দর পবিত্র যাঁহার চরণ তাঁহাকে কি একবার প্রণাম করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি? মনুষ্যাত্মা একবার ঐ পবিত্র স্পর্শ-সুখ আস্বাদ করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারে না। অতএব দিন দিন এই প্রণামের অথবা স্পর্শ-সুখের

ব্যাপ্তি এবং গাঢ়তার বৃদ্ধি হইতে থাকে। ব্রহ্ম-স্পর্শ লোভী ব্যক্তি একবার ঐ চরণ স্পর্শ করিয়া পূর্ণকাম হইতে পারে না। তিনি আরও ঘনতর, গাঢ়তর স্পর্শ লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হন। অবশেষে এই স্পর্শ-সুখ-রসে তাঁহার প্রাণ এমনই প্রমত্ত হয় যে তিনি এই স্পর্শ ছাড়িয়া এক নিমেষ বাঁচিতে পারেন না। তখন মৎস্যের মত অবিশ্রান্ত তিনি ব্রহ্ম-জলের মধ্যে বাস করেন। অতএব ব্রহ্মকে একবার প্রণাম করিলেই লোভ চরিতার্থ হয় না। বাসনা অসীম। কি বিষয় সম্পর্কে, কি অতীন্দ্রিয় ঈশ্বর সম্পর্কে কামনার অন্ত নাই। মৎস্য যেমন দিবা নিশি জলের মধ্যে বাস করে, জলেতেই ক্রীড়া করে, সন্তরণ করে, এবং জলেতেই তাহার সুখ, স্ফূর্ত্তি; জল হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেই তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়, ঈশ্বর-সন্তানও সেইরূপ অবিচ্ছিন্ন ভাবে ঈশ্বরেরই মধ্যে বাস করিতে কামনা করেন। ঈশ্বর এই সমক্ষে দেখা দিয়া, আমাদের মস্তককে টানিয়া লইয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করাইয়া লইলেন; কিন্তু এই প্রণাম, এই স্পর্শ ক্ষণস্থায়ী। আবার বিচ্ছেদ হইল; কিন্তু বিচ্ছেদ ঐ স্পর্শ-সুখের জন্য আত্মাকে আরও লালায়িত করিল।

মৎস্য সর্ব্বদাই জলে থাকে; কিন্তু জল কি, তাহা জানে না, বিচ্ছেদ ভিন্ন তাহার জ্ঞান হয় না। জলের সঙ্গে তাহার জীবনের এত নিগূঢ় যোগ, অথচ মৎস্য সেই জলের সত্তা অনুভব করিতে পারে না। সেইরূপ ব্রাহ্মও যখন বারবার যোগ এবং বিচ্ছেদের দ্বারা বুঝিতে পারেন যে ব্রহ্ম ভিন্ন তিনি এক নিমেষ বাঁচিতে পারেন না তখন মৎস্য যেমন গভীর জলে, তিনিও তেমনই ব্রহ্মের মধ্যে বসিয়া থাকেন। তখন ঈশ্বর তাঁহার আবাসভূমি, ঈশ্বর তাঁহার অগাধ জল।

ঈশ্বরময় জগতে তিনি বাস করেন, ঈশ্বরময় আকাশে তিনি সঞ্চরণ করেন, এবং দিন দিন তাঁহার আত্মা গাঢ় হইতে গাঢ়তর সমাধিতে নিয়োজিত হয়। তখন তিনি গভীর হইতে গভীরতর স্পর্শ-সুখ সম্ভোগ করেন। তখন যে ঈশ্বরের চরণে কেবল তাঁহার মস্তক প্রণত হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু বিশ্বাস, প্রেম, ভক্তি, নির্ভর ইত্যাদি আত্মার সমুদয় বিভাগ ঈশ্বরেতে চরিতার্থ হইতেছে। চারিদিকেই তাঁহার ব্রহ্ম-স্পর্শ হইতেছে। তখন ব্রহ্মই তাঁহার সর্ব্বস্ব হইয়া উঠেন। তখন কি বুদ্ধি দ্বারা কি ভক্তি দ্বারা তিনি কেবল ব্রহ্মকেই স্পর্শ করেন। তখন তাঁহার অন্তরে ব্রহ্ম, তাঁহার চারিদিকে ব্রহ্ম। তখন তাঁহার ভক্তি বলিতেছে, আমার প্রাণসখা আমার প্রাণের মধ্যে, তাঁহার বুদ্ধি বলিতেছে আমার গুরু আমার মনোমন্দিরে বসিয়া আছেন। তখন বুদ্ধি শুষ্ক থাকে না, ভক্তিও অন্ধ থাকে না। তখন বিষয়ের সুখ উপস্থিত করিয়া বলি, মন! ব্রহ্মাকাশ ছাড়িয়া, ব্রহ্ম-বায়ু ছাড়িয়া সংসার-বায়ু সেবন করিতে শীঘ্র এস। কিন্তু তখন আত্মা কোথায় চলিয়া গিয়াছে, এ সকল কথা সে শুনিতেও পায় না। সেই সাধক যিনি ব্রহ্ম-স্পর্শ-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন কে তাঁহাকে টানিয়া আনিবে? তিনি আজও গেলেন, কালও গেলেন, চিরকালের জন্য গেলেন।

ব্রাহ্ম যদি সংসারের উত্তাপ হইতে মুক্ত হইতে চাও, তবে ব্রহ্মরূপ সুশীতল জলের গভীরতম স্থানে নিমগ্ন হও। তোমরা দেখিয়াছ, যতই শীতল জল স্পৃহনীয়, অবগাহনেচ্ছু ততই গভীরতর জলে প্রবেশ করেন। আবার ইহাও দেখিয়াছি, একবার গভীরতর জলে স্নান করিয়া উত্তপ্ত শরীরকে শীতল করিয়া আনিলাম; কিন্তু আবার

উপরিভাগের উত্তপ্ত জলে সেই শীতলতা চলিয়া গেল, অতএব যিনি বুদ্ধিমান, তিনি একেবারে সেই গভীরতম জলে ডুবিয়া থাকেন, আর উপরিভাগে মস্তক উত্তোলন করেন না। সেইরূপ যিনি গভীর ভক্ত সাধক, যিনি দেখিয়াছেন, বারম্বার ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়াও আবার সংসারের তাপে উত্তপ্ত হইতে হয়, তিনি চিরদিনের জন্য ঐ সুশীতল চরণে তাঁহার মস্তক রক্ষা করেন, আর কখনও তাহা উত্তোলন করেন না। গভীর ব্রহ্ম-সাগরে ডুবিলাম বটে, আত্মা শীতল হইল, প্রচুর পরিমাণে তাঁহার স্পর্শ-সুখ সম্ভোগ করিয়াছি। কিন্তু উঠিতে লাগিলাম, ক্রমে জল উত্তপ্ত বোধ হইতে লাগিল, জল ছাড়িয়া উঠিলাম, ভয়ানক উত্তাপ পাঁচ ছয়বার এইরূপে প্রবঞ্চিত হইলাম। কিন্তু যথার্থ নিগূঢ় সাধক সেই যে ডুবিলেন আর উঠিলেন না। যে অন্বেষণ করে সে পায়। সাধক যতই শীতল জল চান, ঈশ্বর ততই তাহা দেন। সেই যে সাধক ডুবিলেন কোথায় গেলেন তুমিও জান না, আমিও জানি না, পৃথিবী জানিবে কিরূপে? ব্রহ্ম সাধক সম্পর্কে ইহা যেন সত্য হয়। ব্রহ্ম সাধক অনন্তকালের জন্য ঝাঁপ দিয়াছেন। তোমার আমার যদি এই প্রকার সুখ হয় তবে জানিলাম ব্রাহ্মজীবন ধারণ করা সার্থক হইল।

ত্রিবিধ যোগ। *

রবিবার, ১৭ই ফাল্গুন, ১৭৯৬ শক; ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

শরীর তিন ইন্দ্রিয় দ্বারা পরাস্ত হইয়া সংসারের পদতলে অবনত হয় এবং অধর্ম্মের পথে ভ্রমণ করে। সেইরূপ আত্মাও তিন ইন্দ্রিয়

দ্বারা পরাজিত হইয়া ঈশ্বরকে ধারণ করে এবং চিরকালের জন্য ঈশ্বরের শরণাগত হয়। কি সংসারে, কি ধর্ম্মরাজ্যে সেই ইন্দ্রিয়ত্রয় সুখের বস্তু সকল অন্বেষণ করে, এবং সেই সকল সম্ভোগ করে। শরীরের ইন্দ্রিয় দ্বারা মনুষ্যের অধোগতি এবং মৃত্যু হয়; কিন্তু কি আশ্চর্য্য আত্মার ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা মনুষ্য নব জীবন লাভ করে এবং অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। কোথায় সুন্দর সামগ্রী দেখিব, কোথায় সুমিষ্ট স্বর শ্রবণ করিব, কোথায় সুকোমল বস্তু সকল স্পর্শ করিয়া সুখী হইব? মনুষ্য চিরকাল এই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। মনুষ্য যতক্ষণ ধর্ম্মের অনুযায়ী হইয়া এই তিন যোগে সংসারে বদ্ধ হয়, ততক্ষণ তাহার কোন ভয়ের কারণ নাই। কিন্তু এ সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা সুখভোগ করিতে করিতে মনুষ্যের মন এমনই সংসারাসক্ত হইয়া পড়ে যে, সে কিছুকাল পর বহু আয়াসেও এ সকল ছাড়িতে পারে না। যাহা দেখিয়া মন মুগ্ধ হইল, যাহা শুনিয়া হৃদয় জুড়াইল, যাহা স্পর্শ করিয়া শরীর পুলকিত হইল, মনুষ্য কি তাহা সহজে ছাড়িতে পারে? দেখিতে দেখিতে, শুনিতে শুনিতে, স্পর্শ করিতে করিতে মনুষ্য আপনার উপরে আপনার কর্ত্তৃত্ব হারাইল। আসক্তির এই ত্রিবিধ বন্ধনে মনুষ্য পাপের সঙ্গে সংলগ্ন হইল। তখন অপরাপর ইন্দ্রিয় সকলও তাহাকে পাপের পথে লইয়া যাইতে লাগিল। এই প্রকারে মনুষ্য কর্ত্তৃত্বহীন, স্বাধীনতা বিহীন হইয়া পাপের দাসত্ব করিতে লাগিল।

বন্ধন যত দৃঢ়তর হইতে লাগিল, মুক্তি ততই কঠিনতর হইয়া উঠিল। কিন্তু দয়াময় ঈশ্বরের রাজ্যে নিরাশার কারণ নাই। যাহারা পাপে মরিয়াছে তাহাদিগকেও তিনি আশ্চর্য্যরূপে বাঁচাইবেন এই তাঁহার

প্রতিজ্ঞা। শরীরের ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহার মৃত্যু হয়, তাহাকে তিনি আত্মার ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা উদ্ধার করেন। যেমন অপবিত্র দর্শনে আত্মার মৃত্যু হয় তেমনই আবার নির্ম্মলতর দর্শনে আত্মা নির্ম্মল হয়। শরীরের চক্ষু যেমন বাহিরের সৌন্দর্য্য দেখিতে চায়, আত্মাও সেইরূপ স্বর্গের সুন্দর বস্তু সকল দেখিতে বাঞ্ছা করে, এবং শরীরের কর্ণ ও হস্ত যেমন সুস্বর শুনিবার জন্য ও সুকোমল বস্তু ধরিবার জন্য সচেষ্ট হয়, আত্মার বিবেক-কর্ণ ও ভক্তি-হস্তও সেইরূপ ঈশ্বরের অমৃতময় বাক্য শ্রবণ ও তাঁহার পবিত্র শ্রীচরণ ধারণ করিতে ব্যাকুল হয়। যতই সংসারের বন্ধন কাটিয়া যায়, আত্মার এ সকল ইন্দ্রিয় ততই সতেজ হয়। পৃথিবীর দিক অন্ধকার হইয়া আসিল; কিন্তু স্বর্গের দিকে সুপ্রভাত হইল, সেই দিক হইতে সাধকের বিশ্বাস-চক্ষে কেমন মনোহর প্রেমরবি প্রকাশিত হইল। স্বর্গের মধ্যে যে চক্ষু সেই চক্ষু কি আর পৃথিবীর অন্ধকারে বিচরণ করিতে পারে? ক্রমাগত ভিতরের চক্ষু যতই ভিতরের চন্দ্রকে দেখিতে থাকে, বাহিরের চক্ষু ততই অবসন্ন হইতে থাকে। এবং সেই তেজোহীন চক্ষু উন্মীলিত থাকিলেও দৃষ্টিক্রিয়া হীন হইয়া পড়ে। সাধকের নয়ন ক্রমাগত ভিতরের দিকেই নিবিষ্ট হইতেছে।

সংসারে যেমন, অতীন্দ্রিয় পদার্থ সম্পর্কেও তেমনই। সাধকের বিশ্বাস-নয়ন অনিমেষ ঈশ্বরের দিকে তাকাইয়া আছে, সংসার তাহার ধন ধান্য মান মর্য্যাদা ইত্যাদি কত প্রকার প্রলোভন দেখাইল; কিন্তু কিছুতেই সেই চক্ষু ফিরিল না। আত্মার কর্ণও যাই একবার স্বর্গের সুস্বর শুনিল, অমনই সেই দিকে আকৃষ্ট হইয়া রহিল, আর ফিরিল না। সেখানে কেমন মধুময় সদুপদেশ সকল শুনিতে লাগিল। একটীর

পর একটী সুমিষ্ট কথা কর্ণে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। শুনিল সেখানে পৃথিবীর পক্ষিগণ হইতে আরও সুমিষ্টস্বরে কে গান করিতেছে। সেখানে সাধক একটু যদি সময় নষ্ট করেন, স্বর্গের কথা শুনিতে পান না, এবং তখনই তাঁহার অন্তরে বিষময় দুঃখ হয়, এইজন্য সর্ব্বদাই তিনি ভিতরের কর্ণ জাগ্রত রাখেন। এইরূপে যতই দিন রাত্রি ক্রমাগত তিনি স্বর্গের সুমিষ্ট উপদেশ সকল শ্রবণ করেন, ততই অভ্যাস দ্বারা স্বর্গের শব্দের সঙ্গে সাধকের কর্ণের বন্ধন দৃঢ়তর হয়। পৃথিবীতে তোমরা জান ক্রমাগত এক শব্দ শুনিলে তোমাদের ইচ্ছা না থাকিলেও সেই শব্দ শুনিতে হয়। ইচ্ছা করি সেই শব্দ শুনিব না তথাপি কর্ণের মধ্যে নিরন্তর সেই শব্দ শুনিতে পাই। অভ্যাসের এমনই ক্ষমতা যে সেই শব্দ বিলীন হইলেও আমাদের বোধ হয় যেন ঐ শব্দ আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে; কিন্তু ঈশ্বর হইতে এত কথা আসিতেছে যে তাহার অন্ত নাই। কর্ণ পাতিয়া থাক আর না থাক, প্রস্রবণ হইতে যেমন জল পড়িতে থাকে, তেমনই অবিশ্রান্ত ঈশ্বরের কথা জ্ঞান ও মঙ্গল ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া প্রত্যেক মনুষ্যের নিকট আসিতেছে। পৃথিবীর সমুদয় সুস্বর সেই কথার নিকট পরাস্ত হইয়া গিয়াছে।

মনোহর বস্তু যিনি স্বর্গে দেখিয়াছেন, পৃথিবী তাঁহার পক্ষে কদাকার, সেইরূপ স্বর্গের কথা যিনি শুনিয়াছেন, পৃথিবীর অতি সুমধুর স্বরও তাঁহার পক্ষে কর্কশ। ফলতঃ গভীররূপে স্বর্গের শোভা দেখিলে এবং স্বর্গের কথা শুনিলে আর চক্ষু কর্ণ ফিরে না। সেইরূপ ঈশ্বরের পবিত্র শীতল চরণে একবার প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ লাভ করিলে চিরকাল সেই চরণের আশ্রয় ভিন্ন আত্মা বাঁচিতে পারে না। যখন একবার

মনুষ্য ভক্তি-কর দ্বারা ঈশ্বরের স্পর্শ-সুখ অনুভব করে, তখন স্বভাবতঃ সেই সুখ চিরকাল ভোগ করিতে তাহার ইচ্ছা হয়। যাহাতে সেই স্পর্শ-যোগ সাধক অবিচ্ছেদে সম্ভোগ করিতে পারেন, তাহারই জন্ত তিনি বিশেষ যত্ন করেন। একবার যে আপনার বক্ষস্থলে ঐ সুস্নিগ্ধ চরণ রাখিয়াছে, আর কি সে তাহা ছাড়িয়া বাঁচিতে পারে? সেই চরণ এক দিকে সেই বক্ষ অপর দিকে ইহা হইতে পারে না। সেই স্পর্শ-রাজ্যে আত্মা বিচরণ করে। এবং ক্রমাগত এইরূপে সাধক এবং ঈশ্বর একত্র থাকিতে থাকিতে দুইয়ের মধ্যে গাঢ়তম সংলগ্নতা হয়। যতই আত্মার মধ্যে স্বর্গের স্পর্শ সকল অনুভূত হয়, ততই বাহিরের অত্যন্ত সুকোমল স্পর্শ সকলও নিতান্ত হেয় এবং অকিঞ্চিৎকর বোধ হয়। এইরূপে স্পর্শ-ডোরে যখন জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে বদ্ধ হয়, আর সাধক ঈশ্বরকে ছাড়িতে পারেন না।

দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ এই ত্রিবিধ যোগে ব্রহ্মের সঙ্গে সংযুক্ত হইলে সেই যোগী আত্মার আর পতনের ভয় থাকে না। কিন্তু কয়জন আমাদের মধ্যে এই প্রকার যোগী হইয়াছেন? আমরা কি ইহা বলিতে পারি যে, আমাদের চক্ষু এমনই অনিমেষ ঈশ্বরকে দেখিতেছে কিছুতেই ইহার তারা ফিরে না। কত বুঝাইয়া বলিতেছি, চক্ষু! শূন্ত মধ্যে তুমি কি দেখিতেছ? লোকে তোমাকে পাগল বলিবে, পৃথিবীর সুন্দর বস্তু সকল দেখ এসে; কিন্তু চক্ষু কোন কথা শুনিল না। সেই আকাশের মধ্যে কি সুন্দর এক ব্রহ্মপদে পদ্ম দেখিয়া চক্ষু ভুলিয়া গিয়াছে যে কোন মতেই আর ইহাকে ফিরান যায় না। আত্মার বাল্যকালে ঈশ্বরকে দেখিতে যাইতাম; কিন্তু যৌবনকালে তাঁহাকে নিকটে দেখিতেছি। ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য-সাগরে

চক্ষু নিমগ্ন হইলে আর কি তাহা ফিরিতে পারে? এইজন্য সাধক বলেন, সংসারের সুন্দর বস্তু সকল! আমার যে চক্ষু মজিয়াছে। কর্ণকেও কত কুমন্ত্রণা দ্বারা ভুলাইতে চেষ্টা করিলাম; কিন্তু কর্ণ শুনে না; স্বর্গের সুস্বর শুনিয়া কেমন মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রাতঃকাল হইতে কর্ণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, কতবার বলিলাম কর্ণ! তুমি কের, পৃথিবীতে কত জ্ঞানের কথা হইতেছে একবার এসে শুন; কিন্তু কর্ণ কোন কথাই শুনিল না। অবশ্য কর্ণ জানিয়াছে ঈশ্বর-মুখ-বিনিঃসৃত অমৃতময় কথা হইতে মনুষ্যের কথা মিষ্টতর নহে। স্পর্শ সম্পর্কেও তাহা। ভক্তি-কর ঈশ্বর চরণ-পদ্ম স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। তাহাকে বলিলাম তুমি আকাশের মধ্যে কি স্পর্শ করিতেছ? পৃথিবীতে কেমন সুকোমল বস্তু সকল রহিয়াছে, এ সমুদয় স্পর্শ কর সুখানুভব করিবে; কিন্তু সে তাহা শুনিল না। এইরূপে বক্ষকে বলিলাম, বক্ষ! তুমি আকাশের মধ্যে কাহাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছ? পৃথিবীর বন্ধুদিগকে স্থান দাও সুশীতল হইবে; কিন্তু বক্ষও আমার কথা গ্রাহ্য করিল না। চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, বক্ষ সকলেই ব্রহ্মেতেই সংলগ্ন হইয়া রহিল।

যথার্থ যোগী কেবল এ সকল কথা বলিতে পারেন। তাঁহার চারিদিক ব্রহ্মময়। তিনি যেখানে যান তাঁহার ঈশ্বর সেখানে। সেই পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। তিনি চলেন, আর ঈশ্বর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে। কাহার সাধ্য যোগীকে ঈশ্বরের ক্রোড় হইতে টানিয়া আনে? এই প্রকার সমুদয় স্থানে এবং সর্ব্বদা ব্রহ্ম-দর্শন, ব্রহ্ম-শ্রবণ এবং ব্রহ্ম-স্পর্শন ইত্যাদি অভ্যাস এবং সাধন দ্বারা জীবাত্মা ঈশ্বরের সঙ্গে চিরকালের জন্য সংলগ্ন হইয়া পড়ে। যিনি অনিমেষ

ব্রহ্মকে দেখিতেছেন, অবিশ্রান্ত ব্রহ্ম কথা শুনিতেছেন এবং অবিচ্ছেদে ব্রহ্মপদ স্পর্শ করিতেছেন, সেই সাধক যেখানে ঈশ্বর সেখানে রহিলেন, বিচ্ছেদ কিরূপে সম্ভব? ব্রাহ্ম! এই ত্রিবিধ যোগে তুমি যোগী হও। যোগী না হইলে তোমাকে শ্রদ্ধা দিব না। কেন না যোগ সাধন না করিলে কেহই চিরকাল ধর্ম্মরাজ্যে বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না। বাহিরের ধর্ম্ম শীঘ্রই নিঃশেষ হইয়া যাইবে। অতএব প্রাণ মধ্যে যোগী হইয়া নির্ভয় এবং সুখী হও।

ভক্ত দয়াবান্ কর্ম্মী।

রবিবার, ২৪শে ফাল্গুন, ১৭৯৬ শক; ৭ই মার্চ্চ, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

কর্ম্মীরা হস্ত দ্বারা পরিত্রাণ সঞ্চয় করে। তাহাদিগের পরিত্রাণ সাধনের প্রধান অস্ত্র দক্ষিণ হস্ত। পাপ বিনাশ, পুণ্য সাধন, প্রলোভন পরাজয়, প্রতিকূল অবস্থায় ধর্ম্ম সঞ্চয় এ সকল বিষয়েতেই কর্ম্মের উপর তাহাদিগের নির্ভর। কর্ম্মীর পক্ষে আশা ভরসা হস্ত। কর্ম্ম তাহাদিগের স্বর্গ, কর্ম্ম তাহাদিগের পরিত্রাণ। কর্ম্ম না করিতে পারিলে তাহারা অসুখী, কর্ম্ম করিতে পারিলে তাহারা সুখী। ভক্ত যিনি ভক্তি তাঁহার একমাত্র অবলম্বন। কর্ম্মীদিগের শাস্ত্র পরোপকার, ব্রাহ্ম উহা অগ্রাহ্য করেন না, কিন্তু তিনি উহাকে স্বর্গ বলিয়া স্বীকার করেন না। পরোপকার পরিত্রাণের পথে সোপান, তন্মধ্যে স্বর্গ নাই। উহা বাহ্যাড়ম্বর, উহার দ্বারা স্বর্গধাম পাইতে পারি না। যিনি স্বর্গ চান, তাঁহাকে অন্যত্র অন্বেষণ করিতে বলিব। কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর, তন্মধ্যে স্বর্গ আছে ইহা স্থির করিলে কি হইবে? কর্ম্মের প্রণালী বহুকাল হইল প্রচলিত আছে। সাধু ব্যক্তিরা

আত্মীয় কুটুম্ব স্বজন বন্ধু বান্ধব দেশীয় বিদেশীয় সকলের বিবিধ প্রকারের হিত সাধন করিয়া থাকেন।

পরোপকার মহাধর্ম্ম—পৃথিবীতে এ কথা চিরকাল প্রসিদ্ধ আছে। দেখ, পরোপকারের অসংখ্য কীর্ত্তি চারিদিকে বিদ্যমান রহিয়াছে; পরোপকারের কীর্ত্তি কীর্ত্তিত হইতেছে। যে স্থানে যে কালে সদনুষ্ঠান প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার শত শত কীর্ত্তিস্তম্ভ রহিয়া গিয়াছে। সদনুষ্ঠানের কত প্রশংসা; কিন্তু উহা অতি নিকৃষ্ট। উহাতে বিশেষ কিছুই নাই। উহা অতি সামান্য ব্যাপার। পরোপকার কোন দিন কাহার সঙ্গে স্বর্গে যায় না, কিন্তু যে মূল হইতে পরোপকার উৎপন্ন হয়, তাহাই সঙ্গে যায়। পরোপকারের হেতু পরলোকে যায়, পরোপকার ইহলোকে পড়িয়া থাকে। পরোপকার দ্বারা জগতের কল্যাণ হয়, দুঃখ দূর হয়, সুখ বর্দ্ধন হয় সত্য, কিন্তু কার্য্য হস্তের, হস্ত যেখানে থাকে, কার্য্য সেখানে থাকে। কার্য্য করিলাম কিন্তু হস্তের কার্য্য বলিয়া তাহা পৃথিবীতে রহিয়া গেল। আত্মা যখন পরলোক গমন করে, তখন তাহার সঙ্গে কি কোন কীর্ত্তি যায়? এখানকার প্রশংসা কি কখন আত্মার সহযোগী হইতে পারে? কার্য্য অতি সুন্দর মানিলাম, কার্য্যের অনুষ্ঠান দেখিয়া লোকের প্রশংসা ধরে না স্বীকার করা গেল, কিন্তু এ হস্ত যে কিছুই নয়, আত্মা চলিয়া গেল, হস্ত যে আর তাহার সঙ্গে গেল না। আত্মা পরলোকে গেল, কিন্তু কে বলিবে উহা বাহিরের কীর্ত্তি সঙ্গে লইয়া গেল? কর্ম্মীর ধন মান যেমন এখানে পড়িয়া রহিল কীর্ত্তিও তেমনই এখানে পড়িয়া থাকিল। সেই কীর্ত্তি দয়ালু ব্যক্তির সাক্ষী হইয়া এখানে রহিল, পরলোকে নহে। সাধুর নাম এখানে রহিল, কার্য্য রহিল তিনি গেলেন।

দয়া, ভালবাসা, মমতা, সদ্ভাব—পরোপকারের হেতু। কর্ম্ম ইহার প্রকাশ। লোকে কর্ম্মের প্রশংসা করিল, কিন্তু ঈশ্বর প্রশংসা করিলেন না। এখানে সাধুরও প্রশংসা হইল, অসাধুরও যশকীর্ত্তি হইল। যথার্থ প্রণয় যাহা স্বর্গে যাইবার মূল্য, উহা অতিন্দ্রীয় নিরাকার। প্রণয়ীর সঙ্গে সেই প্রণয় চলিল, ধনীর ধন সঙ্গে যাইতে পারিল না। শ্মশান কর্কশ স্বরে বলিল, তোমার বিষয় সম্পত্তি বাহিরের আড়ম্বর এখানে ছাড়িয়া যাও। সংসারী কিছুই সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিল না। সাধু একটী দ্রব্য সঙ্গে লইয়া গেলেন সেটী প্রণয়। ঈশ্বর উহার প্রশংসা করিলেন। আত্মার নিত্যধন ঈশ্বর গ্রাহ্য করেন, অনিত্য ধন নহে।

প্রণয় কি? যথার্থ "প্রণয়" অভিধানে পাই না। আত্মা স্বয়ং উহা দেখে, উহার মর্য্যাদা অনুভব করে। যে ভালবাসে না সে কিরূপে উহা বুঝিবে? যে অন্ধ তাহার নিকট অক্ষর কি শব্দ ও অর্থ প্রকাশ করিতে পারে? প্রণয়ের সুমিষ্ট রস পান কর, নতুবা সহস্র কথায় অর্থ করিলেও উহার কিছুই বুঝিতে পারিবে না। আলোকে সকল বস্তু প্রকাশ পায়, কিন্তু আলোককে কোন্ বস্তু প্রকাশ করিতে পারে? বাহিরের কার্য্য ভালবাসার প্রকাশ, কিন্তু কার্য্য কি ভালবাসা প্রকাশ করিতে সক্ষম? উহার একটী নিরাকার একটী সাকার। সাকার দ্বারা নিরাকার কিরূপে প্রকাশিত হইবে? হৃদয়ের সাধু ইচ্ছা ভালবাসা হইতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল, কিন্তু স্বয়ং সাধু ইচ্ছা ভালবাসা কি বিদ্যালয়ে তিষ্ঠিতে পারে? বিদ্যালয় দেখিয়া সংসার গৌরব দিল কিন্তু গৌরবের পাত্র কে? বাহিরের প্রকাশ অসার অস্থায়ী, উহা চেনা যায়, হৃদয়ের ভালবাসা বুঝা

যায় না। যাহা হইতে এই কর্ম্ম উৎপন্ন হইল, সেই অতলস্পর্শ প্রেমের পরিচয় বাক্যে কি দেওয়া যায়? দিন রাত্রি চেষ্টা করি, প্রিয়বন্ধুর উপকার সাধন করি, তবু তাহা প্রকাশ পাইল না। প্রেম অতীন্দ্রিয় সুন্দর বস্তু, হস্তে স্পর্শ করা যায় না, প্রেমিক সন্তানের হৃদয়ে তাহা বাস করে সেখানে গিয়া দেখিব। অভিধান, কথা, কার্য্য, অনুষ্ঠান, কিছুতেই উহা প্রকাশ করা যায় না। ভালবাসা আছে কি না দেখিবার জন্য নিজের হৃদয়ে কি প্রবেশ করি না? আমি কি হিতানুষ্ঠান সদালাপ করিয়া দুঃখ দূর করি না? বিবাদ চলিয়া যায় এ জন্য কি সভা করি না? ভ্রাতৃগণ! এ কথা বলিয়া কি তোমরা ভালবাসা বুঝাইয়া দিতে পার? বাহিরের অসার বিষয় দ্বারা যিনি ভালবাসা বুঝাইয়া দিতে চান তিনি মূর্খ। মানিলাম অজ্ঞানীকে জ্ঞান দেওয়া, রোগীকে সান্ত্বনা করা, দুঃখিতকে সুখী করা, দিবানিশি তোমার এই কার্য্য; এ সকলের জন্য স্বর্গ হইতে আমরা প্রশংসা পাই না, ঈশ্বর এ সকল দেখেন না, ইহার প্রশংসা করেন না। তিনি বাহিরের সমুদয় আড়ম্বর দূর করিয়া দিবেন। তিনি হৃদয়ের প্রণয় চান।

প্রেম আছে কি না লোকের মুখ দেখিলে বুঝিতে পারি। প্রণয়ীকে নিকটে বসাও, দৃষ্টি দ্বারা দর্শন-পথে আন, দর্শন করিবা মাত্র হৃদয়ে গভীর বেগ উথলিত হইবে, তবে জানিবে ভালবাসা আছে। সহস্র কার্য্যের দ্বারা সেবা কর, বন্ধু বলিয়া ডাক, অন্তরের যে বিশুদ্ধ ভাব তাহাকেই ভালবাসা বলি। ব্রহ্মরাজ্যে যাহার ক্রয় বিক্রয় হয়, উহা অকৃত্রিম ভালবাসা। প্রণয় কি বন্ধুত্ব কি এখনও আমরা তাহা জানিতে পাই নাই, আমাদিগকে প্রকৃত প্রণয় প্রকৃত

বন্ধুত্ব সঞ্চয় করিতে হইবে। যথার্থ প্রণয় যথার্থ বন্ধুত্ব না হইলে আমরা পরিবারকে কখনই সুখী করিতে পারিব না। বিশুদ্ধ প্রেম ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হয়। প্রেম যেমন তাঁহার, মানুষেরও তেমনই। ঈশ্বর যদি আমাদিগের জন্ত কার্য্য না করেন, অন্তর অন্ন পারে দেন, যদি কষ্টে পতিত হই, তবে কি কুটিল যুক্তি অবলম্বন করিয়া বলিব তাঁহার ভালবাসা অপূর্ণ? যদি তাঁহার সমুদয় কীর্ত্তি বিনাশ হয়, তথাপি তাঁহার ভালবাসা নাই এ কথা বলিব না। সাধু ভক্ত সম্বন্ধেও সেই প্রেম অন্তরে জন্মে, অন্তরে প্রস্ফুটিত হয়। যদি উহা বাহিরে প্রকাশ না পায়, কিছুমাত্র প্রকাশ না পায়, অন্তরে অন্তরে লুকাইয়া থাকে, তবে কি তাহা প্রশংসনীয়? বিশ্বাসীর মুখ দেখিবা মাত্র নিশ্চিতরূপে অভ্রান্তরূপে প্রেম জানিতে পারা যায়। শত্রুকে দেখিলেই বুঝিতে পারি প্রেম নাই, বন্ধু মাতা ভ্রাতাকে দেখিলে তাঁহাদিগের আকৃতি জানাইয়া দেয় প্রেম আছে। যিনি কার্য্য দ্বারা প্রেম প্রকাশ করিতে যান, তিনি প্রেম শেখেন নাই। জগতের অনিত্য বস্তু দ্বারা কি স্বর্গের বস্তুর তুলনা হয়?

প্রবল বেগে প্রেমের স্রোত আসিতেছে। সমুদ্রের তরঙ্গ, কোথায় থাকে স্বার্থপরতা? অমুক আমার অপমান করিল, অমুক আমাকে উপেক্ষা করিল, তবে কেন তাহাকে প্রেম দিব? প্রেমস্রোতের জীবন-মুখে নিঃক্ষেপ কর, বিবাদ বিঘ্ন দূর করিয়া দিয়া উহা আপনার পথ পরিষ্কৃত করিয়া চলিতে থাকিবে। যত মুখ দেখিবে, তত ভাকাইবে, দ্বিগুণ ত্রিগুণ চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইবে, যতবার দর্শন ততবার বৃদ্ধি, ক্রমাগত বৃদ্ধি। আজ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এরূপ অবস্থা নাই, এখন যে প্রেম আছে উহা শেষ হইবে। ব্রাহ্মেরা বলিবেন, আমাদের

প্রেমের প্রস্ফুটিত ভাব হইয়াছে, আর অগ্রসর হইতে চাই না। যাহারা এইরূপ ভাবে, প্রেম কি তাহারা জানে না। মাসে মাসে বৎসরে বৎসরে প্রেমের বৃদ্ধি হয়। দশ বৎসরে দশ সহস্র গুণ প্রেমের যদি বৃদ্ধি না হইল, প্রেমের মিষ্টরসে যদি মন অভিষিক্ত না হইল, তবে আমি সত্যকে সাক্ষী করিয়া বলিতে পারি না, প্রেম আছে। এতদিন অভিধানে প্রণয় বলিয়া যাহা শিখিয়াছ, তাহা দূর করিয়া দাও। প্রেম কার্য্যের অতীত, অতীন্দ্রিয়, উহা স্বর্গধামে যাইবে। যে প্রেমিক তাহার আপনার মনই স্বর্গ। যিনি এক জনকেও ভালবাসেন, তিনি দেখিবেন ভালবাসা আর স্বর্গে যাওয়া এক। ভালবাসিয়া সুখী হইলাম না ইহা হইতে পারে না। যে প্রণয় সংসারের তাহার সীমা আছে, পরিমাণে উহা আর বৃদ্ধি পায় না, স্থির হইয়া যায়। স্বর্গীয় প্রেম তেমন নহে, উহার বৃদ্ধি ক্রমাগত বৃদ্ধি হইবেই হইবে।

ব্রাহ্মগণ! তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, যত তোমরা পরের মুখ দেখ, ততই কি তাহাকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে পার? যদি তোমাদের এরূপ হইয়া থাকে, মুখ দেখিলেই বুঝিতে পারিব। তোমাদের মধ্যে এখনও তেমন মুখ দেখিতে পাই নাই। এখনও নিগূঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব প্রকাশিত হয় নাই, ঈশ্বরের উপাসনা এখনও তেমন প্রগাঢ় হয় নাই। মুখের দিকে তাকাইয়া আনন্দনীরে ভাসিব, অন্তরে মুখ দেখিয়া প্রেম-সাগরে ডুবিব, ইহা যদি না হইল ভক্তি কোথায়? যেখানে প্রেম আছে বাহিরে কোন সেবা করিলে না, অনুষ্ঠান করিলে না তবু আনন্দ। ভক্তি আপনা হইতে কার্য্য করিয়া লয়, যত্ন চেষ্টা করিয়া কার্য্য করিতে হয় না। স্তব স্তুতি

করিয়া ব্রহ্মের মন ভুলাইতে পার না। পরোপকারের কীর্ত্তি প্রতারণা, স্বয়ং ঈশ্বর ভালবাসা চান। হৃদয়বন্ধুর ছবি রহিয়াছে; অনিমেষ নয়নে দেখিলাম, পাঁচ মিনিটের মধ্যে বুঝিতে পারিলাম বন্ধুর সঙ্গে প্রণয়ের মিল আছে কি না। যদি না থাকে, ক্রমাগত হৃদয়ে রাখিয়া উপাসনা দ্বারা প্রণয় বৃদ্ধি করিয়া লইব। দর্শনে প্রেম, তাহা না হইলে বিশ্বাস করিব না হৃদয়ে ভালবাসা স্থান পাইয়াছে।

সাহাপুর ব্রাহ্মসমাজ।

প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসব।

পরলোকের সম্বল। *

শনিবার, ৩০শে ফাল্গুন, ১৭৯৬ শক; ১৩ই মার্চ্চ, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

কি সত্য কি অসত্য ইহা অনায়াসেই বুঝা যায়। যথার্থ বস্তু কি? কৃত্রিম বস্তু কি? ইহা তর্ক করিয়া বুঝিতে হয় না। কোন্ বস্তু সৎ কোন্ বস্তু অসৎ মনুষ্য স্বাভাবিক শক্তি দ্বারা বুঝিতে পারে। এই অল্পক্ষণ পূর্ব্বে আমরা সংসারকার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম। সংসারে কত মনোহর দৃশ্য কত সুখের বস্তু সকল মনুষ্যের হৃদয়কে আকর্ষণ করে। কিন্তু যে চক্ষু সংসারের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হয়, সেই চক্ষুকে একবার বল দেখি, চক্ষু, তুমি মুদিত হও। তোমার

ইচ্ছানুসারে সেই চক্ষু মুদ্রিত হইল, এমন যে সুন্দর পৃথিবী এবং এত যে ইহার বিপুল সম্পত্তি, এবং সেই যে ইহার মহাগোলযোগময় কোলাহল কোথায় চলিয়া গেল। চারিদিকে কেবল অন্ধকার, কেবল অন্ধকারের রাজ্য। সেই পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগ্নী, বন্ধু বান্ধব ঘোর অন্ধকার-সাগরে ডুবিল। নিজের সেই সুন্দর শরীর যাহার উপর এত আশা, ভরসা ও অহঙ্কার রাখিতাম, সেই শরীরও বিলুপ্ত হইল। চক্ষু মুদ্রিত করিলে এত বিনয়ের কারণ উপস্থিত হয়। এক সময় বলি এত লোক আমাদের, এত ধন মান আমাদের, আর এক অবস্থায় বলি এ সকলই অসার, ইহাদের কিছুরই স্থিরতা নাই। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রতিজনকে ক্ষমতা দিয়াছেন যাহা দ্বারা আমরা প্রকৃতরূপে সদসৎ বুঝিতে পারি।

যথার্থ সার সত্য কি? যাহা পরলোকে সঙ্গে যাইবে। জ্ঞানীরা ইহা বুঝিতে পারেন। সেই সার বস্তু কোথায় পাইব? ভিতরে। মনের ভিতরে একখানি স্বর্গ, একটী বৈকুণ্ঠধাম আছে। সেখানে সাধুভাব, সত্য, ক্ষমা, দয়া ইত্যাদি আছে। সেখানে গিয়া যদি প্রতিদিন এ সকল অক্ষয় ধনরত্ন সম্ভোগ ও সঞ্চয় করিতে পারি, তবে জানিলাম, এতকাল যে পৃথিবীতে ছিলাম পরলোকের সম্বল করিয়াছি। যাহারা এ সকল ধন ভুলিয়া বাহিরে বস্তু পাইয়া ভুলিয়া যায়, তাহারা আত্মপ্রবঞ্চিত হইতেছে, তাহারা সে সকল ব্যক্তিকে বন্ধু বলিতেছে যাহারা ছাড়িয়া যাইবে। এইজন্যই ধনীর সন্তানেরা এই বলিয়া কাঁদিতে থাকে যে, আমাদের ধন বিষয় থাকে না; এইজন্য রাজারা এত রাজত্ব পাইয়াও কাঁদে; এবং বাহিরে যাহাদের দুঃখের কিছুমাত্র কারণ নাই তাহারাও দুঃখী হয়, কিন্তু যাহারা ভিতরের ধন সঞ্চয় করেন এবং বাহিরে

তাঁহাদের কোন প্রকার সুখের আয়োজন নাই, সামান্য শাকান্ন আহার করেন এবং পর্ণকুটীরে বাস করেন, এবং যাঁহারা বন্ধু কুটুম্ব বিহীন হইয়া একাকী থাকেন, সেই গরিব ধার্ম্মিকদিগকে জিজ্ঞাসা কর তাঁহারা সুখী না দুঃখী! তাঁহারা বলেন, আমাদের ধন নাই যাহা চক্ষে দেখা যায়; কিন্তু চক্ষু মুদ্রিত করিলে আমরা অক্ষয় ধন দেখিতে পাই। আমাদের মনের ভিতর এমন রত্ন আছে যাহা রাজারও নাই। আর তাঁহারা দুঃখের সহিত বিষয়ীদিগকে এই কথা বলেন, তোমরা যাহা লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছ, পৃথিবীর এ সকল রত্ন ও বন্ধুগণ পড়িয়া থাকিবে। এই জানি যে সাধু যাঁহারা তাঁহারা সুখী হন, ঘোর বিষয়ীরা ভূতলে পড়িয়া ক্রন্দন করেন।

সাধু যিনি তিনি অন্তরের অন্তরে স্বর্গ দেখিতে পান। তাঁহার ধন মান বাহিরে নহে; কিন্তু ভিতরে। যখন নিমীলিত নয়নে তিনি ঈশ্বরের দিকে তাকাইয়া থাকেন, তখন তিনি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সুখধাম দেখিতে পান। যদি হৃদয়ের ভিতরে গিয়া অন্ধকার দেখিলে, তবে হে মনুষ্য, এতকাল তুমি কি করিলে? সেই হৃদয়ের ভিতরে যদি কেবল পাপ এবং অধর্ম্ম থাকে তবে তোমাকে কাঁদিতে কাঁদিতে এই পৃথিবী ছাড়িতে হইবে। পাছে পাপান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া চিরকাল তাঁহার সন্তানদিগকে কাঁদিতে হয়, এইজন্য দয়াময় পরমেশ্বর আমাদিগকে তাঁহার উপাসনা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। কি পর্ব্বতের উপরে কি নদীতটে বসিয়া যেখানেই উপাসক ঈশ্বরকে ডাকেন, সেখানেই ঈশ্বরের প্রেমনদী বহিতে থাকে। তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কত আশ্চর্য্য সুন্দর বস্তু সকল দেখেন। পরলোক তাঁহার নিকট দূর নহে। দেবলোক কোথায়? যেখানে ঈশ্বরকে দেখা

যায়। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যদি তোমরা দয়াময় বলিয়া একবার ডাক, এখানেই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। পরম আনন্দের সমাচার যে, পরমেশ্বর স্বয়ং আসিয়া পাপীর হৃদয়দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন। যাঁহারা ইহাঁকে দেখিলেন তাঁহাদের ধনরত্ন চিরকালের জন্য সঞ্চিত হইয়াছে। তোমরা যখন পরমেশ্বরকে দেখ তখন তোমাদের কত সুখ! অতএব সংসারের জঘন্য আমোদে আর মুগ্ধ হইও না।

প্রকৃত বিশ্বাসী বাহিরে ঘর নির্ম্মাণ করেন না, বাহিরের ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করেন না, এইজন্য সকলেই বলে ইহার ঘর নাই, ইহার সম্পত্তি নাই; কিন্তু ব্রহ্মসাধক যিনি, এমন ঘর নির্ম্মাণ করেন, যাহা চিরকাল থাকিবে, এবং সেই ধন সংগ্রহ করেন, যাহা অনন্ত এবং অক্ষয়। অতএব তোমরা সকলেই সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় হও। পরমেশ্বর কি সুখ সন্তোষ দিতে পারেন না? লোকদের কুটিল যুক্তি শুনিও না। সংসার ছাড়িবে, পৃথিবীর ধন মান স্ত্রী পুত্রাদিকে ভাসাইয়া দিয়া অরণ্যে যাইবে, পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম এই উপদেশ দেন না; কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের এই আদেশ, অনাসক্ত হইয়া স্ত্রী পুত্রের সেবা করিবে, সকলের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন করিবে। ভৃত্যের ন্যায় রোগীর সেবা করিবে, পরোপকার করিবে, নির্ধনকে ধনী করিবে, কিন্তু সাবধান সংসারের দাসত্ব করিবে না। সেই স্নেহময়ী মাতার উপরে প্রাণ সমর্পণ করিবে। প্রাণেশ্বর যিনি তাঁহারই কেবল প্রাণের উপর অধিকার আছে। তাঁহাকে প্রাণ মন দিলে এত সুখ তিনি দিবেন যে তোমরা মোহিত হইবে। স্বর্গ কি? এখনও তোমরা এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? এইজন্য যে তোমরা এখনও যথার্থ সাধন অভ্যাস আরম্ভ কর নাই। ঈশ্বর এত আয়োজন করিতেছেন

বঙ্গদেশের জন্য, সন্তানদিগকে চারিদিকে বসাইয়া সুখ-সাগরে ভাসাইবার জন্য। নর নারী, এমন অমূল্য সময় তোমরা অবহেলা করিও না। প্রাণ মন ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ কর, তিনি নিশ্চয়ই তোমাদের সদ্গতি করিয়া দিবেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

বৈরাগী ঈশ্বর।

রবিবার, ১লা চৈত্র, ১৭৯৬ শক; ১৪ই মার্চ্চ, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

পৃথিবীর পথে বৈরাগীর অভাব নাই। জগৎ সংসার এত নীচ বটে; কিন্তু জগতের পথে বৈরাগীর অভাব নাই। ইহাতে অনেক পাপ অনেক কলঙ্ক আছে বটে, এবং মনুষ্যের মন পাপে অচেতন হইয়াছে ইহা স্বীকার করি, তথাপি দুষ্ট পৃথিবীর মধ্যেও বৈরাগীর অভাব নাই; কিন্তু সুখী বৈরাগী অল্প। যাহাদের মুখ ম্লান, যাহারা কষ্ট পায় এমন বৈরাগী অনেক; কিন্তু যাহারা সুখ পায়, যাহাদের মুখ প্রসন্ন এমন বৈরাগী কৈ? বিরক্ত মনে স্ত্রী পুত্র সমুদয় জলাঞ্জলি দিয়া যে ব্যক্তি অরণ্যে চলিয়া যান জগতের অভিধানে তিনিই বৈরাগী নাম ধারণ করেন। এরূপ লোক অনেক আছে, ইহাদের সংখ্যা অল্প নহে। বিষণ্ণ বৈরাগী অনেক; কিন্তু প্রসন্ন বৈরাগী অল্প। শরীর ক্ষুধা তৃষ্ণায় মৃতপ্রায়, তথাপি ইহাকে অন্ন জল দিব না, রোগে তে প্রাণ যায় তথাপি ঔষধ সেবন করিব না, যৌবনকালে

অনেক সুখভোগ করিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু একটী সুখও গ্রহণ করিব না, জনসমাজে গিয়া বন্ধুতার সুখ আস্বাদ করিতে লালসা হয়, কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক একাকী থাকিয়া মনকে সেই সুখে বঞ্চিত করিব। জ্ঞানের জন্য সহজেই মনে কৌতূহল উপস্থিত হয়; কিন্তু মনকে জ্ঞানের সুখ দিব না। ভাল খাওয়া, ভাল পরা, সকলই ছাড়িয়া দিব, গৃহের পরিবর্ত্তে শ্মশানে বাস করিব প্রতি নিমেষে সকল প্রকার সুখের কামনাকে বিদ্ধ করিব। যখন এইরূপে আত্মনির্যাতন করিতে পারিব তখন আমরাও আপনাদিগকে বৈরাগী বলিব, লোকেও আমাদিগকে বৈরাগী বলিবে। মূঢ় মন! কৃত্রিম বৈরাগ্য প্রশংসায় ভুলিয়া গেলে? কিন্তু এই বিকৃত বৈরাগ্য আত্মাকে সুখ দিতে পারে না। প্রকৃত বৈরাগীর পূর্ণ আদর্শ পৃথিবীতে নাই। পৃথিবীতে সর্ব্বত্যাগীরা বৈরাগ্যের যে সকল উৎকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন সে সমুদয় অনুসরণ করিলেও যথার্থ বৈরাগ্য হয় না।

ব্রাহ্মের বৈরাগ্যের আদর্শ স্বর্গে। তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার ঈশ্বর কি বৈরাগী? কিন্তু তাঁহার স্বভাব দেখিলে তোমরা বুঝিতে পারিবে তাঁহার মত পূর্ণ এবং প্রকৃত বৈরাগী আর কেহ নাই। এই যে সুখময় সংসার ইহা কি তিনি নিজের সুখভোগের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন? তাঁহার যত কিছু কার্য্য দেখিতেছি সমস্ত তাঁহার সন্তান-দিগকে সুখী করিবার জন্য। ঈশ্বর আজ্ঞা করিলেন সুখ সৃষ্ট হউক, আর তৎক্ষণাৎ সুখ সৃষ্ট হইল। তিনি বলিলেন, আমার সন্তানদিগের জন্য সহস্র সুখের প্রস্রবণ উন্মুক্ত হউক, আর তখনই সহস্র সুখের প্রস্রবণ প্রবাহিত হইতে লাগিল। সন্তানদিগকে সুখী করিলেন; কিন্তু তিনি সেই সমুদয় সুখের মধ্যে থাকিয়াও নির্লিপ্ত রহিলেন। তিনি

চিরকাল উদাসীন রহিয়াছেন, সন্তানদিগকে যে সকল সুখ দিতেছেন তাহার একটী সুখভোগ করিবার জন্যও তাঁহার লোভ হয় না। ঈশ্বর আপনার আনন্দে আপনি মগ্ন, এ সকল সুখ লইয়া তিনি কি করিবেন? সমস্ত দিন, সমস্ত মাস, সমস্ত বৎসর পরের সুখের জন্যই ব্যস্ত রহিয়াছেন। সমস্ত জগৎকে সুখের সাগরে ভাসাইতেছেন; নিজে সে সকল সুখে নির্লিপ্ত রহিয়াছেন। কিন্তু সংসারের সুখ লইলেন না বলিয়া কি ঈশ্বর দুঃখী হইলেন? ভাণ্ডার নিঃশেষিত হইল বলিয়া কি ভাণ্ডারী দুঃখী হইলেন? অজস্রধারে সুখ বিতরণ করিলেন বলিয়া, যিনি অনন্ত সুখের প্রস্রবণ তাঁহার কি দুঃখ হইল? স্বর্গের আনন্দে যাঁহাকে আনন্দিত করিয়া রাখিয়াছে, পূর্ণতা যাঁহার স্বভাব, দুঃখ অভাব কি তাঁহার পক্ষে সম্ভব? নিজেই যিনি সুখ, যাঁহার স্বভাবই পূর্ণানন্দ, যাঁহার এক নামই সদানন্দ। সন্তানেরা তাঁহার প্রাণ হইতে সকল সুখ কাড়িয়া লইয়াছে এইজন্য কি তিনি দুঃখী?

অতএব যদি প্রকৃত বৈরাগী হইতে চাই, তবে পিতার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতেই হইবে। পরস্পরের সুখের জন্য ব্যস্ত হইতে হইবে। পরদুঃখে সুখী হইব না, পরসুখে দুঃখী হইব না; কিন্তু পরের দুঃখ দূর এবং সুখ বৃদ্ধি করিবার জন্য নিত্য চেষ্টা করিব। কিন্তু পরকেই কেবল সুখী করিব, নিজে কি দুঃখী থাকিব? না। যথার্থ বৈরাগী যিনি তাঁহার দুঃখ নাই। তিনি নির্লিপ্তভাবে পরকে সুখ দান করেন। ঈশ্বর আমাদিগকে সকল প্রকার সুখই দিতেছেন। তিনি ত কেবল ধর্ম্ম দেন না, তিনি যে আমাদিগকে ধন, অন্ন ইত্যাদি সামান্য সামান্য বস্তু সকলও দান করিতেছেন, সেইরূপ ব্রাহ্ম যাঁহারা তাঁহারাও আর সকলকে মান, মর্য্যাদা ইত্যাদি দিয়া নানাপ্রকার

সাংসারিক সুখেও সুখী করিবেন। ঈশ্বর যখন তাঁহার সন্তানদিগকে এ সকল সুখ দিতেছেন, তখন আমরা কিরূপে পরস্পরকে সে সকল সুখ দিতে কুণ্ঠিত হইব? আমরা অন্তকে সুখ দিব কিন্তু তন্মধ্যে লিপ্ত থাকিব না।। নির্লিপ্তভাবে দাতা হইবে, ঈশ্বরের এই আজ্ঞা, তাঁহার দৃষ্টান্ত একপ্রকার। অন্তকে যদি রাজা করিতে পারি নিজে প্রজা হইব। বিষয়ের সকল সুখ অপরকে দিব যাহারা সেই সুখের জন্ত লালায়িত। দাতা হইলাম, নির্লিপ্ত হইলাম বটে, কিন্তু নিজে কি সুখী হইলাম? অন্যের ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে গিয়া নিজে কি অতীন্দ্রিয় সুখ পাইলাম? অপরকে সুখী করিতে গিয়া আমরা যদি নিজে সুখী না হই, সেই বৈরাগ্য কেবল কষ্টের কারণ। অন্তকে সুখী করিবার জন্ত, জীবন, সুস্থতা এবং প্রাণের শেষ রক্ত পর্য্যন্ত দিলাম; কিন্তু আমার অন্তরে দুঃখ থাকিবে না। নির্লিপ্তভাবে পরসেবা করিলাম বটে; কিন্তু যতই পরের সুখের জন্ত নিজের সুখ পরিত্যাগ করিলাম, ততই অন্তরে গভীরতর সুখ সম্ভোগ করিতে লাগিলাম। অন্তের সুখ বর্দ্ধন করিতে গিয়া অকারণে আমরা কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করিব ইহা ঈশ্বরের ধর্ম্ম নহে। উপবাস করিয়া কষ্ট পাইয়া শরীরকে শুষ্ক করিতে হইবে ইহা মনুষ্যের কৃত্রিম ধর্ম্ম। দুঃখের সাগরে নিমগ্ন করিবার জন্ত ঈশ্বর আমাদের হস্তে তাঁহার ধর্ম্মরত্ন দান করেন নাই; কিন্তু তিনি যেমন চিরপ্রসন্ন আমাদিগকেও সেইরূপ চিরপ্রসন্ন করিবার জন্ত তিনি যথার্থ বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে আদেশ করেন। বৈরাগ্য দ্বারা যে আমরা কেবল সুখ ছাড়ি তাহা নহে; কিন্তু ইহা দ্বারা আমরা অনন্ত সুখের রাজ্যে প্রবেশ করি।

ত্যাগস্বীকার যিনি অনুভব করেন তিনি প্রকৃত বৈরাগী নহেন। যিনি মনে করেন আমি ত্যাগস্বীকার করিলাম তিনি যথার্থ ধার্ম্মিক নহেন। উচ্চ ধর্ম্মজীবনসম্পর্কে ইহা পাপ। যথার্থ বৈরাগী কিছুই ত্যাগ করেন না, বরং তিনি লাভ করেন। তিনি দিলেন কি? প্রাণ। পাইলেন কি? অনন্ত প্রাণ। ইহা কি ক্ষতি? বৈরাগী ক্ষতিগ্রস্ত হন না। জগৎকে সুখী করিয়া যিনি আপনাকে দুঃখী মনে করেন তিনি বৈরাগী নহেন। যথার্থ বৈরাগী যতই অপরকে সুখ দান করেন, ততই তিনি পুণ্য এবং সুখ শান্তি সঞ্চয় করেন। লোকে বলে তিনি দিতেছেন; কিন্তু বাস্তবিক তিনি লাভ করিতেছেন। ঈশ্বরের ভাণ্ডারে যেমন "দাও, দাও, কিছুই রাখিও না," নিত্য এই মহাবাক্য উচ্চারিত হইতেছে, প্রকৃত বৈরাগীরও সেই বাক্য। ব্রহ্ম এত দিতেছেন তথাপি তাঁহার কিছুরই শেষ হইতেছে না কেন? যিনি অনন্ত সুখের সমুদ্র, দান করিলে কি তাঁহার প্রেমজলের শেষ হয়? সেইরূপ ব্রহ্ম-সন্তান যিনি সেই সমুদ্রে সাঁতার দিতেছেন, তিনি ব্রহ্মকে দৃষ্টান্ত করিয়া কেবলই বিতরণ করিতেছেন। সেই সুখী বৈরাগীকে দেখিলে মনে আনন্দ হয়, অতএব তোমরা বিষণ্ণ বৈরাগী হইবে না; কিন্তু প্রসন্ন বৈরাগী হও। দানের সামগ্রী ক্রমাগত অন্যকে দাও, কিন্তু যতই দিবে দেখ যেন তোমাদের হৃদয়ের আনন্দ ক্রমশঃ ততই বৃদ্ধি হয়। ব্রাহ্মদিগের ভিতরে এমন বৈরাগী কোথায়? দুই পাঁচটী বিষয়সুখ বিসর্জ্জন করিলাম ইহাতে ব্রাহ্মসমাজের প্রশংসা হইল সত্য, কিন্তু অন্তরে কেবল ক্ষতি স্বীকার করা হইল। ইহা কি প্রকৃত বৈরাগ্যের লক্ষণ? ঈশ্বরের ন্যায় নির্লিপ্ত, নিষ্কাম এবং বাসনাশূন্য

হইয়া, যথার্থ প্রীতির সহিত যখন তোমরা তোমাদের প্রিয় সামগ্রীগুলি অন্যকে দিয়া সুখী করিতে পারিবে, তখনই তোমরা প্রকৃত বৈরাগীদিগের শ্রেণীমধ্যে পরিগণিত হইতে পারিবে।

পৃথিবীর উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া যাহারা মনুষ্যের প্রতি বিরক্ত হইয়া বৈরাগী হয় তাহাদের রুদ্রমূর্ত্তি দেখিলে আমাদের দুঃখ হয়। যথার্থ বৈরাগী চিরপ্রেমিক, ভালবাসার পদ্ম সর্ব্বদাই তাঁহার দুই চক্ষে প্রস্ফুটিত। সংসারের বৈরাগী পৃথিবী হইতে সুখ লইবে না, পৃথিবীকে সুখী হইতেও দিবে না। ব্রাহ্মবৈরাগীকে পৃথিবী মারিতে চায়; কিন্তু তিনি চান যে পৃথিবী বাঁচুক। তিনি আপনার প্রাণ দিয়াও পৃথিবীর পরিত্রাণ এবং কল্যাণ সাধন করেন। ঈশ্বর যেমন আপনার সমস্ত ঐশ্বর্য্য দিয়া সন্তানদিগকে সুখী করেন, তাঁহার সন্তানও তাঁহার সেই সর্ব্বোচ্চ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। ঈশ্বর যেমন ভালবাসার সহিত সকলের দ্বারে দ্বারে গিয়া সুখ দেন, ব্রাহ্মবৈরাগীও সেইরূপ নিষ্কাম হইয়া জগতে প্রেম বিতরণ করেন। পৃথিবীর লোকদিগের নির্যাতনে উৎপীড়িত হইলে মেঘোন্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার মুখশ্রী আরও উজ্জ্বল এবং সুন্দর হইয়া উঠে। যাঁহার প্রাণের মধ্যে স্বর্গের প্রসন্নতা, এবং স্বর্গের আনন্দ, বাহিরের লোক তাঁহাকে শরশয্যায় ফেলিলে তাঁহার কি হইবে? আনন্দ যাঁহার হৃদয়ে চিরপদ্মের ন্যায় প্রস্ফুটিত, তাঁহাকে কে দুঃখ দিতে পারে? এমন বৈরাগী কোথায়? ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন আমরা যে কয়দিন এই পৃথিবীতে থাকিব, আমরা যেন আমাদের নিজের নিজের জীবনে এই বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারি। তাহা হইলে এই পৃথিবীতেই যথার্থ সুখের অবস্থা, প্রফুল্লতার অবস্থা দেখিব।

হে ঈশ্বর, যতই তোমার বিষয় ভাবি, ততই অবাক হই। এতকাল মনে করিতাম, যে ব্যক্তি একটু সুখ ছাড়িত সে বৈরাগী। কিন্তু তোমার মত বৈরাগী কে আছে? কৈ ঈশ্বর! দিলে ত সকল সুখ, কিন্তু একদিনও তোমার মুখ ম্লান দেখিলাম না। কৃপণ ত কখনও হইলে না। দাও, দাও, এই কথা তোমার স্বর্গরাজ্যে সর্ব্বদা উচ্চারিত হইতেছে। প্রেম বিলাইতেছ অপমান সহ্য করিয়া। দেখ পিতা, তোমার মধুর ব্যবহার আর আমাদের কঠোর ব্যবহার। প্রকৃত বৈরাগ্য-পথ অনুসরণ করিতে আমাদিগকে শিক্ষা দাও। কিসে ভাই ভগ্নী ভাল থাকিবেন এইজন্য যেন আমরা ভাবি, এইজন্য যেন আমরা যত্ন করি। হে বৈরাগী পিতা, তুমি যেমন সকলকে সুখী করিবার জন্য বিস্তীর্ণ জগৎ বিস্তার করিয়াছ, আমরা যেন পরস্পরকে তোমার পবিত্র সুখে সুখী করিবার জন্য ব্যস্ত হই এই অশীর্ব্বাদ কর। রসশূন্য সুখশূন্য বৈরাগ্য লইয়া আপনাদিগকে এবং অন্যকে আর নির্যাতন করিতে দিও না। শান্তিপূর্ণ বৈরাগ্য লইয়া তোমার স্বর্গের অসীম সুখ সম্ভোগ করিয়া আমরা যাহাতে চিরসুখী হই, হে ব্রহ্মমন্দিরের দেবতা, তুমি আমাদের এই আশা পূর্ণ কর।

বৈরাগী পরিবার।

রবিবার, ৮ই চৈত্র, ১৭৯৬ শক; ২১শে মার্চ্চ, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

যখন স্বর্গীয় ব্রাহ্মধর্ম্ম ভূতলে জন্মগ্রহণ করিল, তখন কি ইহার কোমল হস্তে কেহ অস্ত্র দেখিয়াছিল? যখন প্রথম ব্রহ্মমন্দির এই

পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন কি ইহা জগতের পুরাতন ধর্ম্ম বিনাশ করিবার জন্য সংহারকর্ত্তার বেশ ধরিয়া আসিয়াছিল? কে বলিতে পারে এই বর্ত্তমান বিধান পুরাতন বিধান সকল বিনাশ করিবার জন্য আসিয়াছিল? তোমরা কি জান না, পূর্ব্বকালে মহাত্মাদিগের হৃদয়ে যে সকল উচ্চতম পবিত্র আশা উদিত হইয়াছিল সে সমুদয় আশা পূর্ণ করিবার জন্য স্বর্গ হইতে আনন্দবীণা বাজাইতে বাজাইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম আসিল? বিনাশ করা ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু পূর্ণ করাই ইহার উদ্দেশ্য। জগতের সৃষ্টি অবধি আজ পর্য্যন্ত যত জাতি, যত ধর্ম্মসম্প্রদায় এবং যত সাধুর জন্ম হইয়াছে, তাঁহাদের সমুদয় আশা পূর্ণ হইবে, যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম জগতের এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা বিনষ্ট হইবে যদি পৃথিবীতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। বস্তুতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের যে দুর্জ্জয় বল তাহা যদি প্রকাশিত হয়, এ জগতে আর পাপ দুঃখ থাকিবে না। এক্ষণে প্রশ্ন এই, এই ধর্ম্ম পূর্ণ হইবে কি উপায়ে? পুরাতন বিধি সকল বিনষ্ট করিবে না; কিন্তু সমুদয় একত্র করিয়া সংযোগ করিবে। সংসারী যেমন সংসারের সকল প্রকার সুখ একত্র করিয়া সংযোগ দ্বারা নিজের মনের মত একটী সুখের ছবি অঙ্কিত করে, ব্রাহ্মধর্ম্মও সেইরূপ সমুদয় বিধানের সার সত্য সকল সঙ্কলন করিয়া জগতের জন্য একটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ধর্ম্মজীবনের আদর্শ প্রস্তুত করেন। সংসারী ব্যক্তি আপনার কল্পনাপক্ষীকে পাঠাইয়া, কাহার বাড়ীতে গাড়ী ঘোড়া, কাহার নিকট বিপুল সম্পত্তি, সংসারের লাবণ্য কোথায় অতি আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশিত, সংসারের সূর্য্য কোন্ দেশে অত্যন্ত প্রবলভাবে আপনার তেজ বিস্তার করিতেছে, সংসারের সুখ কোন্

স্থানে গভীর অতলস্পর্শ সাগরের ন্যায় আপনাকে অসীম বলিয়া পরিচয় দিতেছে, এ সকল তত্ত্ব অন্বেষণ করে। যেখানে যত সুন্দর বস্তু এবং সুখের ব্যাপার আছে, কল্পনাপক্ষী দ্বারা সমুদয়ের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া সংসারী ব্যক্তি একটী বিচিত্র ছবি অঙ্কিত করে। এইরূপে কল্পনা যখন চরিতার্থ হইল, সংসারী কিরূপে সেই সুখে সুখী হইবে তজ্জন্য ব্যস্ত হয়। তখন সেই সকল সুখের স্বপ্ন পূরণ করিবার জন্য সংসারী তাহার বুদ্ধি এবং হস্ত পদাদি পরিচালন করিতে চেষ্টা করে। কোন্ পথে গেলে সেই সমুদয় সুখ লব্ধ হয় ব্যাকুল হইয়া তাহাই জিজ্ঞাসা করে। সংসারী এইরূপে কেবল সুখের স্বপ্ন এবং কল্পনাই দেখে। এতগুলি সামগ্রী এই প্রকারে সংযোজিত না হইলে তাহার সুখ হইল না। তাহার এই কল্পিত নূতন ছবি অনুসারে পৃথিবীতে কেহই সুখী হয় নাই; কিন্তু সে সমুদয় সুখের সামগ্রী যদিও এক স্থানে কিম্বা এক সময়ে দেখা যায় না, তথাপি সে সমুদয় সুখ আংশিকরূপে, হয় এই দেশে নতুবা অন্য দেশে, এই সময়ে নতুবা অন্য সময়ে ছিল। কল্পনাপক্ষী সংসারে গিয়া যে সকল সুখের দৃষ্টান্ত আহরণ করে, সে সমুদয়ই পৃথিবীর বস্তু। সেই পুরাতন ব্যাপার সকল লইয়াই কল্পনা, একটী নূতন ছবি চিত্রিত করে এই মাত্র। সেই ছবিই সংসারী ব্যক্তির সুখের স্বপ্ন। সংসারীর স্বপ্ন পূর্ণ হয় কি না তাহা আর বিস্তারিতরূপে বলিবার প্রয়োজন নাই। সংসারীর সুখের স্বপ্ন এখানেই শেষ হউক।

এক্ষণে সত্যধর্ম্মের রাজ্যে প্রবেশ করি। সেখানে দেখি, পৃথিবীতে যেমন সংসারী সুখের জন্য ব্যস্ত, ধার্ম্মিকও সেইরূপ ব্যাকুল হইয়া

ধর্ম্মের সুখ অন্বেষণ করিতেছেন। আমরা ব্রাহ্ম, আমরাও সুখ চাই। আমরাও ইচ্ছা করি যে, বর্ত্তমান বিধানের অনুগত হইয়া সুখী হই। আমাদের সুখের পূর্ণ আদর্শ কি? সমুদয় ছাড়িয়া যদি আমরা বৈরাগী হই তবে কি আমাদের আনন্দ হয়? যাহাদিগকে বাল্যকাল হইতে পিতা মাতা, ভাই ভগ্নী, বন্ধু বান্ধব বলিয়া ভালবাসিয়া আসিতেছি, তাঁহাদিগকে ছাড়িলে, না তাঁহাদিগের সঙ্গে থাকিলে সুখী হইব? ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া, না ধর্ম্মপুস্তকাদি বিসর্জ্জন দিয়া, কেবল ভক্তের মুখের সৌন্দর্য্য দেখিলেই কি সুখী হইব? আমাদের সুখের আদর্শ কি? কি হইলে, ব্রাহ্ম, তুমি সুখী হও? যথার্থ ব্রাহ্ম আংশিক ধর্ম্ম এবং আংশিক সুখ লইয়া তৃপ্ত হইতে পারেন না। তিনি বলেন পৃথিবীর যত স্থানে যত প্রকার ধর্ম্মের সুখ হইয়াছে সেই সমুদয় আমি চাই। বর্ত্তমান বিধানও ঠিক সেই সমুদয় আশা পূর্ণ করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছে। বর্ত্তমান বিধান কাহাকে বলি? যাহাতে দেখি সমুদয় পুরাতন বিধানের পূর্ণতা হইতেছে। জগতের সৃষ্টি অবধি আজ পর্য্যন্ত ব্রহ্মপরায়ণ সাধকেরা যত প্রকার যথার্থ ধর্ম্মের সুখ সম্ভোগ করিয়াছেন, যে বিধান অবলম্বন করিলে সেই সমুদয় সুখের আশা পূর্ণ হয় তাহাই এই বর্ত্তমান বিধান। পুরাতন বিধান সকল বিনাশ করিবার জন্য নহে; কিন্তু সেই সমুদয় একত্র করিয়া সংযোগ দ্বারা একটী পূর্ণ ধর্ম্মজীবনে সুখ দান করিবার জন্যই এই বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্ম। কল্পনাপক্ষীকে এই উচ্চ কার্য্য করিতে দিব না; কিন্তু বিশ্বাসের ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া ঈশ্বরের ধর্ম্মরাজ্যে যে সকল মনোহর ফুল ফুটিয়াছে, যে সকল সত্যকলিকা প্রস্ফুত হইয়াছে ভক্তিহস্তে সে সমুদয় গ্রহণ করিব! পরে দেখিব যখন

সমুদয় ফুল এবং কলিকাগুলি সাজাইয়া রাখিলাম, তখন আমাদের স্বর্গ হইল এবং সেই স্বর্গের শোভা দেখিয়া আত্মার মধ্যে তাহার একটী অনুরূপ মূর্ত্তি আঁকিয়া লইলাম।

সুখী কিসে হইব? পুরাতন কালের বৈরাগীর ন্যায় স্ত্রী পুত্র ছাড়িয়া অরণ্যে গেলে সুখী হইব না, আবার দাও সুখ, দাও ধন মান, এই অবস্থা হইলেও সুখী হইব না। বিষয়ভোগে লিপ্ত হওয়া আমাদের ধর্ম্ম নহে এবং পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র, বন্ধু বান্ধব পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে জীবন যাপন করাও যথার্থ বৈরাগ্য নহে। দুঃখী বৈরাগীকে আমরা মানি না, সুখী বৈরাগীকে আমরা মানি। সর্ব্বত্যাগী অথচ সকল সুখ গ্রহণ করেন যিনি, তাঁহাকেই আমরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, পুরুষোত্তম বৈরাগী বলিয়া মানি। বর্ত্তমান বিধানমতে এখনকার শ্রেষ্ঠ বৈরাগী কে? যিনি সপরিবারে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। ইতিহাস বলিয়া দিতেছে, মহাত্মা চৈতন্য যখন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার মাতা কাঁদিয়াছিলেন। এই তিনি ছিলেন সংসারে সুখের মধ্যে, এই সর্ব্বত্যাগী, দুঃখী হইয়া ম্লানমুখে তিনি চলিয়া গেলেন। তাঁহার মাতা, তাঁহার স্ত্রী কাঁদিতে লাগিলেন। কবে সেই দিন হইবে যখন ব্রাহ্ম সন্ন্যাসীগণ চলিয়া যাইবেন জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্য, অথচ তাঁহাদের জননী, তাঁহাদের স্ত্রী ঈশ্বরের জয়ধ্বনি এবং সাধুবাদ করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিবেন। আশা করি, ব্রাহ্মধর্ম্ম শীঘ্রই সেই দিন আনিয়া দিবেন, যখন জগতের লোক এই বলিয়া আনন্দধ্বনি করিবে, ঐ দেখ, আমাদের কুলের একজন জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্য বৈরাগী হইয়াছেন। তখন পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব

নিকটে আসিয়া সেই বৈরাগীকে এই কথা বলিবেন, ছাড় যাহা কিছু সংসারে বিষ আছে, আমরাই তোমার সংসারের কণ্টক তুলিয়া লইতেছি। তখন যতই তিনি তাঁহার আত্মীয়দিগের মুখে এ সকল কথা শুনিবেন, ততই তিনি সুখী হইবেন এবং তাঁহারাও পরম সুখী হইবেন।

সন্ন্যাসী হওয়া আর কাহারও পক্ষে দুঃখের ব্যাপার হইবে না। নগরের সকলে বলিবে, অমুক ব্যক্তি সুখের সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিলেন। আগেকার সন্ন্যাসীরা পরিবার এবং জনসমাজ ছাড়িয়া যাইতেন, এখনকার সন্ন্যাসীরা তাঁহাদের মধ্যেই রহিলেন; তাঁহাদের অনাসক্ত হৃদয়ের মোহিনী শক্তিতে সকলেই মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরও উৎসাহ দিতে লাগিলেন। তাঁহারা যত্ন করিয়া বলেন, তুমি কি ছাড়িবে বল, আমরাই ছাড়াইয়া দিব, তুমিও সন্ন্যাসী হও, আমরাও সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী হই। জগতের মুখে ইহা শুনিয়া আরও প্রফুল্ল মুখে তাঁহারা বলেন, জগৎ, যদি যথার্থ সুখ চাও, আমার সঙ্গে এস, নিশ্চয়ই সুখী হইবে। পূর্ব্বে বলিত ঐ দেখ, সংসারের বাহিরে বৈরাগ্য; কিন্তু এখন দেখ, বৈরাগ্য সংসারে। আমাদের সুখের স্বপ্ন এই যে, পৃথিবীতে শীঘ্রই একটী বৈরাগী পরিবার সংগঠিত হইবে। বৈরাগী পরিবারের একটী ঘর চাই। সেই ঘর কোথায়? ঈশ্বরের চরণে। ঐ চরণতলে সেই সকল সর্ব্বত্যাগী অথচ সর্ব্বসুখগ্রাহী বৈরাগী সকল দিবারাত্রি ভক্তি-নদীর তটে বাস করিবেন। সেই পরিবারের কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কি ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা সকলেরই মুখে কেবল ব্রহ্মনাম। স্বামীর যদি ধর্ম্মসাধনসম্পর্কে কোন ত্রুটি হয়, তাঁহার ব্রহ্মপরায়ণা স্ত্রী তাহা দূর

করেন, এবং স্ত্রীর যদি কোন বিষয়ে আধ্যাত্মিক অভাব থাকে তাঁহার স্বামী বন্ধুভাবে তাহা মোচন করেন। সেই বৈরাগী পরিবারের সকলেই খড়্গহস্ত হইয়া পরস্পরের পাপাসক্তি বিনাশ করেন। সেই পরিবারের মধ্যে পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র কেহই কাহাকেও এমন একটী কথা বলেন না যাহা আসক্তিকে বৃদ্ধি করে। এই বৈরাগী পরিবারই বৈরাগীদিগের স্বর্গ। পূর্ব্বে যাঁহারা বৈরাগী হইতেন তাঁহাদিগকে পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইত। এক্ষণে বর্ত্তমান বিধানে, ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশে, বৈরাগ্য এবং পারিবারিক ধর্ম্মের সামঞ্জস্য হইল। পৃথিবীতে যাহা কখনও কেহ দেখে নাই, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহা দেখাইবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইন্দ্রিয় দমন কর, অথচ পরিবার মধ্যে থাক, ইহা ব্রাহ্মধর্ম্মেরই উপদেশ। ইহাতে নূতন উপকরণ আনিলেন না, কেন না জগতের ইতিহাস, বৈরাগ্য এবং গৃহধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতম দৃষ্টান্ত সকল দেখাইয়া দিতেছেন, কিন্তু এ সমুদয় একত্র করিলে ইহাদের সংযোগ দ্বারা যে ছবি হইল তাহাই বৈরাগী পরিবারের আদর্শ। পৃথিবীতে এই বৈরাগী পরিবার প্রতিষ্ঠিত হইলেই আমাদের স্বর্গের আশা পূর্ণ হইবে। এই স্বপ্ন যদি দেখি ইহা স্বপ্ন নহে। নিশ্চয়ই একদিন ইহা হইবে। ব্রাহ্মগণ, যদি সুখী হইতে চাও তবে যাহাতে পৃথিবীতে শীঘ্র এই বৈরাগী পরিবার সংসৃষ্ট হয় তজ্জন্য কায়-মন-প্রাণ উৎসর্গ কর। তাহা হইলে মনের উচ্চ কামনার পরিসমাপ্তি হইবে; এবং তখন দেখিবে স্বামী, ভার্য্যা, ভাই, ভগ্নী কাহারও মুখে আসক্তির চিহ্নমাত্র নাই; কিন্তু সকলেরই হৃদয়ে বৈরাগ্যের পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া পৃথিবীতে স্বর্গের শোভা বিস্তার করিয়াছে।

গৃহবাসী বৈরাগী এবং জগদ্বাসী বৈরাগী।

প্রাতঃকাল, রবিবার, ১৫ই চৈত্র, ১৭৯৬ শক ;
২৮শে মার্চ্চ, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

রাগী ও বিষণ্ণ বৈরাগী, শান্ত ও প্রসন্ন বৈরাগী এ দুয়ের মধ্যে কত প্রভেদ তাহা তোমরা জানিয়াছ। শুষ্ক ভাব ধারণ করিয়া লোকের প্রতি বিরক্ত হইলেই পৃথিবীর বৈরাগী সকল জগতের নিকট সমাদৃত হয় ; কিন্তু শান্তি ও সুখ যাঁহার মুখকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল করিয়াছে, যিনি সকলের প্রতি প্রসন্ন তিনিই যথার্থ বৈরাগী। সেই ব্যক্তিকে বৈরাগী বলা যায় না, যে সকলের প্রতি অপ্রসন্ন, কিছুতেই তুষ্ট হয় না। অসুখী যে ব্যক্তি তাহার হৃদয়ে ঈশ্বরের বাসস্থান হয় নাই। যিনি ঈশ্বরেতে আত্মা সমর্পণ করিয়া সর্ব্বদাই নির্ভয় এবং চিরপ্রসন্ন, তিনিই যথার্থ বৈরাগী। যেমন বিষণ্ণ ও প্রসন্ন বৈরাগীর মধ্যে প্রভেদ, তেমনই গৃহবাসী ও জগদ্বাসী বৈরাগীর মধ্যে প্রভেদ। গৃহবাসী বৈরাগী আপনার জন্যই ব্যস্ত, সর্ব্বদাই আপনার হিতসাধনে বিব্রত, আপনার চিত্তশুদ্ধি সাধনই তাহার সমুদয় কার্য্যের লক্ষ্য, আপনাকে আপনার প্রতি কর্ত্তব্যসাধনে নিযুক্ত করিলেই সেই ব্যক্তি কৃতার্থ হয়। তাহার জীবন দেখিলেই বুঝা যায় যে, এই ব্যক্তি শুদ্ধ ইহার নিজের জন্যই জগতে বাস করিতেছে। এই ব্যক্তি আপনি উপাসনা করে, আপনি অমৃত পান করে ; কিন্তু আর কাহাকেও ডাকিয়া অংশী হইতে দেয় না। পরের মুখ দেখিলে তাহার তপস্যা ভঙ্গ হয়। নির্জ্জনে তাহার হৃদয় উচ্চ উপাসনাতে নিমগ্ন থাকে বটে, তপস্যা-ভূমিতে যোগের বলে স্বর্গ তাহার নিকটস্থ

হয়; কিন্তু জগজ্জনের সংস্পর্শেই তাহার সমস্ত যোগ ভঙ্গ হয়, অতএব সে কেবল জগজ্জনের প্রতি নহে, কিন্তু সজ্জনের প্রতিও বিরক্ত। কোন মতেই সেই ব্যক্তি তাহার যোগ ভঙ্গ হইতে দিবে না। এই শুভ অভিপ্রায়ে লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া সেই ব্যক্তি নির্জ্জন গহনবনে সাধন আরম্ভ করিয়া মনুষ্য মাত্রকে বিঘ্নের আলয় মনে করে এবং নর নারী কাহাকেও নিকটে আসিতে দেয় না। কিসের জন্য? বিঘ্নহীন উপাসনার জন্য। যত কিছু সদ্ভাব, দয়া অনুরাগ ঈশ্বর মনুষ্যকে মনুষ্যের সঙ্গে বদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য সৃজন করিয়াছেন, সেই সমুদয় ছেদন করিয়া, পরিবারচ্যুত, সমাজচ্যুত, এবং জগচ্চ্যুত হইয়া একটী সাধনের দ্বীপে বসিয়া সেই ব্যক্তি তপস্যা করে। তাহার সকল দিকেই গুণ দেখা যায়, উচ্চ সাধন জন্য সেই বৈরাগী প্রশংনীয়; কিন্তু তাহার অন্তরে প্রেম নাই। সমুদয় নর নারীকে ঈশ্বরের পুত্র কন্যা জানিয়া আদর করা দূরে থাকুক, বরং তপস্যার বিঘ্ন বলিয়া ঘৃণার সহিত সেই ব্যক্তি সকলের সহবাস পরিত্যাগ করে। অতএব তাহার ধর্ম্ম যে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত নহে, ইহাতে আর কে সন্দেহ করিতে পারে?

বৈরাগ্যের ভূষণ যে প্রেম তাহাই যাহার নাই তাহাকে কিরূপে বৈরাগী বলিবে? তাহার সাধন ভজন সকলই গুপ্ত ব্যাপার। লোক-শূন্য স্থানে থাকিয়া আপনাকে ঈশ্বরের পূজায় উৎসর্গ করিবে এই তাহার লক্ষ্য। গৃহবাসী বৈরাগীর এই লক্ষ্য। কিন্তু জগদ্বাসী বৈরাগীর লক্ষণ এরূপ নহে। গৃহবাসী বৈরাগীর আপনিই আপনার গৃহ; কিন্তু জগদ্বাসী বৈরাগীর গৃহ সমস্ত জগৎ। জগতের জন্য তিনি জন্মগ্রহণ করেন, জগতের জন্য তিনি জীবনধারণ করেন। তাঁহার হৃদয়ের ভিতরে

তিনি থাকেন না; কিন্তু তিনি বাস করেন পরের আলয়ে। প্রত্যেক জগদ্বাসীর মধ্যে তিনি বাস করেন। তাঁহার আমিত্ব পরের মধ্যে, আত্মপর প্রভেদ তিনি জানেন না। আর সকল স্থানে তাঁহাকে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহার আপনার মধ্যে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। যথার্থ বৈরাগী নিজের শরীর এবং নিজের হৃদয় ছাড়া আর সকলের মধ্যে বাস করেন। তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া জগতে ব্যাপ্ত হইয়া জগতে বাস করিতেছেন। আমি জগতের মধ্যে এবং জগৎ আমার মধ্যে, এই বিনিময় সাধন দ্বারা আরম্ভ হয়। কেহ কেহ প্রথম বয়সেই এই প্রেমযোগে যোগী হন। তাঁহাকে বৈরাগী বলি যিনি পরের ঘরে আহার করেন, পরের ঘরে সুখ সঞ্চয় করেন, পরের ঘরে পুণ্য সঞ্চয় করেন। তাঁহার নিকটস্থ এবং দূরস্থ সমুদয় লোকের মধ্যে তিনি বাস করেন; কিন্তু তাঁহার নিজের ঘরে তিনি থাকেন না। তাঁহার শরীর ছেদন করিয়া দেখ, তাহা হইতে যত রক্তবিন্দু পড়িবে, দেখিবে, প্রত্যেক রক্তবিন্দু মধ্যে জগতের জীবন। জগৎ ঘুরিতেছে তাঁহার মধ্যে, তিনি ঘুরিতেছেন জগতের মধ্যে, চিরকালই তিনি জগতের।

সাধু বৈরাগীর জীবন এইরূপ হইবেই হইবে। পরোপকারের জন্য তাঁহার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন ইহা বলিলেও যথার্থ বৈরাগীর সম্পর্কে কিছুই বলা হইল না। কিন্তু তিনিই জগৎ অথবা জগতের ভিতরে তিনি থাকেন, ইহাই তাঁহার সম্পর্কে সত্য কথা। যিনি যথার্থ বৈরাগী তাঁহাকে কষ্ট দিবার জন্য তাঁহার গাত্রে হস্ত স্থাপন করিতে হয় না; কিন্তু জগতের একটী লোককে মারিলেই তাঁহাকে মারা হইল। কেহ পরের ধন হরণ

করিল, তিনি মনে করিলেন, সেই ব্যক্তি তাঁহার ধন হরণ করিল, কেন না যথার্থ বৈরাগী অভিন্ন শরীর, অভিন্ন মন, এবং অভিন্ন হৃদয় হইয়া সেই ধনীর জীবনের মধ্যে বাস করিতেছেন। পৃথিবীর লোক পরস্পরের প্রতি যত অত্যাচার করিতেছে, যত লোককে মারিতেছে, তিনি মনে করেন, সকলেই তাঁহাকে মারিতেছে। কেন না তিনি জগতের দুঃখে দুঃখী। তাঁহার মত সমদুঃখী আর কেহ নাই। জগতের দুঃখকষ্টভার কোথায়? কেবল যাহারা কষ্ট পাইতেছে তাহাদের নহে; কিন্তু যত বৈরাগী এই পৃথিবীতে বাস করিতেছেন, জগতের সমুদয় দুঃখভার তাঁহাদের অন্তরে। পরসুখে সুখী পরদুঃখে দুঃখী, জগদ্বাসী বৈরাগীর এই লক্ষণ। জগতের দুঃখে তাঁহার দুঃখ জগতের সুখে তাঁহার সুখ। সকলের হৃদয়ে তিনি আছেন, এবং জগতের সঙ্গে তিনি এক শরীর এক প্রাণ হইয়া গিয়াছেন। তিনি আমিত্ব বিনাশ করিয়াছেন, আপনার জন্য কিছুই রাখেন নাই, আপনার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া পরের উপকারার্থে তিনি পথে পথে বেড়াইতেছেন। একাকী নির্জ্জনে বসিয়া থাকিলেও তিনি জগতের কল্যাণ চিন্তা করেন। জগৎ ছাড়া তিনি থাকিতে পারেন না। কখনও তিনি আপনার মধ্যে আপনি থাকিতে পারেন না, এবং নিজের জন্য কিছুই করিতে পারেন না, কি সজনে কি গোপনে জগতের সেবা করাই তাঁহার জীবনের ব্রত। সেই স্বর্গের বৈরাগী, ঈশ্বর যেমন আপনার জন্য কিছুই করেন না, কিন্তু তাঁহার সন্তানদিগকে সুখে রাখিবার জন্যই ব্যস্ত, তাঁহার অনুগত শিষ্য জগদ্বাসী বৈরাগীও সেইরূপ তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসারে নিজের জন্য কিছুই করেন না; কিন্তু জগৎকে

সুখী করিবার জন্যই তিনি আপনার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।

গৃহবাসী স্বার্থপর বৈরাগীর স্বর্গে ঈশ্বর এবং সেই ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহ নাই। কিন্তু যে স্বর্গেতে মনুষ্য নাই, নর নারী নাই, সেখানে যদি ঈশ্বর থাকেন তিনি ঈশ্বর নহেন। জীবশূন্য মনুষ্যশূন্য যদি কোন পবিত্র স্থান কল্পনা করা যায় তাহা ভাবিতে সুন্দর বটে; কিন্তু তাহা কি মিথ্যা কল্পনা নহে? যথার্থ ঈশ্বর যেখানে, সেখানে জীব নাই, সেখানে নর নারী নাই, ইহা হইতে পারে না। ঈশ্বরের দয়া তাঁহাকে টানিতেছে, জীবদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছে। তাঁহার নিষ্কলঙ্ক প্রেমের অনুরোধেই তিনি তাঁহার কলঙ্কিত সন্তানদিগের নরকের মধ্যে আসেন। তিনি আপনার স্বভাবগুণেই পাপীদের মধ্যে বাস করিতেছেন, দয়া আপনার মধ্যে থাকিতে পারে না। যখন দুঃখীরা দুঃখ পাইতেছে দেখেন, তখন কি দয়াময় ঈশ্বর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? কেন তিনি দয়ালু হইলেন? পাপীর পরিত্রাতা কি পাপীদিগকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন? ভক্তবৎসল ভক্তদিগকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। তিনি পাপীর দ্বারে দ্বারে গিয়া তাঁহার প্রেমামৃত বিতরণ করিতেছেন। ঈশ্বরের যদি এই স্বভাব হইল তবে পৃথিবীর সামান্য বৈরাগীরা কি জগতের দুঃখীদিগকে সুখী করিতে চেষ্টা করিবে না? স্বর্গের রাজা নিষ্কলঙ্ক ঈশ্বর যদি পাপীদিগকে এত দয়া করেন, পৃথিবীর ক্ষুদ্র বৈরাগীরা কিরূপে তাহাদিগকে ঘৃণা করিবে? এই কারণেই যথার্থ বৈরাগীরা যাহাতে জগতের লোক ভাল হয়, যাহাতে তাহাদের শারীরিক মানসিক সুখ

বৃদ্ধি হয়, সেই জন্ত আপনাদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহারা পরের উপকার করাকে কঠোর কর্ত্তব্য মনে করেন না, কিন্তু আনন্দের সহিত সুখের সহিত সকলের ইষ্টসাধন করেন।

জগদ্বাসী বৈরাগী জগতের সঙ্গে একীভূত হইয়া তাহার সকলই জগৎকে দিয়াছেন। ক্ষুদ্র তাঁহার হৃদয়; কিন্তু তাঁহার মধ্যে প্রকাণ্ড জগৎ অথবা জগদ্বাসী সকলের ঘর বাড়ী, অট্টালিকা অঙ্কিত রহিয়াছে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের লোক তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে ক্রীড়া করিতেছে। তিনি যে জগদ্বাসী প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন তাহা নহে; কিন্তু ঘরের ভিতর বসিয়া তিনি জগৎকে ভালবাসেন। যতবার নিমীলিত নয়নে তিনি ভিতরে দেখেন, ততবারই তিনি আপনাকে দেখেন না; কিন্তু দেখেন সমস্ত জগতের লোক তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে বেড়াইতেছে। তিনি যে বাহিরের কার্য্য দ্বারা লোকদিগের উপকার করিয়া প্রেমসাধন করেন তাহা নহে; কিন্তু তিনি অন্তরে অন্তরে জগদ্বাসী লোকদিগের প্রতি মধুময় ভালবাসা পোষণ করেন। যখন কার্য্য আরম্ভ করেন তখন তাঁহার প্রেম পরিপক্ক হয়। দয়ার কার্য্য পরকে আপনার করা। দয়ালু বৈরাগীই যথার্থ বৈরাগী। নির্দ্দয় বৈরাগী বৈরাগী নহে। জগদ্বাসী বৈরাগী আহার করেন জগতের সেবা করিবার জন্ত। তিনি ধন সঞ্চয় করেন পরের জন্ত, পড়েন পরের জন্ত। আমিত্ব তিনি অনেক কাল ছাড়িয়াছেন। চিরকালই পরের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া তিনি আপনাকে ভুলিয়া গিয়াছেন। নির্দ্দয়তা তিনি জানেন না। জগতের কল্যাণে তাঁহার কল্যাণ। জগৎ ছাড়া স্বর্গ তিনি দেখিতে পান না। চিরকাল তিনি প্রেমার্দ্র-নয়নে জগতের মঙ্গল সাধন করেন। জগৎ তাঁহার ভিতরে,

এবং তিনিই জগৎ হইয়া গিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার পক্ষে ত্যাগস্বীকার কি? অন্যকে অন্ন দিলেন, তিনি মনে করিলেন তিনি আপনি আহার করিলেন, কেন না তিনিই যে জগৎ। ঔষধ দ্বারা কোন দেশের রোগ দূর হইল, তিনি মনে করিলেন আমার ভার কমিল। জগদ্বাসীদের দুঃখ আপনার ভিতরে লইয়া তিনি জগতের দুঃখ দূর করেন। তিনি জগতের ভৃত্য, জগতের কল্যাণেই তিনি বিব্রত থাকেন, এবং এই প্রেমের ব্রতেই তিনি আপনাকে সুখী মনে করেন।

স্বর্গীয় প্রেম।

সায়ংকাল, রবিবার, ১৫ই চৈত্র, ১৭৯৬ শক;
২৮শে মার্চ্চ, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

মন এমনই নির্ব্বোধ যে, ধর্ম্মের বর্ণমালা পর্য্যন্ত ইহাকে বারবার শিক্ষা দিতে হয়। যতই ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হই, ততই যে আমরা গূঢ়তর সত্য সকল লাভ করি তাহা নহে; কিন্তু অত্যন্ত পুরাতন এবং অতি সহজ মূল সত্য সকল যাহাতে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহার জন্য আমাদিগকে বারম্বার চেষ্টা করিতে হয়। যে সকল সত্য পাইয়া আমরা সুখী হইয়াছি, যদি দশ বৎসর পরে সে সমুদয় দৃষ্ট, পরীক্ষিত সত্যকে আবার পরিত্যাগ করিতে পারি তাহা হইলে আমাদের জ্ঞানও নাই, বুদ্ধিও নাই। আজ যাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে কাল যদি তাহাকে ছায়া বল, আজ যাহাকে পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিলে কাল যদি তাহাকে কল্পনা বল, তবে তোমরা মূর্খ, নিতান্ত নির্ব্বোধ, এবং কল্পনার রাজ্যে বাস করিতেছ। যাহারা

যথার্থ বিশ্বাসী এবং জ্ঞানবান্ তাহাদের বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন নাই। যদি অন্তরে যথার্থ বিশ্বাস থাকে তবে যাহা একবার সত্য বলিয়া হৃদয়ের সঙ্গে বাঁধিয়াছি, সাহসপূর্ব্বক, মুক্তকণ্ঠে, দৃঢ়বাক্যে সমস্ত জগৎকে বলিব, তাহা সত্য, কদাচ মিথ্যা নহে। কেমন সত্য? অটল অপরিবর্ত্তনীয়। পাহাড় প্রস্তর যেমন ভাঙ্গে না, সেইরূপ সত্যের প্রস্তরের উপর কোটী কোটী তর্কের অস্ত্র পড়িলেও তাহার বালুমাত্র খসিবে না। সেই বিশ্বাস কাহাদের? যাহাদিগকে সাগরের সহস্র ঢেউ ভাসাইতে পারে না, ক্রমাগত অস্ত্রাঘাত করিলেও যাহারা চূর্ণ হয় না, পৃথিবী যদি প্রলয়দশা প্রাপ্ত হয়, আকাশ হইতে যদি চন্দ্র সূর্য্য খসিয়া পড়ে তথাপি যাহারা চিরস্থায়ী হইয়া থাকে। কেহ বলিবেন ব্রাহ্মদের, আমি বলি আমাদের, যাঁহারা এই ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করেন। যাঁহার পদাশ্রয়ে আমরা আশ্রিত, যাঁহার আশাবাক্যে আমরা আশ্বাসিত, যে গুরুর শিষ্য আমরা, তাঁহারই কৃপাতে আমাদের কয়জনের বিশ্বাস এমন হইয়াছে।

ঈশ্বরসম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস যেমন, পরস্পরের সম্বন্ধেও আমাদের বিশ্বাস তেমনই। যদি বুঝিয়া থাকি যে, ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে আমাদের প্রণয় হইয়াছে, ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া তাহা স্বীকার করিতে হইবে। যদি এখনও ভাই ভগ্নীকে ভালবাসিতে না শিখিয়া থাকি, তবে কি এতদিন আমরা কতকগুলি মিথ্যা ছবি আঁকিয়া আত্মপ্রতারিত হইলাম? আমরা কি ধর্ম্মরাজ্যের কবি যে, স্বীয় রচিত কতকগুলি সুন্দর কবিতা লইয়াই ভুলিয়া রহিলাম? আমরা কি এতকাল কেবল কল্পনা দ্বারা বলিলাম, ঐ দেখ কেমন সুন্দর ঘর, ঐ দেখ কেমন আশ্চর্য্য প্রেমের

ব্যাপার? না, এত বৎসরের ধর্ম্মরাজ্যের ব্যাপার কল্পনা নহে, কবিত্ব নহে। আমরা দেখিয়াছি যথার্থ প্রণয় আসিয়াছে। অযথার্থ নহে, কৃত্রিম নহে; কিন্তু যাহা ঈশ্বর স্বহস্তে হৃদয়ে রাখিয়া দিয়াছেন। বাহিরের বিবাদ, কলহ এবং বিপদ প্রলোভনের তরঙ্গে বন্ধু বান্ধব সমুদয় ভাসিয়া গেল, কিন্তু হৃদয়ের প্রেম গেল না। যাহাদের উপর একবার প্রেম শ্রদ্ধা দিয়াছি আর তাহা ফিরাইয়া লইতে পারি না। তাহা যথার্থ পদার্থ, কল্পনা নহে। ব্রাহ্মসমাজে এত অবিশ্বাস, এত অপ্রণয়, এত কলহ বিবাদ; যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে কোথায় প্রেম, কোথায় প্রণয়? আমরা বলিব, এই দেখ হৃদয়ের মধ্যে যাহা আছে কোন্ মুখে বলিব তাহা নাই। কাহারও অনুরোধে সত্যকে অসত্য বলিতে পারি না। যাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তাহা আগুনে পুড়িবার নহে, সাগরে ডুবিবার নহে। যখন অন্তরে প্রেম দেখিতেছি, তখন নিরাশ হইব কাহার কথায়? ক্রমশঃ শত্রুদল বৃদ্ধি হইল, তাহাতে আমাদের ভয় কি? আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে প্রেম তাহা ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠিত, তাহা কিছুতেই কলঙ্কিত হইবার নহে। যাহা ঈশ্বর স্বহস্তে রচনা করিয়া স্বয়ং রক্ষা করিতেছেন, কোন্ শত্রুর সাধ্য তাহা বিনাশ করিতে পারে? এই প্রকার দৃঢ় বিশ্বাস প্রত্যেক ব্রাহ্মের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

যখন দেখিব, এ ব্যক্তির উপর যে প্রেম স্থাপন করিয়াছি তাহা মিথ্যা নহে, তখন সেই প্রেমের কথা কেন স্বীকার করিব না? আমাদের মধ্যে কাহারও কি সেই প্রেম হয় নাই যাহা বিপদ প্রলোভনে যায় না? বাহিরের বিবাদ কলহ দেখিয়া কি আমরা বলিব যে আমাদের মধ্যে প্রেম নাই? সময়ে

সময়ে আমরা ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না, তবুও কি আমরা বিশ্বাস করি না যে ঈশ্বর আছেন? আমরা পাপে পড়ি বলিয়া কি মনে করিব যে ঈশ্বর নাই? সময় সময় অন্ধকার দেখি বলিয়া কি সূর্য্য নাই বলিব? অন্তরে অন্তরে গভীর প্রেম, ব্রাহ্মোচিত প্রেম, ঈশ্বর দেওয়া ভালবাসা আছে। কেহই সেই প্রেম ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতে পারে না। যিনি ভালবাসিয়াছেন, যিনি ভালবাসিতে শিখিয়াছেন, যিনি ভালবাসিতে জানেন, কে তাঁহার হৃদয়ের ভালবাসা দূর করিয়া দিতে পারে? সত্যকে অসত্য বলিতে পারে কে? কলহ হইয়াছে বলিয়া কি ভালবাসা চলিয়া গিয়াছে? অন্তরে সেই ভালবাসা, সেই প্রেম আছে যাহা স্বর্ণ অপেক্ষাও উজ্জ্বল। সেই প্রেম যেমন ঈশ্বরের দিকে, তেমনই মনুষ্যের দিকে রহিয়াছে। নিরাকার পরিবার যেখানে প্রতিষ্ঠিত সেখানে প্রবেশ কর, দেখিবে প্রবেশ করিবা মাত্র, তোমার হৃদয়ে ঈশ্বর স্বহস্তে যে পবিত্র প্রেম রচনা করিয়াছেন তাহা উথলিয়া উঠিবে, এবং তাহা একদিন সমস্ত জগতে উথলিয়া পড়িবে। আমাদের অন্তরে গভীর প্রেম আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। যতটুকু প্রেম আছে তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব।

পূর্ণ প্রেম আমাদের হয় নাই, কেন বলিব আমরা পূর্ণ প্রেমের আধার? আবার যখন ভালবাসি, তখন ভালবাসি না, মিথ্যা বলিব কেন? এবং যখন জানি যে আমরা শত শত পাপে কলঙ্কিত, তখন কেন বলিব আমরা কোন অধর্ম্মাচরণ করি নাই? যাহা সত্য তাহা স্বীকার করিব। কাটিয়া যদি কেহ দেখিতে পারেন আমাদের জীবন পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। যদি বালুকণার ন্যায় বিশ্বাস এবং প্রেম আমাদের অন্তরে থাকে, তাহা পৃথিবীর সমুদয় বাধা এবং

শত্রুতা অতিক্রম করিয়া পর্ব্বত সমান হইবে। যেটুকু বিশ্বাস, যেটুকু প্রেম পাইয়াছি তাহা চিরকালের। এই বিশ্বাসই ব্রাহ্মের বাঁচিবার একমাত্র পথ। কে বাঁচিবে যদি অন্তরে এই বিশ্বাস না থাকে? যদি আমাদের জীবনের একটু অংশও দৃঢ়, অপ্রতিহত দুর্জ্জয় সত্য না হয় তবে ত আমরা অসার, চঞ্চল বালুর উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছি। না, দয়াময় ঈশ্বর আমাদিগকে এমন ভয়ানক দুর্দ্দশার মধ্যে রাখেন নাই। তিনি আমাদিগকে সার নিত্য ধন দিয়াছেন, এইজন্য সত্যকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, সত্য প্রেম পাইয়াছি। যতটুকু পাইয়াছি, কেহই তাহা অস্ত্রাঘাত করিয়া চূর্ণ করিতে পারে না, কদাচ পারিবে না। সেই প্রেম সেই যথার্থ প্রণয় বন্ধুদিগকে দিয়াছি, তাঁহাদের মুখাপেক্ষা করিয়া নহে। ঈশ্বরসম্পর্কে যেমন বলি, "তিনি যদি বিনাশ করিতে আসেন, তথাপি তাঁহার উপর নির্ভর করিব এবং তাঁহাকে মানিব;" সেইরূপ বন্ধুরাও যদি অস্ত্রাঘাত করিয়া মারিতে আসেন তথাপি তাঁহাদিগকে ভালবাসিব।

বন্ধুগণ, তোমরা ভয়ানক ভয়ানক কথা বলিয়া প্রাণকে ব্যথিত করিতে পার, শেষে হয় ত বন্ধু বিচ্ছেদ দ্বারা প্রাণকে বিদ্ধ করিতে পার, কিম্বা তুমুল বিরহানল প্রজ্বলিত করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে ভস্মীভূত করিতে পার, কিন্তু প্রাণের মধ্যে যে গভীর প্রেম রহিয়াছে তোমাদের মধ্যে কে তাহা বিনাশ করিতে পারে? আকাশের চারিদিক হইতে মেঘ সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আসিয়া চন্দ্রের মুখ ঢাকিল; কিন্তু চন্দ্র যেমন তেমনই রহিল, তাহার বিন্দুমাত্র জ্যোৎস্নার হ্রাস হইল না। সেইরূপ আপাততঃ মনুষ্যদিগের অবিশ্বাস অপ্রণয় বিরোধ বিবাদ আসিয়া মনুষ্যের হৃদয়কে, প্রেমচন্দ্রকে আচ্ছন্ন করিল; কিন্তু সেই প্রেমচন্দ্র

পূর্ব্বে যেমন তেমনই উজ্জ্বল রহিল। এই প্রেমচন্দ্রের যদি সামান্য একটু অংশও আমাদের হৃদয়ে থাকে তবে আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। যদি এই প্রেমের আস্বাদন না পাইতাম, তবে ব্রাহ্মসমাজে আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল হইত না, এবং এ সকল কথা বলিতে পারিতাম না। ব্রাহ্মসমাজে সহস্রবার বিরোধানল জ্বলিল, তথাপি পুনর্ম্মিলনের কথা, শান্তি সংস্থাপনের কথা উঠিতেছে কেন? ভালবাসা আছে, নিশ্চয়ই আমাদের অন্তরে সেই ভালবাসা জন্মিয়াছে, যাহা কোন আক্রমণে নষ্ট হইতে পারে না। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যে প্রকার কলহ এবং অপ্রণয় ইহা হইতে নিশ্চয়ই একদিন ব্রাহ্মসমাজ অপ্রেমের ভয়ানক যুদ্ধক্ষেত্র হইয়া উঠিবে, এই বলিয়া যাহারা আমাদিগকে নিরাশ করিতে চায় তাহারা মিথ্যাবাদী এবং জগতের মহাশত্রু; এই ভয়ানক গরলময় নিরাশার কথা কাহাকেও আমরা বলিতে দিব না। ঈশ্বর-প্রসাদে যদি আমরা স্বর্গের প্রেম না পাইতাম, তবে এতদিন পরস্পরের সেবা করিতেছি কেন? এই অপ্রেম আসিল, অশান্তি আসিল, ঘোর নিরাশার জন্য প্রস্তুত হও, এ সকল মিথ্যা কথা দ্বারা বালকেরা ভীত হইতে পারে; কিন্তু আমরা যে ঈশ্বরের প্রমুখাৎ—প্রাণসখার মুখে আশার কথা শুনিয়াছি।

কাহাদিগকে সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিবে? যাহাদের হৃদয়ে প্রেম-ময়ের প্রেম তাহাদের মধ্যে দল কোথায়? যেখানে সকলের প্রাণ মন ঈশ্বরের চরণে গ্রথিত রহিয়াছে সেখানে ত বিবাদ অপ্রণয় নাই। সংসার-বাজারেই এ সকল নীচ কথা শুনা যায়। পৃথিবীর অসার জঘন্য সংবাদপত্রে শুনিলাম অমুক স্থানে বিবাদানলে শত শত ঘর জ্বলিতেছে, এইজন্য দৌড়িয়া ঈশ্বরের ঘরে, তাঁহার প্রেম-নিকেতনে প্রবেশ

করিলাম। বলিলাম, হে দয়াল প্রভু, বল দেখি, এ সকল কি সত্য কথা? তিনি বলিলেন, এ সকল জঘন্য, অসার মিথ্যা কথা। যথার্থ কথা এই, যিনি একবার মনুষ্যকে প্রণয় দিয়াছেন, তিনি আর তাহা ফিরাইয়া লইতে পারেন না। এই প্রেম হইল, এই প্রেম গেল, যদি এই ভয়ানক নিরাশার কথা বলিতে চাও, ব্রহ্মমন্দির পরিত্যাগ কর। ব্রাহ্মসমাজে অপ্রণয় আসিল, এই দলাদলি হইতে চলিল, এ সমুদয় নিরাশার কথা শুনিয়া যদি তোমরা মনে কর ব্রাহ্মসমাজ ডুবিবে, তবে শীঘ্রই তোমাদের ব্রাহ্মসমাজ ডুবুক। তাহাতে তোমাদের এবং জগতের মঙ্গল হইবে। কিন্তু আমাদের যথার্থ ব্রাহ্মসমাজ ডুবিতে পারে না। আমরা যে প্রণয়ের কথা বলিতেছি তাহা যথার্থ প্রণয়, কিছুতেই যাইবার নহে। আধ্যাত্মিক হৃদয়-নিকেতনে তাহা আছে। সেই প্রেমধনে ধনী হও, অনায়াসে ভব-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে। মানুষের জঘন্য কথা শুনিও না। এখনই প্রেম-প্রস্রবণ হইতে ক্রমাগত প্রেমজল বিনিঃসৃত হইতেছে, তোমাদিগকে শীতল করিবার জন্য, তোমাদের পরিবারকে শীতল করিবার জন্য এবং সমস্ত জগৎকে শীতল করিবার জন্য। ঈশ্বর-প্রসাদে আমাদের মধ্যে ভালবাসা আছে এবং ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হইয়া নিশ্চয়ই ইহা সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইবে।

সুখের বৈরাগ্য। *

রবিবার, ৬ই বৈশাখ, ১৭৯৭ শক; ১৮ই এপ্রেল, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

ঈশ্বরের বিশ্বাসী সন্তানের কিছুতেই ভয় নাই, কিছুরই অভাব নাই। অভাবরাশির মধ্যে তিনি সুখী, ঘোর বিপদে আক্রান্ত হইলেও তিনি নির্ভয়, কেন না তিনি ভবকাণ্ডারীকে সহায় করিয়াছেন। বিশ্বাস বৈরাগ্যকে সরস করিয়া রাখে, বৈরাগ্য বিশ্বাসকে সজীব রাখে। ঈশ্বরের সত্তায়, ঈশ্বরের চরিত্রে যদি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি তাহা হইলে ঈশ্বর আমাকে কথনও পরিত্যাগ করিতে পারেন না। পিতা মাতা একদিন বিমুখ হইতে পারেন, অন্ন পান না দিতে পারেন, কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে ইহা একেবারে অসম্ভব। সকল বিষয়ে তিনি মঙ্গল করিবেন বৈরাগী শুদ্ধ এই কথা বলেন না, তিনি কথনও পরিত্যাগ করিতে পারেন না, এই কীটকেও ভাসাইয়া দিতে পারেন না, তাঁহার এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস। ঈশ্বরের চরিত্র সম্বন্ধে এতদূর নির্ভর না থাকিলে, সে ব্যক্তি অল্প বিশ্বাসী শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। বিশ্বাসী বৈরাগীর কেহ নাই জানিয়া ঈশ্বর তাহাকে খাওয়াইবেন, এ কথা বলিলে অর্দ্ধেক বলা হইল। কোন কালে তিনি ভাসাইয়া দিতে পারেন না, লক্ষ বৎসর পরেও সেই জননীর ক্রোড়েই রহিয়াছি। তাঁহার সম্বন্ধে পরিত্যাগ করা একেবারে অসম্ভব। নিষ্ঠুর হইয়া তাড়াইয়া দেওয়া তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে যদি অসম্ভব মনে না করি, তবে সন্দেহ আসিয়া বৈরাগ্যকে ঘন মেঘে আচ্ছন্ন করিবে, কথনও নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না। একদিন বা এক মাসের মধ্যে যদি একবারও চিন্তা আসিয়া মনকে অধিকার করে

যে, অন্ন পানের কি হইবে? বন্ধু বান্ধব সকলে পরিত্যাগ করিলে আমার কি হইবে? তবে জানিলাম ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইতে পারি নাই। তিনি এক নিমেষের জন্য আশ্রিত সন্তানকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না, ক্ষুদ্র কীটকেও তিনি বঞ্চনা করেন না। তিনি স্বয়ং আমার এবং পরিবারের ভার নিজ হস্তে রাখিয়া মঙ্গল বিধান করিবেন, এইরূপ যাঁহাদের বিশ্বাস তাঁহারা পূর্ণ বিশ্বাসীর মধ্যে গণ্য। তাঁহারা সন্দেহবিহীন চিন্তাবিহীন। ঈশ্বর কখনও ছাড়িতে পারিবেন না, এই বিশ্বাসেই তাঁহাদিগকে নিশ্চিন্ত করিল এবং এই নিশ্চিন্ত বিশ্বাসেই তাঁহাদিগের ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ জন্মিল। এইরূপ অবস্থায় বৈরাগ্য কখনও বিষণ্ণ ভাব অবলম্বন করিতে পারে না। বৈরাগ্যে অনুরাগ প্রফুল্লতা সর্ব্বদা বিরাজ করে।

বৈরাগীর জীবন এক সময়ে জীবন মৃত্যু, সরস নীরস, কঠোর সুকোমল ভাবে বিভূষিত। সংসারের বিলাস আমোদ প্রমোদ আসক্তি বিষয়লালসা এ সকল সম্বন্ধে বৈরাগীর জীবন শ্মশান, মৃত্যুর আগুনে পাথরের মতন কঠিন। ইহাতে বিষয়লালসা পড়িয়া দগ্ধ ও চূর্ণ হইয়া যায়। অনেক বৈরাগীর জীবন কেবলই কঠোর উহাতে কোমলতা নাই। ইহাঁরা শ্মশানবাসী বিষণ্ণ বৈরাগী। ইহাঁদের অপ্রসন্নতা ইহাঁদিগকে জগতের কাছে মনোহর করিতে পারিল না। ইহাঁদিগকে দেখিয়া ভয় হয়। ফলতঃ শশ্মানের সঙ্গে বৈরাগ্যের যোগ। কেহ মৃত্যুর মধ্য দিয়া না গেলে শান্তি-নিকেতনে যাইতে পারিবেন না। এই শ্মশান ধূ ধূ করিতেছে, উহা ভয়ের ব্যাপার। উহারই ধারে বৈরাগীর বাসস্থান। তিনি কঠোর হইয়া সুখ বিলাস আত্মীয় স্বজন সকলকে বিদায় করিয়া দিলেন দেখিয়া লোকের মন

ভীত হইল, কিন্তু ইহা বৈরাগ্যের এক ভাগ মাত্র। ইন্দ্রিয়গণ মনকে আকর্ষণ করিতে না পারে, এ জন্য বৈরাগ্যের মূর্ত্তি কঠোর, কিন্তু অপর দিক দেখিলে দেখিতে পাই উহাই বৈরাগ্যের সমুদয় নহে। দেখিব উহার পরপারে নবজীবন আরম্ভ হইয়াছে। কঠোরতা শেষ করিয়া শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছে। এখানেই কোমলতার আরম্ভ হইল। মরুভূমিতে বৃক্ষ উদ্যান জলাশয় দেখিতে পাইলাম না, মরুভূমির শেষ ভাগে গিয়া দেখিলাম জলাশয়ের আরম্ভ হইয়াছে, ফল ফুল প্রস্ফুটিত হইতেছে। যতদিন প্রেমের কোমল রাজ্যে না যাই, ততদিন কঠোরতা দেখিব। বৈরাগ্যের এক দিকে যেমন শ্মশান অন্য দিকে তেমনই জীবন। জিজ্ঞাসা করি, যখন এই হস্ত কুক্রিয়ায় নিযুক্ত হয়, হৃদয় কুচিন্তায় উৎপীড়িত হয়, তখন কাহার না মনে হয় যে ঐ শ্মশানের পথ অবলম্বন করি? আপনাকে আপনি কে ইচ্ছাপূর্ব্বক নিগ্রহ করিয়া থাকে? পূর্ণ বৈরাগ্যে কঠোরতা কোমলতায় পরিণত হয়। যথার্থ বৈরাগীর জীবনে কি দেখিতে পাই? কঠোরতা পরাজয় করিলে যাহা কিছু বাহির আকর্ষণ প্রকাশ পায় তদ্দ্বারা তিনি সকলকে আকর্ষণ করিতেছেন। তখন তিনি প্রেম-সাগরে নিমগ্ন। মৃত্যুর মধ্য দিয়া সুকোমল ভাব গঠিত হইয়াছে, কঠোরতা নিম্নদেশে পড়িয়াছে। সত্যের ভাব কঠোর, বিশ্বাসের ভাব কঠোর, প্রেমের ভাব সুকোমল। পাপ দেখিয়া ঈশ্বর নির্য্যাতন করেন, এই নিষ্ঠুর নির্য্যাতন দেখিয়া ঈশ্বরের স্বভাব কঠোর বোধ হয়, কিন্তু বস্তুতঃ তিনি কোমল স্বভাব। সত্যের কোমলতাও তেমনই প্রচ্ছন্ন। বৈরাগ্য সংসারের ভোগাভিলাষ কঠোর দৃষ্টিতে দেখেন, লোকদিগকে নির্য্যাতন করেন, কিন্তু বস্তুতঃ কোমল প্রকৃতি।

বৈরাগী নিজের কষ্টের মধ্যেও সুখ পান, যদি কেবল কষ্ট হয়, তবে তিনি প্রকৃত বৈরাগী নহেন। হস্ত অতি কঠিন কার্য্যে নিযুক্ত; অনুরাগে সমুদয় জীবন মধুর, এ প্রকার অনুরাগ না হইলে বৈরাগী হওয়া যায় না। বিশ্বাস বৈরাগ্যের আরম্ভ, বৈরাগ্যের পুষ্টি অনুরাগ ও প্রেম। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ না হইলে বিষয়ানুরাগ যায় না। জগৎকে হৃদয়ের মধ্যে রাখিলে অনুরাগ হয়। অনুরাগ ভিন্ন বৈরাগ্য কঠোর। এই কঠোর বৈরাগ্য ঘৃণার বস্তু। যদি সেই বৈরাগী ঊর্দ্ধবাহু হইয়া থাকেন, মাঘের শীতে জলে বাস করেন, প্রখর গ্রীষ্ম সময়ে চারিদিকে অগ্নি জ্বালিয়া তাহার মধ্যে বসিয়া সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিয়া অবস্থান করেন, অনাহারে শরীর শুষ্ক করেন, দুই মাস, চারি মাস, দুই বৎসর, দশ বৎসর কঠোর ব্রত ধারণ করিয়া আত্মনির্যাতন করেন, তবে তাঁহাকে আমরা নিকৃষ্ট বৈরাগী বলি। আমাদের এতদূর ক্ষমতা নাই সত্য, কিন্তু এরূপ নিষ্ঠুর বৈরাগ্য প্রার্থনীয় নহে। ভাই বন্ধু সকলকে বিদায় করিয়া দিলাম, বাড়ী ছাড়িয়া উদ্যানে, উদ্যান ছাড়িয়া বনে গেলাম, মনুষ্যের সঙ্গে কথা বার্ত্তা পরিত্যাগ করিলাম, সকল প্রকারের অনুতাপবিহীন হইলাম, একাকী নির্জনে বাস করিলাম; এরূপ করিয়া সংসারে সুখ হইল না, ধর্ম্মেও সুখ হইল না। এরূপ বিরক্ত বৈরাগ্য প্রার্থনীয় নহে। যাঁহাদিগের ইন্দ্রিয় দমন হইতেছে, সুখও হইতেছে, সেই বৈরাগীই আমাদিগের হৃদয় মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন। অতএব মনুষ্যসমাজের বিকৃত ভাব পরিত্যাগ করিয়া, ভাই ভগিনীগণের মধ্যে যাহা কিছু ভাল বিষয় আছে তৎপ্রতি অনুরাগী, এবং যাহা কিছু পাপ আছে তৎপ্রতি বিরক্ত হও। ভাই ভগিনীগণকে দেখিয়া সুখী

হয়, তাহাদিগকে সুখী করে, এমন বৈরাগী দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা সেইরূপ বৈরাগ্য চাই, ইহাই আমাদিগের যত্নের বিষয়।

বৈরাগ্যের অবস্থায় আত্মা প্রথমে পাগলের ন্যায় হইয়া মৃত্যুর মধ্য দিয়া যাইবে, একটী একটী করিয়া সমুদয় বিষয় ছেদন করিবে। বিষয়সুখ পরিহার ইহার মধ্যে কত সুখ? এ সময়ে পরিবারের সঙ্গে সম্বন্ধ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। স্ত্রী পুত্র কন্যা ভাই ভগিনী পরিচিত অপরিচিত ব্যক্তি, ইহাদিগের সঙ্গে নূতনবিধ সম্পর্ক হইবে। পুরাতন সম্পর্কের রজ্জু ছিন্ন হইয়া নূতন সম্পর্কের রজ্জুতে বদ্ধ হইবে। নূতন সম্পর্কে নূতন আনন্দ। এক দিকে সংসারে বিরাগ অন্য দিকে ঈশ্বরে অনুরাগ। দয়াময় নাম করিতে করিতে কত সুখ হইবে। অন্য সময়ে এক টাকা পরিত্যাগে কষ্ট হয়, যদি দয়াময় নামসুধা পান করিয়া মত্ত হই, তবে অনায়াসে সমস্ত পরিত্যাগ করিতে পারিব। মত্ততার অবস্থা না হইয়া যে ত্যাগ করে, সে পুনরায় সংসারে ফিরিয়া আইসে। অনুরাগে বিরাগী না হইলে কেহ ত্যাগী হইতে পারে না। মত্ততার অবস্থায় যাহা করিবে তাহা চিরদিন থাকিবে। সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড যাঁহাতে সর্ষপকণার ন্যায় ভাসিতেছে, তাঁহাতে যিনি সুখ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারই বৈরাগ্য চিরস্থায়ী।

ব্রাহ্মগণ! যদি এই বৈরাগ্য সাধন করিতে চাও, তবে জীবনে বৈরাগ্য ও অনুরাগ সাধন কর। যদি তোমরা কেবল বৈরাগ্য সাধন কর, তবে পরস্পরকে পরিত্যাগ করিবে, একাকী নির্জনে গিয়া সুখী হইবে না, বিরক্ত হইবে। প্রেমবৈরাগ্যে সংসার বাসনা পরিত্যাগ করিলে হৃদয় মধ্যে অমৃতসাগরে ডুব দিতে পারি। ত্যাগ

বাহ্যিক ব্যাপার। অনুরাগী বৈরাগী সুখ ছাড়িতেছেন, ক্রমাগত ছাড়িতেছেন, বিষয়ীরা তাহা বুঝিবে না। যতই তিনি মত্ত হইতেছেন, ততই তিনি দীনভাবাপন্ন হইতেছেন। বাহিরের ধন সম্পদ কিছুতেই তাঁহার ব্যাঘাত জন্মাইতে পারিতেছে না। স্বর্গ হইতে জলপ্লাবন আসিয়া সংসারের সমুদয় বস্তু ধৌত হইয়া যাইতেছে। নূতন ফুল ফুটিতেছে, পৃথিবীর ফুল পড়িয়া যাইতেছে, নূতন জলে পুরাতন জল তিরোহিত হইতেছে। নূতন জীবনে পুরাতন জীবন শেষ হইতেছে, নূতন সম্পর্কে পুরাতন বিষয়সম্পর্ক চলিয়া যাইতেছে। প্রেমের সঙ্গে বৈরাগ্য আসিল, ভক্তি তাহার অনুগামিনী হইলেন। বৈরাগীর জীবনে প্রেম আসিল, ভক্তি আসিল, ভক্তি প্রেমে যথার্থ ভাই ভগিনী-ভাব প্রকাশ করিল।

যে বৈরাগ্য সকল প্রকারের সুখ হৃদয় হইতে তাড়াইয়া দিয়া ভক্তিশূন্য মরুভূমি সমান হইল, সে বৈরাগ্য শুষ্ক বৈরাগ্য, উহা অতি কঠোর। যে বৈরাগ্য দ্বারা পবিত্র হইলে, সাধু হইলে উহা প্রেম-সহ ভ্রাতার ন্যায় হৃদয়ে বাস করিল, তদ্দ্বারা সুখী হইবে; হৃদয়ে স্বর্গ অবতীর্ণ হইবে। সংসারের সুখসম্ভোগ ত্যাগ করিয়া যাহারা আপনাদিগকে সর্ব্বত্যাগী মনে করে তাহারা বৈরাগী হয় নাই, তাহারা পৃথিবীর বৈরাগী। যদি এক গুণ দিয়া দশ গুণ লাভ না হইল, তবে তাহাকে ত্যাগ কি প্রকারে বলিব? ত্যাগীর কখনও অভাব হয় না, সুতরাং কেহ ত্যাগ করে না। সংসারের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া কিছুই হ্রাস হইল না; বরং তাহার বৃদ্ধিই হইল। প্রেমিক সংসারসুখ ছাড়িয়া মনের ভিতরে গিয়া দেখিলেন ভিতরে কেবলই বৃদ্ধি, সুখ বৃদ্ধি হইতেছে, প্রেম বাড়িতেছে। তাঁহার বাহ্যিক

দীনতা দুঃখ দারিদ্র্য আন্তরিক ধন সঞ্চয়ের পরিচয় দেয়। সম্বলবিহীন, ধন সম্পত্তি নাই দেখিয়া সকলে তাঁহাকে ঘৃণা করিবে, কিন্তু তাঁহার অনেক ধন আছে বলিয়াই তিনি নির্ধন। যেখানে অন্তরে আনন্দচন্দ্রের জ্যোৎস্না, সেখানে বাহ্যিক অন্ধকারে কি করিবে? অন্তরে তাঁহার প্রফুল্লতা, বাহিরে তাঁহার ম্লান ভাব। বাহিরে তিনি মরুভূমি, অন্তরে তাঁহার সরোবর। বাহিরে তিনি উন্মাদ, অন্তরে তিনি জ্ঞান-জ্যোতি। সাধু প্রমত্ত হইয়া মরিতে যাইতেছেন, দুঃখ দীনতাকে আলিঙ্গন করিতেছেন, এই ভাবিয়া জগতের লোকে তাঁহাকে অতি হীনাবস্থ মনে করিতেছে, কিন্তু তাহারই মধ্যে সেই সময়ে তাঁহার হৃদয়ে সহস্র গুণ সুখ শান্তি। যাহারা আপনাদিগকে সুখী মনে করিল, তাহারাই দুঃখী, এই সাধুই সুখী। সংসারে যে অপমান পাইল, ঈশ্বরের রাজ্যে সে মান লাভ করিল। ধূলি উন্নত হইল, উন্নত নত হইল। ধনে নির্ধনতা, আনন্দে ম্লানতা কি প্রকারে সমঞ্জস হয়, সংসারী লোকে ইহার কিছুই বুঝিতে পারে না। ভক্ত বৈরাগীর জীবনের লীলা কে বুঝিবে? এখানে আলোক অন্ধকারের সামঞ্জস্য। জগৎ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল, জগৎকে তিনি হৃদয়ে স্থান দিলেন। ভিতরে তাঁহার ধন ধরে না, বাহিরে তাঁহার দারিদ্র্য। হৃদয়ে স্বর্গ, বাহিরের দুঃখ দরিদ্রতা তাঁহাকে কি প্রকারে স্পর্শ করিবে? ব্রাহ্মগণ! পৃথিবীর লোকে যত অপমান বর্ষণ করিবে ততই জানিবে আমরা স্বর্গের দিকে যাইতেছি। পৃথিবী কি আমাদিগকে অসুখী করিতে পারে? ধন যদি নির্ধনতার কারণ হয়, তাহাই প্রার্থনীয়, সুখ যদি বাহ্য দুঃখের আকার ধারণ করে, তাহাই আকাঙ্ক্ষণীয়।

ব্রহ্মদর্শন।

রবিবার, ১৩ই বৈশাখ, ১৭৯৭ শক; ২৫শে এপ্রেল, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

অনেক দিন ব্রহ্মদর্শনের কথা বলা হয় নাই; আজ সেই বিষয়ে কিছু বলিব। ব্রহ্মদর্শন আন্তরিক, সকলেই মুখে বলে। চক্ষু নিমীলিত করিয়া বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া বাহিরের আকর্ষণ হইতে মন বিচ্ছিন্ন করিলে, হৃদয়-কপাট বদ্ধ করিলে, ব্রাহ্মগণ ভিতরে অন্ধকার মধ্যে নির্জনে বিশ্বাসচক্ষে ইন্দ্রিয়ের অতীত, ঈশ্বরকে দেখিতে পান। সে স্থান সমুদয় ইন্দ্রিয়ের অতীত, দর্শনের অতীত, চক্ষু সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না। বাহিরের বিষয় সকল সেখানে প্রবেশ করিয়া মনকে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে না। এই প্রকার সাধন প্রাচীন হিন্দুসম্প্রদায় মধ্যে বহুকাল প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, সম্প্রতি ব্রাহ্মগণও আত্মার অভ্যন্তরে নিমীলিত নয়নে ব্রহ্মদর্শনে চেষ্টা করেন। ঈদৃশ চেষ্টা হইলে, চেষ্টার ফল হইবেই হইবে। ধন্য সেই সাধন যাহা বিষয় হইতে অতীন্দ্রিয় উচ্চ স্থানে লইয়া যায়! এ সময়ে বিষয় আর মনকে অপহৃত করিতে পারে না, চঞ্চল করিতে পারে না। ব্রহ্মদর্শনের সুধাপান অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার, কিন্তু উহার গুণ বর্ণনা করা উপদেশের উদ্দেশ্য নয়। সাধক যখন হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিলেন বাহিরের বিষয় জ্ঞান চলিয়া গেল, তখন তিনি বলিলেন, বিশ্বাস ও ভক্তি-চক্ষুতে এই ত তাঁহাকে দেখিতেছি, তিনি প্রাণের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। যাই বলিলাম এই দেখিতেছি, বলিতেই দেখা হইল, আমাদিগের দৃষ্টির সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। এই অবস্থায় আত্মা তাঁহাতে নিমগ্ন

হইয়া যায়, ভিতরের বাহিরের প্রভেদ বিলুপ্ত হয়। ভিতরের দর্শন বাহিরের দর্শন দুই এক হইয়া যায়। চক্ষু নিমীলিত করিয়াই দেখি আর উন্মীলন করিয়াই দেখি, এ উভয়ের প্রভেদ থাকে না। ইহার একটী উৎকৃষ্ট একটী নিকৃষ্ট বলিতে পারা যায় না, ভিতরের দর্শনও উৎকৃষ্ট, বাহিরের দর্শনও উৎকৃষ্ট।

চক্ষু নিমীলিত করিয়া সমুদয় বস্তুর চিন্তা হইতে নিবৃত্ত হইলে ঈশ্বরকে দেখা যায়। সর্ব্বপ্রকার কোলাহলশূন্য না হইলে অতীন্দ্রিয় দর্শন কি প্রকারে সম্ভবে সত্য, কিন্তু দক্ষিণে বামে কেবলই বিষয়ের আড়ম্বর, সকল দিকে কোলাহল, ইহার মধ্যে চক্ষু খুলিবা মাত্র যদি ঈশ্বরকে দেখা যায় তবে সেই অবস্থা উচ্চাবস্থা। আত্মা স্বভাবতঃ জিজ্ঞাসা করে, তাঁহাকে ভিতরে দর্শন করিলাম, বাহিরে দেখিব না কেন? পৃথিবীতে কোলাহল অনেক, সাংসারিক বিভীষিকা অনেক, সংসারের সুখে হৃদয় মন বিক্ষিপ্ত ও চঞ্চল হয়। এজন্য সাধনের বাল্যাবস্থায় পৃথিবী ছাড়িয়া হৃদয়ে প্রবেশ করি, চক্ষু মুদ্রিত করি, সেখানে বাহিরের বিষয় গিয়া বিরক্ত করিতে পারে না; সুতরাং উপাসনায় নিমগ্ন হই। এ সময়ে অতি সামান্য কারণে মন বিক্ষিপ্ত হয়, হৃদয়ের একাগ্রতা নষ্ট হয়, মন বাহিরে যায়, কর্ণ বাহিরের শব্দ শুনে, চক্ষু বাহিরের বিষয় দেখে। বাহিরে যে বিষয় দর্শন করিলাম, মনের ভিতরেও উহার ছায়া ঘোরে। সাধন করিতে করিতে অনেক চেষ্টার পর মন শান্ত হয়। মন শান্ত না হইলে একাগ্রতা হয় না, একাগ্রতা না হইলেও ব্রহ্মদর্শন হয় না। সুতরাং প্রথমে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া মনকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া ঈশ্বর-দর্শন করিতে হয়। এ ত বাল্যাবস্থার কথা। এখন ত আর

তুমি বালক নও। এখনও কি তোমায় শুদ্ধ চক্ষু নিমীলন করিয়া ঈশ্বরকে দেখিতে হইবে?

সমুদয় দিন চক্ষু খুলিয়া থাকিতে হইবে, দিনের মধ্যে পাঁচ মিনিট মুদ্রিত করিয়া ব্রহ্মদর্শন করিলে, ইহা স্বাভাবিক অবস্থা নহে। এরূপ সাধনকে উৎকৃষ্ট সাধন বলিতে পারি না, ইহাতে অনেক ঘণ্টা বাদ দিতে হয়, অতি অল্প সময় ব্রহ্মদর্শন-সুখ হয়। এরূপ অবস্থায় প্রাণপণ করিয়াও কেহ আত্মাকে বিষয়-কোলাহল মধ্যে স্থির রাখিতে পারে না। হৃদয় হইতে বাহির হইয়া বহির্জগতের সমুদয় আকাশের সমুদয় স্থানে ঈশ্বরকে দেখিতে হইবে। ব্রহ্মদর্শন অভ্যাসে এত ক্ষমতা জন্মান আবশ্যক যে, ভিতর হইতে বাহির হইয়া যে দিকে দেখিব, দেখিব ফল পুষ্প তরু লতা পর্ব্বত কানন আকাশ সরোবর সকলই ব্রহ্ম আবির্ভাবে হাসিতেছে। উচ্চতর পর্ব্বত-শিখরে উঠিলাম সেখানে ঈশ্বর, জলস্রোতের নিকটে গমন করিলাম সেখানে ঈশ্বর, সমুদ্রের উজ্জ্বল তরঙ্গজ্যোতি অবলোকন করিলাম সেখানে ঈশ্বর, কেবল শূন্য আর কিছুই নাই, সেখানেও ঈশ্বর। সকল স্থান ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ, সর্ব্বত্র কেবলই তাঁহার প্রেমমুখ। চক্ষু নিমীলিত করিয়া ভিতরে আশ্চর্য্য শোভা দেখিতে পাইলাম, দেখিয়া প্রাণ তুষ্ট হইল, হৃদয় সুশীতল হইল। চক্ষু খুলিয়া গেল আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। এ কি? বাহিরের রাজ্য কি অপদেবতার রাজ্য? যাঁহার ঘর ভিতরে তাঁহারই রাজ্য বাহিরে, সুতরাং যে হৃদয় বাহিরে তাঁহার দেখা পাইল, তাহার দর্শনের দ্বার আর অবরুদ্ধ হইল না। সে যখন সংসারে ফিরিয়া আসিল, তখনও সেখানে তাঁহাকে দর্শন করিল। ঘরে গিয়া যাঁহার

প্রেমমুখ দেখিতে পাইল, বাহিরে চারিদিকে তাঁহার সম্বন্ধে সেই প্রেমমুখ প্রকাশিত রহিয়াছে। ভিতরে বাহিরে তাহার কত আনন্দ! চক্ষু মুদ্রিত করিলেও প্রাণেশ্বরের মুখ দর্শন করিব, চক্ষু খুলিলেও তাঁহার মুখ দেখিতে পাইব, এই অবস্থা প্রার্থনীয়।

বাহ্যজগতের দর্শন অতি মনোহর দর্শন। ভিতরে বাহিরে একই দর্শন এবং দুইই সমান বলা যায়। কোন কোন অবস্থাতে একটীকে বিশেষ বলিয়া অনুভূত হয়। কাহার পক্ষে কোন্‌টী কোন্ সময়ে অধিক সুখপ্রদ হইবে বলা যায় না। অন্তরে বাহিরে দর্শন করিবার তত্ত্ব যদি জানিয়া থাক সাধন কর। অন্তরে দেখিতে দেখিতে এমন সাধন কর যে, কার্য্যালয়ে গিয়া বিষয়ের মধ্যে থাকিলে তাহাতেই বা ক্ষতি কি? সমুদয় দিন চক্ষু খুলিয়া থাকিলে তাহাতেই বা ক্ষতি কি? চক্ষের সমক্ষে তিনি আত্মাকে প্রকাশ করিলেন দেখিয়া ভক্তিজলে ভক্তের নয়ন পূর্ণ হইয়া গেল। সপ্তাহে সপ্তাহে ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়াছ, হৃদয়ের মধ্যে তিনি যে মনোহর মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছ, এখন শরীর মন সংযত করিয়া যাহাতে অন্তরে বাহিরে তাঁহাকে দেখিতে পাও এমন অবস্থা গ্রহণ কর। এমন অবস্থা লাভের জন্য যত্ন প্রণান্তেও ছাড়িও না। বরং আর সকল ছাড়িয়া এই অবস্থা লাভের জন্য যত্নশীল হও।

যখন ছেলে বেলা ছিল তখন তাঁহাকে দেখিবার জন্য হৃদয়ের মধ্যে যাইতাম। বাহিরের কোলাহলে উত্তেজিত হইয়া দৌড়িয়া ঘরের মধ্যে গিয়া বসিতাম। এটী বালক বালিকাদিগের অভ্যাস, আর এখন ইহাতে হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না। এখন আর আমরা বালক বালিকা নহি, এখন আমাদের অনেক বয়স হইয়াছে, জ্ঞান

চৈতন্য জন্মিয়াছে। সংসার আমাদিগের মন বিক্ষিপ্ত করিবে এখন আর এ ভয় করিলে চলে না। এখন এমনই চাই যে, বিশ্বাসচক্ষু তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে, এখন সর্ব্বত্র তাঁহাকে দেখিতে পাই। আমাদিগের হৃদয়ের সঙ্গে তাঁহার পাদপদ্ম এমনই সংলগ্ন হইয়া যাইবে যে, তাঁহার এবং আমাদিগের মধ্যে কোন ব্যবধান বা বিঘ্নের কারণ উপস্থিত হইবে না। এমন কথনও বলিতে হইবে না যে, হৃদয়ের মধ্যে গিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না, চক্ষু খুলিয়া চারিদিক কেবল শূন্য প্রতীত হইল। বাহিরের ধন রত্ন বাহিরের চক্ষু দেখিল, মনের চক্ষু তাঁহাকে দেখিল। লোকে মনে করিল সাধক বাহিরের বস্তু দেখিতেছেন, কিন্তু বাস্তবিক তিনি সেই সময়ে মনের মনকে দেখিতেছেন, বাহ্য বস্তু অতিক্রম করিয়া সর্ব্বত্র ব্রহ্মের আবির্ভাব দর্শন করিতেছেন। ভিতরে বাহিরে ব্রহ্মদর্শন তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন যেন জীবন থাকিতে থাকিতে আমাদিগের সেই দিন আইসে। তখন চক্ষু খুলিয়া দেখা ভিন্ন আর কোন কার্য্য থাকিবে না। যতদিন আমাদিগের জীবন এইরূপ না হয়, যেন আমরা তাঁহার দ্বারে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকি। এরূপ না হইলে আমাদের যন্ত্রণার শেষ নাই।

সংসারপথে পরিশ্রান্ত পথিক পাঁচ মিনিটের দর্শনে পরিতৃপ্ত হয় না। সংসারের কর্ম্মে দশ ঘণ্টা যায়। বিষয়ের ভারে অবসন্ন হইয়া, নিস্তেজ হইয়া, অতি অল্প সময় ঈশ্বরকে দেখিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করে। এই অল্প সময়ও আবার সাধন করিতেই গেল। আর কতক্ষণ সাধনে থাকিবে, এখনই কার্য্যালয়ে যাইতে হইবে। এই যে সময় আগতপ্রায়, আজ বুঝি আর দেখা হইল না, বিনা

দর্শনে কার্য্যালয়ে যাইতে হইবে। কাতরে চীৎকার করিয়া দর্শন প্রার্থনা করিল, বড় হইল ত পাঁচ মিনিটের জন্য সাক্ষাৎকার হইল, কিন্তু তাড়াতাড়ি সম্ভোগ করিতে না পারিয়াই কার্য্যালয়ে চলিয়া গেল। এইরূপ করিয়া সাধকের জীবন ভারবহ হইয়া উঠিল, আর তাহার কিছু ভাল লাগে না। এক ঘণ্টা কাল তাঁহাকে দেখিব তাহাও ঘটে না। সে সময়েও তাড়াতাড়ি করিতে হয়। লোভী আত্মার অল্প সময়ে লোভের বিরাম হয় না। অনেক সময় অন্য বিষয়ে দিলে আর চলে না, অধিকাংশ সময় অন্তরে থাকা যায় না, বাহিরে থাকিতে হয়, সুতরাং বাহিরে তাঁহাকে না দেখিলে আর চলিল না। যখন ইচ্ছা তখনই তাঁহাকে দর্শন করিব এ প্রকার সাধন এখন নিতান্ত প্রয়োজন। অন্তরে বাহিরে দেখিতে দেখিতে ভক্তি দ্বারা তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারিব। ভক্তবৎসল বলিতে বলিতে অন্তর বাহির পূর্ণ হইয়া যাইবে। যেমন তোমাকে এবং ভাই ভগ্নীগণকে সহজে অনায়াসে বিনা কষ্টে দেখিতেছি, তেমনই সহজ অবস্থায় যখন তাঁহাকে দেখিব, মন গভীর আনন্দে নিমগ্ন হইবে। চক্ষু বাহিরে রহিয়াছে, লোকে বলিবে এ ব্যক্তি উপাসনা ভুলিয়া গেল, এ কেবল বাহিরের বস্তুই সর্ব্বদা দর্শন করে, দেখিয়া উপহাস করিবে। গভীরভাবে তথায় তাঁহার প্রেমমুখ বাহিরে দেখিতেছি, লোকে বুঝিল না। শরীর যাহা করিতে চায় করুক, কিন্তু মন তাঁহাতে মগ্ন রহিয়াছে, এ অবস্থা কি প্রার্থনীয় নহে? যখন যেখানে যাই, সেই ব্রহ্মমূর্ত্তি আকাশে বিরাজমান। শত্রুর ঘরে যাই, বন্ধুর ঘরে যাই, সেই মনোহর মূর্ত্তিতে পরিবেষ্টিত। আকাশ, পৃথিবী, হৃদয় সেই মুখচন্দ্রে ঘেরিল। আর ব্রহ্মদর্শন ছাড়িতে পারি

না। ভিতরে বাহিরে ঈশ্বর এমনই করিয়া ঘেরিয়া ফেলিলেন যে, পলায়ন করিতে চাহিলেও আর পলায়ন করিবার উপায় রহিল না। যে দিকে যাই সেই দিকে তিনি, তিলার্দ্ধ কাল আর এখন তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারি না। আমার কি সৌভাগ্য উপস্থিত! এ সকল দেখিয়া কি বলিব, মনে এই আলোচনা উপস্থিত। আর কি বলিব, জানিলাম ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্রাণের ধর্ম্ম। সকলে নিয়ত ঈশ্বরের নাম সাধন কর, অন্তরে বাহিরে তাঁহাকে দেখিয়া কৃতার্থ হও।

ব্রহ্মদর্শনের উপায়।

রবিবার, ২৭শে বৈশাখ, ১৭৯৭ শক; ৯ই মে, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

ব্রহ্মদর্শনের নিগূঢ় কথা সকলের নিকট বলা যায় না। যাহা বলিলে আদর হয় না, তাহা বলিলে অনিষ্ট সম্ভব। নিগূঢ় তত্ত্ব তাহাদিগের নিকট প্রচার করা কর্ত্তব্য যাহারা স্বভাবতঃ উহা আদরের সহিত গ্রহণ করে; তাহাদিগেরই সে সকল তত্ত্বে অধিকার। শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়া উহা সাধন দ্বারা জীবনে পরীক্ষা করা উচিত। ব্রাহ্মের যদি ব্রহ্মদর্শন না হইল, জীবন বৃথা। সুখের যন্ত্র এই সংসার শ্মশান হইল। তোমাদিগের সম্বন্ধে ব্রহ্মদর্শন ইহ পরকালের সম্বল। আনন্দ, সুখ, শান্তি, ব্রহ্মদর্শন বীজমন্ত্রের উপরে নির্ভর করে। তোমাদিগের বিশ্রাম, পুণ্য পবিত্রতা, সুখ, শান্তি সকলই ব্রহ্মদর্শন। এই ব্রহ্মদর্শনের কথা তোমাদিগের নিকট বলিব না ত আর কোথায় বলিব? একাকী নির্জনে চিন্তা করিতে করিতে কে না আমাদিগের মধ্যে ব্রহ্মকে দর্শন করিয়াছেন?

ব্রহ্মদর্শনের নিগূঢ় তত্ত্ব বিদ্যুতের ন্যায় আমাদিগের কাহার না হৃদয়াকাশে প্রকাশিত হইয়াছে? তোমাদিগের জীবনে সাধক হইয়া এরূপ ঘটিয়াছে, বারবার না ঘটুক অন্ততঃ একবারও ঘটিয়াছে। যুক্তির অতীত, উপদেষ্টার উপদেশের অতীত, এমন সাধন অতীব নিগূঢ়, উহা স্বয়ং সাধকের দর্শনপথে আসিয়া উপস্থিত হয়। সাধক চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া ব্রহ্মের নিকট হইতে উহা লাভ করেন। উহা দর্শন দ্বারা শিক্ষা করা যায়। অন্য উপায়ে লাভ করিতে পারা যায় না। সেই জন্য বলি কেহ উহা অনুমান দ্বারা বুঝিতে বা শিক্ষা করিতে পারে না। নির্জনে বসিয়া সাধন কর, তোমাদিগের জীবনে নিগূঢ় তত্ত্ব আবির্ভূত হইবে। প্রেমমুখ দর্শনে মত্ত হইয়া সে মুখের কি প্রকার লক্ষণ, তখন হৃদয়ের কি প্রকার অবস্থা হয়, আপনি জানিয়াছি। অধিক পরিমাণে জানি আর না জানি উহার মূলতত্ত্ব বুঝিয়াছি। আমি যদি কিছু পাইয়া থাকি, বিনিময় করা যাইতে পারে। কেন না পরের সঙ্গে বিনিময় করিলে আরও উহা উজ্জ্বল হইবার পক্ষে সহায় হয়। একদিন বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে জানিলাম তিনি দর্শন দিয়া মনুষ্যের মন মোহিত করিয়া পরাস্ত করেন। এই তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা, তিনি স্বয়ং দেখা দিলে দেখিতে পাওয়া যায়।

ঈশ্বর-দর্শনের মধ্যে দুইটী ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ আমি ভক্তিতে ও প্রেমেতে উচ্ছ্বসিত হইয়া তাঁহাকে দেখিতে পাই। এই সময়ে হৃদয়ের প্রেম ভক্তি অনুরাগ উচ্চ পর্ব্বত-শিখরে উত্থিত হইবার ন্যায় উচ্চ সীমা প্রাপ্ত হয়। প্রেম, ভক্তি, অনুরাগ পরিণতাবস্থা লাভ করিলে ব্রহ্মদর্শন হয়। এই সকল পরিণত না

হইলে কেহ কি ব্রহ্মদর্শন করিতে পারে? আমি ব্রহ্মকে দেখিয়াছি এ কথা মুখে বলিলে কি হইবে? ফলতঃ ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ, ভক্তি, ভালবাসা একত্র হইয়া প্রস্ফুটিত হইলে উহা ব্রহ্মদর্শনে পরিণত হয়। দর্শনে অভিলাষ হৃদয়কে উন্নতাবস্থায় টানিয়া লইয়া যায়, কেন না উন্নত না হইলে ঈশ্বরকে দেখা যায় না। ঈশ্বর যেন ঊর্দ্ধে লুক্কায়িত আছেন, ঊর্দ্ধে গিয়া তাঁহাকে দেখিতে হয়। এই সময়ে হৃদয় উদ্যানের লাবণ্য সৌন্দর্য্য বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই দর্শনের আনন্দ অতি উচ্চ আনন্দ। আমি মনুষ্যজন্ম ধারণ করিয়া এই অসার শরীর লইয়া জঘন্য সংসারের স্ত্রী পুত্র বন্ধু বান্ধব বাহিরের সমুদয় বস্তু ভুলিয়া পাপ মনে তাঁহাকে দর্শন করিতেছি, ইহার অপেক্ষা আর আহ্লাদের কারণ কি আছে? বস্তুতঃ এই আনন্দ আমাদিগের হৃদয়ের সমুদয় উৎকৃষ্ট উচ্চ উচ্চ ভাবগুলিকে প্রস্ফুটিত করিয়া ক্রমশঃ আনন্দের উপর আনন্দ উপভোগে সমর্থ করে। জীবনের এই অবস্থা অতি উচ্চ অবস্থা, অতি উৎকৃষ্ট অবস্থা। যাঁহারা ব্রহ্মকে দেখিতে চান, তাঁহারা যেন হৃদয়কে প্রেম ভক্তি অনুরাগের উন্নত সোপানে তুলিতে যত্ন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের জীবন অতি উন্নত পবিত্র শান্তির অবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

এই ত আমাদিগের দিক হইতে দেখিবার তত্ত্ব জানিলাম। হৃদয়কে উন্নত করিয়া ব্রহ্মের দিকে দৃষ্টি করিলে আনন্দ হয়, বিশ্বাস, প্রীতি, ভক্তি, অনুরাগ বর্দ্ধিত হয়, দিন দিন নির্ভর বাড়িতে থাকে। এখন ইহার অপর দিক দেখা যাউক। ব্রহ্মকে দর্শন করিতে গিয়া আমরা কি দেখিতেছি, আমাকে তিনি দেখিতেছেন আমি তাঁহাকে দেখিতেছি। জড় বস্তু দেখিয়া আমাদের কত আনন্দ হয়, জড়ের

সমুদয় সৌন্দর্য্য আমাদিগের নিকটে প্রতিভাত হয়, কিন্তু উহা ছাড়িয়া চিন্তা আর অধিক দূর যায় না। ধর্ম্মের মধ্যে বিশ্বাস-নয়নে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই মুগ্ধ হইবার বিষয়। আমার চক্ষু তাঁহাকে দেখিতেছে, আর আমি তাঁহাকে চিন্তা করিতেছি, এ দুই পরস্পর ভিন্ন। কারণ ইহার একটী দর্শন, একটী স্মরণ। ইহার মধ্যে আবার আমি তাঁহাকে দেখিতেছি, তিনি আমাকে দেখিতেছেন, এই যে চক্ষে চক্ষে মিলন ইহাই পূর্ণ ব্রহ্মদর্শন। এই মিলনে অশ্রু কম্প রোমাঞ্চ প্রভৃতি লক্ষিত হয়। যেখানে সমুদয় স্বর্গীয় প্রেমের জ্যোৎস্না নিপতিত হইয়াছে, সেই স্থানে সাধকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। তিনি মনে মনে বুঝিলেন, সাধারণ স্থানে দৃষ্টি পড়ে নাই। আর সেখান হইতে নয়ন ফিরাইবার ক্ষমতা নাই, উহা মুগ্ধ হইয়া সেই স্থানেই রহিয়া গেল। ফলতঃ এক দিক হইতে দৃষ্টি যাইতেছে, অন্য দিক হইতে দৃষ্টি আসিতেছে, এই দুয়ের মিলনে যে ব্রহ্মদর্শন হয়, তাহাই আমাদিগের বিশেষ লক্ষ্য। অনেকে দেখেন, কিন্তু সেই সকল লোক বিরল, ঈশ্বরকে দেখিতে গিয়া যাঁহাদিগের চক্ষে চক্ষে মিলন হয়। যাঁহারা এইরূপে ঈশ্বরকে নিরীক্ষণ করেন, তাঁহারা কৃতার্থ হন। কেবল তাঁহাকে দর্শন, দর্শনের অর্দ্ধাংশ মাত্র। ইহাতে অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য, পবিত্রতা ও মিষ্টতা চলিয়া যায়। আমি যেমন ছিলাম, তদপেক্ষা উন্নত প্রেম, ভক্তি, অনুরাগ আমাকে উচ্চ স্থানে লইয়া গেল, বিশ্বাস-নয়নে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। তাঁহার দিকে যে দৃষ্টি গেল, তাহাতে তাঁহার চক্ষু নিপতিত হইল। ইহাতে শুধু ভক্তি বিশ্বাস বাড়িল তাহা নহে, আমার মধ্যে স্বর্গ ছিল না, নূতন স্বর্গ দেখিতে পাইলাম। সেই

চক্ষু আমার চক্ষুকে আক্রমণ করিল। মনে করিয়াছিলাম, একবার তাঁহাকে দেখিয়া নমস্কার করিয়া ঘরে চলিয়া যাইব; কিন্তু তিনি প্রীতিকটাক্ষে এমনই দৃষ্টি করিলেন যে, বিস্মিত হইয়া ভূতলে পড়িলাম, প্রাণ মন মুগ্ধ হইয়া গেল। অমন করুণাদৃষ্টি পার্থিব জননীর স্নেহ হইতেও অনুভব করা যায় নাই।

তিনি আমাকে দেখিলেন, আমি তাঁহাকে দেখিলাম, উভয় দৃষ্টির মিলন একটা স্বর্গের অদ্ভুত ব্যাপার। তোমাদের জীবনে উহা সাধন কর। ধর্ম্মজগতের নিগূঢ় সত্য সকল পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ কর। এরূপ দৃষ্টি লাভ জীবনে প্রতিদিন হয় না। এ প্রকার প্রেমবৃষ্টিবাণে বিদ্ধ হইয়া পাপী পরাজিত হয়, আর পলায়ন করিতে পারে না। ঈশ্বর পরাজয় করিবার সময় উপস্থিত দেখিয়া পাপীর উপরে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করেন। তিনি দেখিলেন পাপী তাঁহা হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছে, মনে করিতেছে, আমি উপাসনার সময়ে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে দেখিতে পারি, নাও পারি, তখন তিনি তাহাকে দৃষ্টিবাণে বিদ্ধ করিলেন, আর তাহার পলাইবার সামর্থ্য থাকিল না। যখন তাঁহার দৃষ্টি আমার উপরে পড়িল, দৃষ্টি-রজ্জুতে বদ্ধ হইয়া পড়িলাম। আমরা তাঁহাকে আর দেখিতে না চাহিলেও তিনি বলপূর্ব্বক আমাদিগকে আপনাকে দেখাইবেন। পাপাচরণ করিয়া মনে করিলাম, জননী আর এ দুরন্ত সন্তানকে দেখিবেন না, তাঁহার সম্মুখে যাইতে ভয় হইল। কিন্তু একবার সাহস করিয়া যাই তাঁহার সম্মুখে গেলাম, তিনি কিছু বলিলেন না, কিন্তু মা এমনই এক অসাধারণ দৃষ্টিতে সন্তানের প্রতি তাকাইলেন যে উহা দেখিবা মাত্র মূর্চ্ছা হইল। মাতে এত দয়া, মার দৃষ্টি এমন দৃষ্টি, সে দৃষ্টি সন্তানের উপরে

পড়িল। আর সে তাকাইতে পারে না, মুখও ফিরাইতে পারে না। জননীর স্নেহদৃষ্টিতে তাহার পাষণ্ড ভাব চলিয়া গেল। সন্তানের প্রতি জনক জননীর এরূপ দৃষ্টি সহজ ব্যাপার নহে। এক মিনিট তাকাইতে গিয়া আর চক্ষু ফিরিবে না, সেই দৃষ্টিতে ক্রমে আরও আকৃষ্ট হইতে থাকিবে। পাপী মনে করিয়াছিল একবার ব্রহ্মকে দেখিয়া চলিয়া যাইবে ; দর্শন তাহার কর্ত্তৃত্বাধীন, ইচ্ছার অধীন, হয় সে তাহার দৃষ্টি ব্রহ্মের উপরে রাখিতে পারে, নয় সে উহা ফিরাইয়া সংসারে লইয়া যাইতে পারে। তুমি আপনাকে স্বাধীন বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়াছিলে, এক মিনিট দুই মিনিট তাঁহার দিকে তাকাইলে, দেখ সেই দৃষ্টি তোমার দৃষ্টিকে বাঁধিয়া ফেলিল। এখন অবিশ্বাসী হইয়া ফিরিয়া যাও দেখি? আর কি ক্ষমতা প্রকাশ করিবার সামর্থ্য আছে? একেবারে চক্ষু স্থির হইয়া গেল। এখানে এত বিপদ বুদ্ধি তাহা পূর্ব্বে স্থির করিতে পারে নাই। ব্রহ্মের দৃষ্টিতে পাশবদ্ধ হইতে হয়, অগ্রে ইহা কে জানিত? বস্তুতঃ একবার ব্রহ্মের দৃষ্টিজালে পড়িলে আর তাহা হইতে বাহির হইতে পারা যায় না। জগতের বন্ধু বান্ধব ভাই ভগিনীর প্রেমজালে স্নেহজালে বদ্ধ হইয়া বশীভূত হইতে হয়, তাহারা সমক্ষে আসিলে নয়ন আর ফিরান যায় না, তাহারা হতবুদ্ধি করিয়া ফেলে, হৃদয় মন একেবারে কাড়িয়া লয়। যদি পৃথিবীর এই ব্যাপার হইল, কি জানি স্বর্গের দৃষ্টি প্রবল বাত্যার ন্যায় আমাদিগের মনকে কেমন তটস্থ করিয়া ফেলিবে। যখন সেই সুকোমল দৃষ্টি সাধকের উপর নিপতিত হয়, তখন কিরূপ অপূর্ব্ব ভাব হয়, কোন শাস্ত্রে ইহা বলিতে পারে না, কেবল সাধকের জীবনেই উহার তত্ত্ব প্রকাশিত হয়।

লোকে দর্শন কাহাকে বলে? নয়নে নয়নে সম্মিলন। ঈশ্বরকে এই প্রকারে দর্শন করাই আমাদিগের স্বর্গ। ঈশ্বর আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি দিন, যেন এই প্রকারে তাঁহার সৌন্দর্য্য চিরদিন দেখিতে পাই। আমাদিগের সমুদয় অনুরাগ ভক্তি যেন তাঁহার দর্শন লাভের জন্য নিযুক্ত হয়। "তোমার চক্ষু আমার চক্ষু যেন এক হইয়া যায়" এ প্রার্থনা কখনও অগ্রাহ্য হইবার নহে। তিনি যে আমাদিগকে প্রেমনয়নে দেখিতেছেন, তাঁহার সেই দৃষ্টি আমাদিগের উপর নিপতিত রহিয়াছে, আমাদিগের দৃষ্টি তাহা দেখে না। আমরাই কেবল তাঁহাকে দেখিতেছি আমরা এরূপ মনে করি। এ অবস্থায় তাঁহার করুণা ভাবিয়া ব্রাহ্ম যদি আত্ম-সমর্পণ করেন, সে আত্ম-সমর্পণ মানি না। যে দর্শনে যে ধ্যানে দুই দৃষ্টি মিলিত হইল না, সে দর্শন সে ধ্যান কিছুই হইল না। ফলতঃ তাঁহার সঙ্গে মিলন হইলে কোন ভয় কোন ভাবনা থাকে না। আশ্চর্য্য এই, পাপের সময়েও এমন শুদ্ধ নয়ন আমার দিকে তাকাইয়া আছে। এ দৃষ্টি কল্পিত দৃষ্টি নয়। আকাশে অগণ্য চক্ষু কল্পনা করিয়া বলিতে পারা যায়, আহা, আকাশ কি মধুময় দেখাইতেছে! কিন্তু সেই অকল্পিত দৃষ্টির নিকটে কল্পনা যাইতে পারে না। সেই দৃষ্টি হইতে যে কিরণ আসিতেছে, সাধক ইচ্ছা করিলেও তাহার একটীকে নিবারণ করিতে পারেন না। এই দৃষ্টিতে অতি সুকোমল বল আছে। উহা মানুষকে হতবুদ্ধি করিয়া সমুদয় কুটিলবুদ্ধি দূর করিয়া দেয়। একবার সেই দৃষ্টিতে বিদ্ধ হইলে সংসারের সমুদয় অসার জঘন্য সুখ অনায়াসে বিসর্জ্জন করিতে পারা যায়। যদি একবার এই দর্শন হয়, সমুদয় বৎসর সুখে যায়, এমন কি সমুদয় জীবন সুখে অতিবাহিত হয়।

কত সুখ, যদি প্রতিদিন এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সংসারের সমুদয় কলহ শোক ভুলিয়া গিয়া অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মের দিকে তাকাইয়া থাকিব। তাঁহার নয়নচন্দ্রের জ্যোৎস্না আমার ভক্তিনয়নের মধ্য দিয়া আসিতেছে, তাঁহার দৃষ্টি আমার উপরে পড়িয়া, তাঁহার প্রেম অনুরাগ আমার চক্ষের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া মধু বর্ষণ করিতেছে। দুই দৃষ্টিতে একটী প্রণালী হইয়া অনন্ত প্রেম আমার হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। একেবারে রস-সাগরে ডুবিলাম। তাঁহার অমৃতময় চক্ষু ব্রাহ্মের চক্ষুর ভিতরে প্রকাশিত হইল। ব্রাহ্ম অমৃত-সাগরে সন্তরণ করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মদর্শন এরূপ হওয়া চাই, যাহাতে তাঁহার দিকে তাকাইলে আর ছাড়িতে পারিব না। চিরদিন তাঁহার পদতলে বদ্ধ হইয়া থাকিব। ব্রহ্মদর্শন জীবনে সাধিত হইলে সুখের আর অবধি থাকিবে না। যতবার তাঁহাকে দেখিতে পাই, তিনি কি ভাবে দেখিতেছেন, ইহা দেখিবার জন্য যেন নয়ন স্থির করিয়া রাখি। তাঁহার দৃষ্টি দেখিতে না পাইলে কখনই ছাড়িব না। দেখিতে দেখিতে চৈতন্যবিহীন হইয়া কি ছিলাম কি হইলাম ভাবিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িব, সে মুগ্ধভাব আর যাইবে না। সেই দৃষ্টিতে একেবারে মোহিত হইয়া যাইব। তাঁহার দৃষ্টিতে দৃষ্টিগোচর হইয়া আর নড়িতে পারিব না। হে ব্রাহ্ম, ব্রহ্মের নয়নের দিকে দৃষ্টি করিয়া থাকা তোমার সর্ব্বস্ব। বারবার বলিতেছি বিশ্বাস-নয়নে অনিমেষ দৃষ্টিতে তাঁহার নয়নের দিকে তাকাও, প্রেমচন্দ্র তোমার হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া অমৃত বর্ষণ করিবেন। তখন কোথায় থাকিবে তোমার কুটিল বুদ্ধি, কুটিল যুক্তি তর্ক? সেই দৃষ্টি সমুদয় জয় করিবে। এই দৃষ্টিতে সমুদয় জগৎ পরাজিত হইবে—

তোমাদিগের জীবন যেন সপ্রমাণ করিতে পারে। ঈশ্বর পাষণ্ড সন্তানকেও দেখা দিয়া পরাজয় করেন, ইহা দেখিয়া যেন জগতের আশা বৃদ্ধি হয়। আমাদিগের মধ্যে সেইরূপ সাধন হউক যে, আমরা চারিদিকে ধাবিত হইয়া বলিতে পারি, এই দেখ আমাদিগের কেমন সুখ হইয়াছে। দয়াময় নাম শুনিব শুনাইব, সাধন করিব, সাধন করাইব, ইহাতে আমাদের পরিত্রাণ, জগতের পরিত্রাণ।

যোগ ও মহাযোগ।

রবিবার, ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৭ শক; ১৬ই মে, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

ধর্ম্মরাজ্যে যোগ আছে এবং মহাযোগ আছে। যোগ হইতে উন্নত মহাযোগ। অদ্য যোগ এবং মহাযোগের বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হইব। যোগ সুধাসমুদ্র, মহাযোগ সুধার মহাসমুদ্র। যোগ এবং মহাযোগ ভিন্ন বিষয় নয়, এ দুয়ের মিলন আছে। যোগ হইতে মহাযোগ উপস্থিত হয়। ঈশ্বরের সঙ্গে জীবনের যোগে কত আনন্দ। যদি উচ্চ যোগ কল্পনা করা যায়, তাহা হইতে উচ্চতর যোগ আছে, সাধক অনুভব করিতে পাইবেন এবং বুঝিতে পারিবেন "ধর্ম্মরাজ্যে যোগ আছে এবং মহাযোগ আছে।" ব্রহ্মদর্শনে সাধক হৃদয়ে কি উপলব্ধি করেন? সেই অনন্ত ঈশ্বর কোথায়, আর নিতান্ত ক্ষুদ্র আমি মনুষ্য কোথায়! অথচ এই দুয়ের মধ্যে যোগ। সে যোগ কেমন পবিত্র, কেমন উচ্চ! এই অদ্ভুত যোগ পরিশেষে কিসে পরিণত হয়? ব্রহ্মদৃষ্টি মনুষ্যদৃষ্টি এ উভয়ের যোগে। যোগের অবস্থা উন্নত অবস্থা। ইহার পূর্ব্বে ভক্তিপূর্ণ নয়নে দেবালয় দর্শন হয়,

দেবতা বহু দূরে থাকেন। আকাশ, ভূমি, পর্ব্বত, কানন, সাগর, মহাসাগর, নদ, নদী, জীব, জন্তু এবং পবিত্র উন্নত সাধু, এ সকল দর্শনে দেবালয় দর্শন হয়। ক্রমে ক্রমে সেই দেবালয়ে দেবতার আবির্ভাব অনুভূত হইতে থাকে। দেবালয়ে পরম দেবতার আবির্ভাব দর্শন করিতে করিতে, যখন অন্তরে তাঁহার আবির্ভাব অনুভূত হয়, তখন সাধকের মনস্কামনা পূর্ণ হয়। বিষয়লোভ বিষয় পাইয়া যেমন পরিতৃপ্ত হয় না, দর্শনে তেমনই দর্শনলোভ বৃদ্ধি পায়, যত দেখে আরও দেখিতে চায়। সাধক ঈশ্বরের দিকে নয়ন স্থির করেন, ঠিক সেই স্থানে তাঁহার নয়ন স্থির হয়, যেখানে ঈশ্বরের নয়ন বিগুমান। সেই স্থান অব্যবহিত এবং সেই স্থানে মঙ্গল চক্ষু স্থির রহিয়াছে।

চন্দ্রের পানে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে সমুদয় সুখস্রোত নয়নের ভিতরে প্রবেশ করে, নয়ন মধ্যে চন্দ্রের জ্যোৎস্না আইসে। চন্দ্র চক্ষুর ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন পরীক্ষা দ্বারা জানিতে পারা যায়। সুধার সাগর আপনি সুধা দর্শকের চক্ষে ঢালিয়া দিতেছেন। চক্ষু দেখিয়া সাধকের নয়ন মত্ত হইল, হৃদয় তাহার অংশী হইল। চক্ষের সঙ্গে চক্ষুর মিলনে চক্ষুর কেমন শোভা হইল, হৃদয়ের আনন্দ বর্দ্ধিত হইল। সুখ-সমুদ্রের সঙ্গে ক্ষুদ্র সুখ-চক্ষুর মিলন হওয়াতে প্রাণযোগ হইল। সেই সুধাস্রোত আমাদের চক্ষের ভিতরে প্রবিষ্ট হইলে এত সুধা লাভ হয় যে, উহা গ্রহণে আমাদের সামর্থ্য নাই। স্থান অল্প, পাত্র ক্ষুদ্র, পথ সঙ্কীর্ণ, প্রেমচন্দ্রের নয়নের সঙ্গে যোগ হইয়া একটী প্রণালী সৃষ্ট হইল। চক্ষু চক্ষু অন্বেষণ করে, চক্ষু চক্ষু চায়। ব্রহ্মের চক্ষু অগ্রসর হইয়া প্রেমচক্ষে অবতরণ করিল। যাই উভয় চক্ষুর মিলন হইল, অমনই চক্ষু স্থির, মন স্থির, উহারা সুধাপানে

নিমগ্ন হইল। প্রেম, পবিত্রতা, পুণ্য, শান্তি, সুখে নয়নের জলপ্লাবন হইল, মনেরও সেই দশা হইল। ক্রমাগত প্রবাহ আসিতে লাগিল, সাধক আর উহার পরিমাণ ধারণ করিতে পারিলেন না, পূর্ণ হইয়া উথলিয়া পড়িতে লাগিল। দৃষ্টিতে মত্ততা বৃদ্ধি হইল, যত দেখেন আর দেখা ছাড়িতে পারেন না। ব্রহ্মের দিকে তাকাইয়া সমুদয় সংসার অসার হইয়া গেল। সাধক বলিতে লাগিলেন "হে প্রেমের চন্দ্রমা, যদি শুভক্ষণে সাক্ষাৎ হইয়াছে, অন্তর্হিত হইও না।" সংসারী বিষয়ী জননীর দিকে তাকাইয়া যে আনন্দ পাইল, তাহাই পরম লাভ, এই বলিয়া প্রেমময়ী জননীর মুখের প্রতি ভক্ত অনিমেষ নয়নে তাকাইয়া রহিল। ইহাকে বলি যোগ। যোগের পূর্ব্বে দেবালয় দর্শন, পরে দেবদর্শন ও চক্ষুদর্শন। যোগান্তে মহাযোগ উপস্থিত হয়। দর্শন ও শ্রবণের একত্র যোগ মহাযোগ। ব্রহ্মকে দেখা যায়, ব্রহ্মকে শুনা যায়, এই বেদী হইতে এ সম্বন্ধে প্রচুর উপদেশ হইয়াছে। অদ্য এ দুয়ের মিলন উল্লিখিত হইতেছে। দর্শনে শ্রবণ, শ্রবণে দর্শন, এইরূপে দর্শন শ্রবণ সমকালিক হয়। দর্শনে অপূর্ণতা রহিল লোভ তৃপ্ত হইল না। সাধক সংসারে পাপে ক্ষত বিক্ষত হইল, দর্শনে নয়ন বিগলিত হইল। কি আশ্চর্য্য কৃপা! দেখিয়া সাধ মিটিল না। অগ্নিতে ঘৃত দিলে যে প্রকার ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, তেমনই অভিলাষ বর্দ্ধিত হইল। এখনও মহাযোগ হয় নাই, বাকী আছে। দর্শনে আনন্দ লাভ হয় বটে, কিন্তু উপদেশেরও প্রয়োজন আছে। বিপদের সময় কোন্ পথে চলিব উপদেশ পাইবার জন্য সাধক গুরু অন্বেষণ করেন। ক্ষুদ্র বিশ্বাসী এ পাড়ায় উপদেষ্টা আছেন কি না, ও পাড়ায় উপদেষ্টা আছেন কি না অন্বেষণ

করিয়া বেড়ায়। নিম্নদিকে দৃষ্টি না করিয়া পরমগুরু সদ্গুরুর দিকে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ কর, তিনি স্বয়ং মন্ত্র দিবেন, পথ দেখাইবেন, পথ প্রদর্শক এবং নেতা হইয়া সৎপথে লইয়া যাইবেন। জিজ্ঞাসায় উত্তর চাই, ঈশ্বর কথা কহিয়া উপদেশ দিলেন না, কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে মন উজ্জ্বল হইয়া যায়, শুনিতে শুনিতে জ্ঞান লাভ হয়।

আর একবার দর্শন ও শ্রবণের কথা বলিয়াছি, আজ বলিতেছি দেখা শুনা একই সময়ে হয়। দেখা ও শুনা এই দুয়ের যোগে মহাযোগ হয়। তাঁহার প্রেমদৃষ্টিই বাক্য। তিনি কথাবিহীন হইয়াও সন্তানের সঙ্গে কথা কন। সত্যকে সাক্ষী করিয়া সাধককে স্বীকার করিতে হইবে, ঈশ্বরের দর্শনে সুখ হয়, এবং সেই দর্শনের মধ্যে তাঁহার মধুর কথা শ্রবণে হৃদয় মুগ্ধ হয়। এ সম্বন্ধে বলিতে গেলে জীবনের গূঢ় কথা বলিতে হয়, গোপন বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে হয়। মা বলিয়া তাঁহাকে ডাকিলাম তিনি দেখা দিলেন, প্রেমদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তাঁহার প্রেমদৃষ্টির ভিতরে সহস্র সহস্র কথা শুনিলাম। কে না জানে জননীর স্নেহের দৃষ্টির মধ্যে প্রেমের কথা আছে। যথার্থ বন্ধু দেখিয়া থাকিলে, তাহার চক্ষু বন্ধুতার কথা বলিয়াছে। যিনি যথার্থ গুরু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া, তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া শিষ্য তাঁহার দৃষ্টিতে শত শত সহস্র সহস্র সত্য শিখিয়াছেন। সাধক "দেখা দাও" বলিয়া প্রার্থনা করিলেন, ব্রহ্মের এই প্রার্থনার উত্তর অতি গভীর। তিনি কি দেখাইলেন? আপনার মুখ, আপনার দৃষ্টি। তিনি দেখা দিলেন, উচ্চ স্বর্গীয় ভাষায় কথা বলিলেন। চক্ষু এমন কথা কয়, ইহা ত জানি না। ব্রহ্মের চক্ষু ভাষা-বিহীন কথা প্রয়োগ করে। উহা অতি উচ্চ ধ্যানের সময়

অনুভূত হয়। সাধক তাঁহার দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন "শীঘ্র দ্বার খোল, ঘোর বিপদ আক্রমণ করিয়াছে, একবার উপদেশের প্রয়োজন।" তিনি গৃহে প্রবেশ করিলেন ব্রহ্মের মুখবিনিঃসৃত কথা শুনিলেন, কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়া কার্য্য করিলেন। সংশয়মেঘে মন আচ্ছন্ন হইল, মনে হইল এবার সংশয়েতেই প্রাণ যাইবে। পুস্তক সংশয় দূর করিতে পারিল না, জ্ঞানের প্রয়োজন হইলে সহস্র গুরুও জ্ঞান শিখাইতে পারিলেন না। ঈশ্বর একটী কথা বলিলেন, সমুদয় সংশয়চ্ছেদ হইল, সমুদয় শিক্ষা লাভ হইল। সাধক সংশয়ের হাত হইতে বাঁচিলেন।

যখন উপদেশের প্রয়োজন হয়, তখন তিনি তাঁহারই নিকট উপদেশ শ্রবণ করেন। এইরূপে সমুদয় সংশয় মিটিয়া যায়, সমুদয় শাস্ত্র পাঠ করা হয়, সাধক জ্ঞানের উচ্চ শ্রেণীতে আরোহণ করেন। এমন অবস্থায় উপনীত হইলে গভীর ধ্যানে সাধক ঈশ্বরের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকেন, কোনও উপদেশ শুনিবার প্রয়োজন থাকে না। জীবনাকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হইল, চারিদিক হইতে ক্লেশ বিপদ আসিয়া মনকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। প্রাণ কেমন করিতেছে আজ প্রেমময়ের সহবাসে থাকিব, আজ দয়াল বন্ধুর নিকটে থাকিব। প্রাণ উদ্বেজিত হইতেছে, অস্থির হইতেছে, মন কোথাও থাকিতে চায় না, আজ তাঁহাকে লইয়া দিন কাটাইব। এ অবস্থায় কি হয়? সাধক আস্তে আস্তে ঘরে গেলেন, ঈশ্বর তাঁহার নিকটে প্রকাশিত হইলেন। দয়াময়ের প্রেমপূর্ণ চক্ষুপূর্ণ জ্যোতি প্রকাশ করিল, মনের সমুদয় অন্ধকার ঘুচাইল। নদীকূলে হউক, বৃক্ষতলে হউক, নিজ গৃহে হউক, স্বজন বন্ধু বান্ধব

লইয়া হউক, সাধক সেই প্রেমচক্ষুর উপরে দৃষ্টি স্থির করিয়া বসিয়া রহিলেন। যাহা আশা করেন নাই, লব্ধ হইল, দর্শন মধুময় হইয়া গেল। অনেক কার্য্য আছে, মনে ছিল চলিয়া যাইবেন, এমনই মুগ্ধ হইয়া গেলেন, আর চলিতে পারিলেন না। যে জড় প্রায় হইল সে আর চলিবে কিরূপে? সাধক দৃষ্টিবাণে একেবারে পরাস্ত হইয়া গেলেন। শত বাণ সহস্র বাণ কোটী বাণে বিদ্ধ হইয়া শত্রুসন্তান নিরস্ত হইল। জ্যোৎস্নার উপর জ্যোৎস্না, সহস্র চন্দ্রের উপরে কোটী চন্দ্র উদিত হইল, সাধক আর কোথা যাইবেন? এমন অবস্থায় কি হইল? সেই চক্ষু অবাক্, সন্তানের চক্ষু অবাক্! ভাষার সম্পর্ক যেখানে নাই, দৃষ্টি ভাষার কার্য্য করিল। সে ভাষা মুগ্ধ-সন্তান বুঝিলেন, আর কেহ বুঝিলেন না।

সংসারের লোকে ইহাঁকে পাগল বলে। কিন্তু সংসারের ভিতরেও দেখিতে পাওয়া যায়, মাতার চক্ষু কথা কহিতে পারে। জগতের জননীর দিকে তাকাইয়া সাধক শুনিতে লাগিলেন সেই চক্ষু কথা কহিতে লাগিল। কি যে বলা হইল, যিনি বলেন যিনি শুনেন তাঁহারাই জানেন। সেই ঈশ্বরের চক্ষু বলিল "কেমন সন্তান আর কি পলায়ন করিতে পারিবে? পাপ করিয়া তাহাতে কি লজ্জা হইতেছে না?" কে বলিতেছেন? সেই মাতা বলিতেছেন "সন্তান তুমি আমায় আর ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না।" সাধক যতই শুনিতে লাগিলেন ততই অবাক্ হইতে লাগিলেন। বিশেষ উপদেশের আর প্রয়োজন রহিল না, নয়নই কথা কহিতে লাগিল। জননীর দৃষ্টি সাধকের হৃদয়ে পড়িয়া শুধু জ্যোতি আসিল শান্তি আসিল তাহা নহে, প্রাণ পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়া গেল। পুস্তক পাঠ বৃথা। শিশু হইয়া

মাতৃদৃষ্টি পাঠ কর। উহাই জ্ঞানগর্ভ শাস্ত্র। মাতার চক্ষু দর্শন কর পাঠ কর, মনের মধ্যে যে জ্ঞানের সুধা-সরোবর আছে, তাহা উৎসারিত হইবে, এবং সেখানে আপনাকে ভাসাইয়া দিলে সুধা সঞ্চয় হইবে। সেখানে সন্তরণ করিলে এত কথা আসিবে, জ্ঞানের উপদেশ পাইবে যে, বাহিরের শ্রবণ বন্ধ হইয়া গেল, তথাপি সেখানে সমুদয় জ্ঞানের কার্য্য একত্র সম্পাদিত হইবে। আর জিজ্ঞাসা করিও না, আর শ্রবণ করিও না। মা বলিয়া তাকাইয়া থাক, সমুদয় দুষ্টতা চূর্ণ হইয়া যাইবে, সমুদয় অজ্ঞানতা তিরোহিত হইবে। এ অবস্থার ন্যায় মনের অবস্থা আর হইতে পারে না। যখন আর জিজ্ঞাসা করিতে হইল না, জড়ের ন্যায় পড়িয়া রহিলাম, উহাতেই তখন আনন্দ পাইলাম, জ্ঞান পাইলাম। আর জানিবার লাভ করিবার কি অবশিষ্ট রহিল? ঈশ্বরের চরণ ধরিয়া তাঁহার চক্ষু পানে দু মিনিট তাকাইয়া থাকিলে, সমুদয় দুঃখ চলিয়া যাইবে সমুদয় সন্দেহ মিটিবে।

জ্ঞানের কথা শক্ত কঠোর, উহা অর্জ্জনে যত্ন করিয়া কি হইবে? ঈশ্বর সন্তানের দিকে তাকাইলেন, আর এ ওজর চূর্ণ হইয়া গেল। সেই চক্ষু দর্শন করিয়া চক্ষু পাষণ্ড ভাব ভুলিয়া গেল। জীবন যেমন চলিতেছে তেমনই কাটাইব, আর লোভ কমাইব না, আর ইহা অপেক্ষা বৈরাগ্য অবলম্বন করিব না, মন্দিরে আসিয়া যদি ঈশ্বরের চক্ষু দর্শন করিয়া থাক তবে এ প্রতিজ্ঞা বিসর্জ্জন দিয়া ঘরে ফিরিয়া যাইতে হইবে। মনে হইবে এমন জঘন্ত প্রতিজ্ঞা কেন করিলাম? আর যে সংসার বাসনা থাকিল না, আর যে সে পাষণ্ড ভাব থাকিল না। হে ঈশ্বর! কি ক্ষমতাজাল বিস্তার

করিলে, কি মোহিনীমূর্ত্তি প্রকাশ করিলে, কি অপূর্ব্ব জ্যোৎস্না চারিদিকে বিকীর্ণ হইল। এ যে উপদেশের উপর উপদেশ, কথার উপর কথা, বাণের উপর বাণ। হা দুষ্ট মন! তোমার উপযুক্ত শাস্তি হইল, আজ তুমি দুষ্টতার উপযুক্ত দণ্ড পাইলে। প্রাণসখার মুখের দিকে তাকাইলাম, এমন দু একবার তাকাইয়া পরে আর জ্ঞান থাকে না। একবার তাকাইয়াই ব্রহ্ম কর্ত্তৃক পরাস্ত হইল, আর নয়ন দেখিতে চায় না। আর একটু দেখিলেই সমস্ত পাপ থাকিত না, দুষ্ট মন আর সেটুকু দেখিল না। আর দু এক মিনিটে সমুদয় পাপ ভস্ম হইবে, এই আশা হৃদয়ে রাখিয়া আপনাকে সাধনে নিয়োগ কর। এইরূপ সাধন দ্বারা ব্রহ্মরস পানে তৃষ্ণা বাড়িবে। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা নিয়ত ব্রহ্মরস পান করিতে সমর্থ হই।

পরলোকজাত বৈরাগ্য।

রবিবার, ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৭ শক; ২৩শে মে, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

যথার্থ বৈরাগ্য-বৃক্ষ পরলোকে জন্মে, ইহলোকে নহে। পরলোক ভিন্ন অন্য ভূমিতে উহার বীজ রোপণ করিলে ফল ফুল হয় না। পৃথিবীর উৎকৃষ্ট স্থান পরীক্ষা করিয়া লইয়া খনন করিয়া তাহাতে নিক্ষেপ কর, সে বীজে বৃক্ষ হইবে না। বীজ প্রস্ফুটিত না হইয়া বিনষ্ট হইয়া যাইবে। যথার্থ স্বর্গীয় বৈরাগ্য পরলোকভূমি ভিন্ন অন্যত্র জন্মগ্রহণ করে না। প্রকৃষ্ট বৈরাগ্য পারলৌকিক সামগ্রী, ইহলোকের নহে। উহার মূল ও ফল পারলৌকিক। এই পৃথিবীতে

থাকিতে থাকিতে পরলোক সাধন কর। জ্ঞানী হইয়া ধীর হইয়া ইহলোক এবং শ্মশান ছাড়িয়া বৈরাগ্য সাধন কর। ইহলোক এবং শ্মশানের অতীত ভূমি পরলোক। তন্মধ্যে বৈরাগ্য বীজ রোপন করিয়া স্বর্গীয় ফল লাভ করিবে। সংসারে থাকিয়া ইন্দ্রিয় দমন চেষ্টা কর, মৃত্যু চিন্তা করিও না। মৃত্যুচিন্তার দিক দিয়া না গিয়া রিপুদমনে যত্নশীল হও। পৃথিবীর সুখ পরিমিতরূপ সম্ভোগ কর। বিষয় ব্যাপার যথা পরিমাণ অনুসরণ কর। যেরূপ অনুসরণে রিপুদমন অসম্ভব তাহা পরিত্যাগ কর। সর্ব্বদা সেই পরলোক লাভের জন্য লালায়িত এবং যত্নবান্ থাক। এক সম্প্রদায় বলেন, ধর্ম্মবুদ্ধিসহকারে এক একটী সীমা করিয়া লও। যাহাতে তাহা অতিক্রম করিতে না হয় এরূপ যত্নবান্ হও। ইহলোকে অল্প বৈরাগ্য সঞ্চয় কর। এরূপ করিলে বিষয়ে আসক্তি জন্মে, সুতরাং এগুলি পরিত্যাগ করিতে হইবে, এরূপে আসক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং এগুলি ভোগ করিবে, এইরূপ অঙ্কশাস্ত্রের গণনা করিয়া বিচার কর, সাধন কর। কতদূর অগ্রসর হইলে, সর্ব্বদা সুখের দ্বারা ধর্ম্মের দ্বারা পরিমাণ কর। আর এক সম্প্রদায় বলেন, যথার্থ বৈরাগ্য পৃথিবীর মধ্যে থাকিয়া উপায় অবলম্বন করিয়া লাভ করা যায়। শ্মশানে বসিয়া মনুষ্যের অস্থি সম্মুখে রাখিয়া ক্রমাগত মনুষ্যের পরিণাম চিন্তা কর। দেখ এই মনুষ্যশরীর দগ্ধ হইতেছে, উহার সমুদয় সৌন্দর্য্য, সমুদয় অভিমান ভস্ম হইয়া গেল, উহার আর কিছু থাকিল না। ভাবিতে ভাবিতে শরীরের অসারতা উপলব্ধি করিবে। শ্মশানে বসিয়া কেহ সংসারে ধন মান মর্য্যাদা দেখিতে পায় না। সেখানে কোন লালসা মনে উদয় হয় না। স্ত্রী পুত্র পরিবার আর সেখানে

থাকিতে পারে না। চারিদিকে কেবলই ধূ ধূ করিতেছে, সকলই শূন্য। মনে কেবলই ভয়ের উদয় হয়, প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, বিষয় বাসনা চলিয়া যায়। শ্মশানে বসিয়া শরীর যাহাতে কষ্ট পায়, সেই বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা হয়। সাধনে কি না হয়? উহাতে অসাধ্য সিদ্ধ হয়। শ্মশানের সকলই ভয়ানক, চারিদিকে কেবল মৃত দেহেরই ব্যাপার। পৃথিবীর সুখ সেখানে মুহূর্ত্তের মধ্যে ভস্ম হইয়া যাইতেছে, চিহ্নও থাকিতেছে না। এ সকল দেখিতে দেখিতে সংসারের প্রতি অনুরাগ হ্রাস হইয়া যায়, সংসার মনেও থাকে না। সমুদয় বাসনা দগ্ধ হইয়া এইরূপে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। পাঁচ বৎসর দশ বৎসর এইরূপ ভয়ের সামগ্রী সাজাইয়া সাধন করিতে করিতে সংসারসুখ বিসর্জ্জন হইল। এ কোন্ প্রকারের বৈরাগ্য উপস্থিত? শ্মশান বৈরাগ্য। এত সাধন করিয়া এত কষ্ট করিয়াও উহা উৎকৃষ্ট বৈরাগ্যে পরিণত হইল না। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বৈরাগ্য লাভের সাধন স্বর্গীয় এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যে কোন সম্প্রদায় পৃথিবীর ধর্ম্ম সাধন করে, আমরাও কি তাহাই করিব?

ইহলোক, পরলোক, মধ্যে মৃত্যু, ব্রাহ্ম এ কথা স্বীকার করেন না। ইহলোক তাঁহার নিকটে পরলোক, তিনি মৃত্যুকে বিশ্বাস করেন না। এই পৃথিবীতে বসিয়া সাধন ভজন কর, মনকে বশীভূত কর, শ্মশানের ভিতর থাকিয়া পৃথিবীকে জয় করিতে চেষ্টা কর; অগ্নিতে জলের শীতলতা, জলে অগ্নির উষ্ণতা যেমন অসম্ভব, ইহা তেমনই অসম্ভব। সংসারে থাকিয়া কেহ বৈরাগ্য শিখিবে, ইহা নিতান্ত অসম্ভব কথা। অসারের মধ্যে সার সংগ্রহ করিয়া পরিশেষে সমুদয় সার বস্তু লইয়া হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। যাহার

মধ্যে সার নাই, তাহা লইয়া সাধন করিলে তাহা হইতে অসার বস্তুই উৎপন্ন হইবে, অসার সাধনে সার উৎপন্ন হইবে ইহা কেহ বিশ্বাস করিতে পারে না। পাপের ভিতর দিয়া পুণ্য আসিবে এ কথা বিশ্বাস করা যায় না। এরূপ চেষ্টা দ্বারা এরূপ কষ্ট সাধন দ্বারা ভাল হওয়া অসার। যে ধর্ম্মভাব স্থায়ী হয় না, তাহাও অসার। শ্মশান চিন্তা করিতে করিতে যে বৈরাগ্য উপস্থিত হইল, সেই বৈরাগ্য আবার সেইরূপ সংসার দেখিতে দেখিতে চলিয়া যাইবে। অসার বৈরাগ্য চলিয়া যাইবে না কেন? যে বৈরাগ্য-আগুন সংসারকে গ্রাস করিল, সেই সংসারের আগুন আবার বৈরাগ্যকে গ্রাস করিবে। শ্মশানবৈরাগী সংসারের বৈরাগ্য চান, সুতরাং তাহার পরিণাম এইরূপ হইবে। যে স্থান সংসারের ক্রীড়ার অতীত, ব্রাহ্মেরা সেই স্থানের বৈরাগ্য চান, সুতরাং তাহাদের বৈরাগ্য স্থায়ী। এইজন্যই তাঁহারা মৃত্যু আছে ইহা স্বীকার করেন না। মৎস্যের স্থান জলে, জল ভিন্ন মৎস্যের জীবিত থাকা অসম্ভব। বৈরাগ্যও জলস্থ মৎস্যের ন্যায় পরলোকে থাকিবে এজন্য সৃষ্ট হইয়াছে। পরলোকে উপস্থিত হইলে বৈরাগী হইতে পারিবে। ইহলোক পরলোকের মধ্যে যে একটী চিহ্ন আছে লোকে বলে, তাহা বিলুপ্ত করিতে হইবে। মরণকে বিলোপ করিয়া ইহলোককে পরলোকে পরিণত কর। ইহলোকেই পরলোকের আরম্ভ হয়, তবে যে মৃত্যুর পর পরলোক বলা উহা কেবল চলিত ভাষায় ব্যবহার মাত্র। যিনি ব্রাহ্ম তিনি পরলোকগত, তিনি সংসার সম্বন্ধে মৃত হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু হইবে, ইহা নহে। অমুক অমুক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে বলিতে পারা যায়। ব্রাহ্ম যিনি তিনি সংসারের

ভিতরে বাস করিয়াও পৃথিবীতে বাস করেন না, পরলোকে বাস করেন। বিশ্বাসী ব্যক্তি উপাসনা সময়ে ধ্যানযোগে পরলোকে আরূঢ় হন এবং তিনি পরলোকে বসিয়া ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন। এই অবস্থায় বৈরাগ্য সাধন সুলভ। সংসারী লোক শ্মশানে বসিয়া বৈরাগ্যকে আহ্বান করে, উহাকে স্বদেশ হইতে বিদেশস্থ করিতে চায়। যে স্থানের বস্তু সেখানে উহা যত তেজে বাড়ে, বিদেশস্থ হইয়া উহা তেমন কেন বাড়িবে? সাবধান, বৈরাগ্য-বৃক্ষকে পরলোকের ভূমিতে বাড়িতে দাও, দেখিবে ফল ফুল শাখা পল্লবে কেমন উহার শোভা হইবে। সেখানে আপনার সার আপনি টানিয়া লইবে, সার দেওয়ার জন্য প্রয়াস পাইতে হইবে না। মৎস্যকে জলে আনিয়া ছাড়িয়া দাও তৎক্ষণাৎ সে আমোদে সন্তরণ করিবে। সেখানে স্বাভাবিক বায়ু এবং জল বৈরাগ্য-বৃক্ষকে দ্রঢ়িষ্ঠ এবং বলিষ্ঠ করিতে লাগিল, আমাদের আর চিন্তা রহিল না। শ্মশানবৈরাগ্য পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, ধন, সম্পত্তির বিষয় চিন্তা করিব না বলিয়া ক্রমাগত চেষ্টা করে, কিন্তু সংসারের চিন্তা বারবার সংসারে ফিরিয়া আইসে। বৈরাগ্যের জন্মভূমি যেখানে নয়, সেখানে উহা একটু প্রতিকূল ব্যবহার পাইলেই চলিয়া যায়। এখানে বৈরাগ্যকে বারম্বার ডাকিয়া আনিতে হয়, পরলোকে আর ডাকিয়া আনিতে হয় না। মৃত্যু আমাদিগকে গ্রাস করিবে ইহা বলিয়া আর চিন্তা করিতে হয় না। ধন, জন, মান, সম্ভ্রম, এ সকল অসার অস্থায়ী এরূপও ভাবিতে হয় না। পরলোকবাসীর নিকটে সকলই সার, অসার বলিয়া বিশেষণ নাই। যত সামগ্রী দর্শন স্পর্শন শ্রবণ করেন, সে সকলই সার—চিরকাল স্থায়ী। বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া সমুদয়

পরাজয় করিতে হইবে, এ উপদেশ দিতে হয় না। এ পথে সমুদয় অনুকূল এবং স্থায়ী। বৈরাগ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য চিন্তা করিতে হয় না, সংসার হইতে মনকে টানিয়া আনিয়া বুদ্ধিকে বারম্বার বৈরাগ্যে স্থাপন করিতে হয় না। বৈরাগ্য নিঃশ্বাসের ন্যায় সহজ হইয়া পড়ে। উপাসনা ধ্যানে বৈরাগ্যভাব বৃদ্ধি হইয়া উঠে। চিন্তা, পাঠ, অনুষ্ঠান সকলই পরলোকে বাস করিবার ভাব অনুভব করিবার পক্ষে সহায় হয়।

ইহলোক পরলোক স্বতন্ত্র এই ভ্রান্তি বৈরাগ্যপথে প্রতিবন্ধক হইয়া রহিয়াছে। আমরা ইহলোকের সুখে কেন মুগ্ধ হইব? আমাদিগকে পরলোকের সুখ লাভ করিতে হইবে এবং ভাবনা দ্বারা সেই পরলোক মনের ভিতরে আনিতে হইবে। ইহা হইলে বৈরাগ্য স্ফূর্ত্তি পাইবে। ইহলোককে পদাঘাত করিয়া শ্মশানকে অতিক্রম করিয়া আত্মা উড্ডীন হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হয়। যাহা কিছু করা যায় সকলই বৈরাগ্য সহকারে। সেখানে বলের দ্বারা আর বৈরাগ্য সাধন করিতে হয় না। পৃথিবীর লোকে বৈরাগ্য সাধন করিতে গিয়া ইহলোকের সীমা মৃত্যুতে পর্য্যবসান করে। মৃত্যু তাহাদিগের সম্বন্ধে প্রাচীর, কিন্তু ব্রাহ্ম সাধক প্রাচীর দেখিতে পান না। ইহলোক পরলোক মধ্যে মৃত্যু দ্বার, এ কথা তিনি বলেন না। তিনি বলেন, সাধক সম্বন্ধে ইহলোক নাই, পরলোক আছে। তিনি ইহলোকবাসী হইয়াই পরলোকবাসী। তাঁহার সম্বন্ধে লোক এক, দুই নয়। সে লোক—অনন্ত লোক, ব্রহ্মলোক। সকল অবস্থার মধ্যে থাকিয়াই তিনি সেই লোকে বাস করেন। তাঁহার সম্বন্ধে প্রাচীরের ব্যবধান নাই। ব্রহ্মসাধক দিব্যচক্ষে দেখেন চারিদিক

ধূ ধূ করিতেছে। সমুদ্র, প্রান্তর, প্রসারিত ভূমিখণ্ড অতিক্রম করিয়া ক্রোশ ক্রোশান্তর চক্ষু চলিল, ইহলোক পরলোক এক হইয়া অনন্তকালের দিকে ধাবিত, তাহার অন্ত পাইল না, চক্ষু কোথাও ব্যবধান দেখিতে পাইল না। ফলতঃ এমন প্রাচীর দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহা ব্রহ্মলোককে বিভক্ত করিয়াছে। আত্মার জন্ম হইয়াছে, মৃত্যু নাই। দৃষ্টি যত অগ্রসর হয়, তত উজ্জ্বল হইয়া ইহলোকে পরলোক দেখিতেছে। ব্রহ্মসাধক ব্রহ্মকে দেখেন, পরলোককে দেখেন। শুদ্ধ বিশ্বাসের বস্তু নহে, ব্রহ্ম আছেন যেমন প্রমাণ করিতে হয় না, পরলোক আছে এ কথাও তেমনই প্রমাণ করিতে হয় না। ঈশ্বর আছেন, পরলোক আছে মানিতে হইবে। মৃত্যু নামে অবরোধক কোন প্রাচীর নাই। এই জীবনই প্রসারিত হইতেছে, বিস্তৃত হইতেছে, উহা ইহলোক নহে, পরলোক নহে, একই লোক। ব্রাহ্মের জীবনে উহার আরম্ভ হয়, কিন্তু অন্ত নাই দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি।

ইহলোক পরলোকের ব্যবধান চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হও। সংসারের অনিত্য বস্তু সকলকে ছাড়িবে বটে, কিন্তু চেষ্টা করিয়া নয়। কালে যেমন শুষ্ক পত্র সকল পড়িয়া যায়, পুরাতন বিষয়বাসনা সকল সেইরূপ পড়িয়া যায়। যখন উপযুক্ত সময় আইসে, তখন পুরাতন পত্রের স্থলে নূতন পল্লবে বৃক্ষ লতা সুশোভিত হয়, সংসারের বৃথা আড়ম্বরের সম্বন্ধ চলিয়া গিয়া বিশুদ্ধ পবিত্র সম্বন্ধ উপস্থিত হয়। সমুদয় বাসনা খসিয়া পড়িতে লাগিল, মান মর্য্যাদা ধন সম্পত্তি যাহা কিছু পাপ সঙ্গে সঙ্গে পড়িয়া গেল। চেষ্টা করিয়া দূর হইল তাহা নহে। যাইতেছে না, সাধন করিয়া

তাড়াইব, শ্মশানবৈরাগী সংসারী বৈরাগীরা এইরূপে সাধন করে। কোন প্রকারে বাসনা দূর হয় না, মনে করে পরলোকে গিয়া বাসনা মরিবে। এরূপ করিলে বাসনা নিবৃত্ত হয় না। যেখানে ব্রহ্ম ভিন্ন পদার্থ নাই, শরীর নাই, আত্মা কেবল পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত সেখানে শারীরিক বিষয় কেমনে যাইবে? পৃথিবী মনকে অধীর করিবে কি প্রকারে? এথানে আর কোন সামগ্রী নাই যে মনকে তাহা হইতে টানিয়া আনিয়া বৈরাগ্য অভ্যাস করিতে হইবে। সমুদয় পার্থিব বস্তুর আকর্ষণ চলিয়া গেল, আর তাহাদের সাধকের উপরে অধিকার নাই। ধন মান সম্পত্তি অধিকার নাই বলিয়া প্রস্থান করিল। সেখানে কেবল ঈশ্বর এবং তাঁহার দাস। আত্মা যখন ব্রহ্মেতে মোহিত হইয়া যায়, সে অবস্থায় কোন বস্তু আর আকর্ষণ করিতে পারে না। তথায় কেবলই ব্রহ্মের আকর্ষণ। এ সময়ে কেবল ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মস্পর্শ, ব্রহ্মশ্রবণ, অন্য বস্তুর আকর্ষণ কিরূপে হইবে? সাধক তখন সংসারের পথে বেড়ান বটে, কিন্তু সংসার তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই সময় প্রকৃতিস্থ বৈরাগ্য কাহাকে বলে বুঝিতে পারি। প্রেম-আকাশে অমৃত-সাগর ঈশ্বর উদিত হন, শুষ্ক কঠোর অসার ভূমিতে তাঁহার উদয় কি প্রকারে হইবে? সহজে প্রাণ রস-সাগরে ডুবিয়া সেই বস্তুর প্রতি লোভ বাড়িতে লাগিল। সংসার আকর্ষণবিহীন হইল, পরলোকের আকর্ষণ প্রবল হইল। দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ সকলই পারলৌকিক। এ অবস্থায় বৈরাগ্য অনন্তকাল স্থায়ী। অমৃতের সাগর-স্বরূপ এই বৈরাগ্য আমাদিগের অন্তরে প্রবিষ্ট হউক। বৈরাগ্য-গৃহে বসিয়া থাকিব, প্রেমযোগে সমুদয় বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিব। পৃথিবীতে থাকিয়াও

উহা বিনষ্ট হইবে না; কিছুতেই আর অপহৃত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না; অনন্তকাল অমৃত লাভ হইবে, আর কোন বস্তুর কামনা বা বাসনা থাকিবে না। বৈরাগ্য নিঃশ্বাসের ন্যায় সহজ হইবে, সুতরাং সকল অবস্থায় পৃথিবীতে নির্লিপ্ত হইয়া সাধক অবস্থান করিবেন। বৈরাগ্য-সাধনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া সমুদয় শারীরিক বাসনা কামনা ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে, সাধক পরলোকে বসিয়া আছেন, দিব্যচক্ষে দেখ। শ্মশানের অতীত পরলোকভূমিতে তাঁহার বাস। যখন দেখিবে পরলোকবাসী-বৈরাগ্য পাইয়াছ, তখন জানিবে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছ। তখন বৈরাগ্য দৃষ্টিতে দেখিবে, বৈরাগ্য ভালবাসিবে, বৈরাগ্য আত্মার ভূষণ ও আনন্দ হইবে।

সেবানন্দ ও ভোগানন্দ।

রবিবার, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৭ শক; ৩০শে মে, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

দুইটী আনন্দের পাত্র লইয়া অমৃতময় জগৎস্বামী জগদ্বাসীগণকে সর্ব্বদা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। দুই আনন্দের রসই অমৃত। একটী ভোগানন্দ, আর একটী সেবানন্দ। ব্রহ্ম সাধককে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, দুই আনন্দের মধ্যে যেটী অভিরুচি গ্রহণ কর। ব্রাহ্ম কোন্‌টী গ্রহণ করিবেন, কোন্‌টী ফিরাইয়া দিবেন, সেবার আনন্দ, না ভোগের আনন্দ—চিন্তায় নিমগ্ন। হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিলে হৃদয় এই উত্তর দিবে, দুই পাত্রই গ্রহণ করিতে হইবে। দুইয়ের একটীকে ছাড়িয়া আর একটী গ্রহণ করিলে পাপ হয়। একটী ছাড়িয়া আর একটী গ্রহণ করিয়াছেন এমন ভক্তের কথা

আমরা শুনিয়াছি, কিন্তু এটী ভক্তের লক্ষণ নহে, ইহাতে ভক্তিতে দোষ পড়ে। অল্পবুদ্ধি বশতঃ ভক্ত দুইটীর একটী গ্রহণ করিয়াছেন ইহা বলিতে হইবে। আমাদিগের এ দুই অবলম্বনীয়। আমাদিগের কখনও একটীতে পরিতৃপ্তি হইতে পারে না। সেবার আনন্দ এবং ভোগের আনন্দ দুইকেই আমরা শ্রেষ্ঠ গণ্য করি। সেবা সোপান, ভোগ স্বর্গ, একটী উপায় একটী লক্ষ্য। "যাও সেবা কর" ঈশ্বর যাহাদিগকে আদেশ করিলেন, তাহাদের সেবাতে অধিকার জন্মিল। ঈশ্বর-সেবা, জগদ্বাসী ভ্রাতা ভগ্নীগণের সেবা—সেবা। সেবাতেই উন্নতি, সেবা না করা পাপ। সেবা অস্বীকার অধর্ম্ম। সামান্য নীতিতেও মনুষ্যের প্রতি কর্ত্তব্য আছে। সাধকের পক্ষে উহা কেমন গুরুতর। ঈশ্বর পরিবার জগদ্বাসীর প্রতি দয়া, ন্যায়, প্রেম এবং চিত্তশুদ্ধি সাধকের পক্ষে প্রধান কর্ত্তব্য। ইহার একটীও পরিত্যাগ করা অপরাধ। নীতিতত্ত্ব চিরজীবন ধর্ম্মসাধনে অবলম্বন করিতে হইবে, কেন না সেবক না হইলে পরিত্রাণ হয় না। সেবাধর্ম্ম অবলম্বন করিলে সেবার আনন্দ পুরস্কার-স্বরূপ সিদ্ধ হইবে; সেবা করিতে করিতে আনন্দ ভোগ হইবে; সেবানন্দ ভোগানন্দ উভয়ের পরিচয় হইবে। এ সময়ে সেবায় আর ভার বোধ থাকিবে না। প্রেম বিতরণ সত্য কথন, দয়া ও কর্ত্তব্য পালন এ সকল সহজ হইবে। অনুতাপ দ্বারা মনোমালিন্য দূর হইবে।

সেবাতে আনন্দ নাই, ভোগেতেই আনন্দ, উপাসনা সহবাসে আনন্দ, সেবা নিম্নশ্রেণীর পাঠের ন্যায় অসার, ভক্তহৃদয় সাধকহৃদয় ভোগের আনন্দে নিমগ্ন, এরূপ মত আছে বটে, কিন্তু ইহা প্রকৃত নীতি নহে, প্রকৃত তত্ত্ব নহে। ইহলোকে সাধক ভোগ চান, সেবা

চান। যাহার যে প্রকার তৃষ্ণা তাহাকে সে প্রকার সামগ্রী গ্রহণ করিতে হইবে। দুয়েতেই আনন্দ আছে, কিন্তু দুয়ের পিপাসা ভিন্ন। সেবার তৃষ্ণা সহস্র বর্ষ ভোগে নিমগ্ন থাকিলেও কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না। সেবা করিবার ইচ্ছা নিয়ত বলবতী থাকিবে। ঈশ্বরের আনন্দে আর কিছু ভাল লাগে না, উৎকৃষ্ট সোপানে আছি, আর নিম্নসোপানে প্রয়োজন কি, সর্ব্বদা উৎকৃষ্ট উপাসনা হইতেছে, উচ্চশ্রেণীভুক্ত গভীর ভোগানন্দে সর্ব্বদা নিমগ্ন আছি, ইহা যতই কেন বলি না, নিশ্চয় স্বাভাবিক ক্ষুধা তৃষ্ণার এখনও শান্তি হয় নাই, হৃদয় সেবার আনন্দ এখনও অন্বেষণ করিতেছে; এখনও তাহার প্রাণ ব্যাকুল রহিয়াছে। প্রকৃতি বিকৃত না হইলে মতের অনুরোধে একবিধ আনন্দ মনকে তুষ্ট করিতে পারে না। প্রকৃতিস্থ আত্মার উভয় আনন্দ লাভ দ্বারা সমুদয় ক্ষুধা পিপাসার শান্তি চাই। ঈশ্বরকে দর্শন করিব, তাঁহার প্রেমমুখ নিরীক্ষণ করিয়া গভীর আনন্দে হৃদয়কে প্লাবিত করিব, মন প্রকৃতিস্থ থাকিলে উহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সেবা করিব এ প্রকার ইচ্ছা হইবে; তাঁহার সংস্পর্শে আনন্দ, তাঁহার সেবায় আনন্দ ভোগ করিব এ ইচ্ছা কখনও নিবৃত্ত হইবে না।

সেবার আনন্দ কি? প্রকৃতিস্থ আত্মা কেনই বা তাহা চায়? কেনই বা তজ্জন্য ব্যাকুল হয়? সেবার আনন্দ স্বাভাবিক এইজন্য আত্মা তাহার আকাঙ্ক্ষা করে, তজ্জন্য লালায়িত হয়। সেবার আনন্দ না পাইলে আত্মার পূর্ণ উন্নতি হয় না। যেখানে জীবনের ক্রমিক বৃদ্ধি, সেখানে বৃদ্ধি এক অংশে নহে, প্রত্যেক অংশে। আত্মা সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ করিয়া থাকে। উন্নতি প্রকৃতির নিয়ম,

প্রকৃতি আত্মা ও জীবনকে পূর্ণ উন্নতির দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে চায়। হৃদয়ে যে সকল সাধুভাব আছে উহারা প্রস্ফুটিত হইবার জন্য উদ্যোগী রহিয়াছে, চেষ্টা করিতেছে, সংগ্রাম করিতেছে। বৃদ্ধি হওয়া, স্ফূর্ত্তি হওয়া সাধুভাবের নিয়ম; ম্লান ও বিনষ্ট হইবার জন্য উহা সৃষ্ট হয় নাই। ক্ষমা, স্নেহ, দয়া, ন্যায়, প্রত্যেক সাধু বিশুদ্ধ ভাব স্ফূর্ত্তির চেষ্টা করিবে, উহাদের গতি অবরোধ করিলে অন্তরকে উৎপীড়ন করিবে। হৃদয়ের কপাট রুদ্ধ করিয়া ধ্যানে প্রমত্ত হইলাম, ঈশ্বর-দর্শনের আনন্দে নিমগ্ন হইলাম, যোগানন্দে মন চরিতার্থ হইল, তথাপি দুঃখী অন্বেষণ করিবে। দয়া দুঃখীর দুঃখ মোচন করিতে না পারিলে কিছুতে চরিতার্থ হইবে না। ভ্রাতা ভগিনীগণকে অবলম্বন করিয়া সাধুভাব সকল পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল, হৃদয় চরিতার্থ হইতে লাগিল। হৃদয়ে হিংসা ক্রোধ প্রভৃতি যে সকল নীচ ভাব ছিল নিস্তেজ হইয়া মরিল। দুঃখীর দুঃখে ব্যাকুল হইয়া দয়া তাহার উচ্চব্রত পালনে বাহির হইল, যত ব্রত প্রতিপালন করিতে লাগিল, তত ইচ্ছা বলবতী হইল। স্বভাবের উত্তেজনায় ঘরে থাকিতে না পারিয়া অন্যের সেবা করিতে গেল। আত্মা উপাসনা করিল, স্তব করিল, ব্রহ্মসঙ্গীত করিল। এ সকল আত্মাকে পরিপুষ্ট করিল, আত্মা সুখী হইল, সাধনের পুরস্কার লাভ হইল, কিন্তু তাহাতে সাধুভাব ম্লান হইবে, তাহা নহে। প্রকৃতির নিয়ম, একদিকে উন্নতি হইলে চারিদিকে উন্নতি হইবে। ন্যায় ব্যবহার, ইন্দ্রিয়সংযম এ সকলের সাধনে ইচ্ছা থাকিবেই। আমি যোগানন্দে আছি, জগৎ সংসারের অন্যায় করিলামই বা যোগী এরূপ কখনও মনে করিতে পারেন না। যোগানন্দ যে পরিমাণে, অন্যায় সেই

পরিমাণে সহ্য করা অসম্ভব হইবে। অন্যায় চিন্তা নিরস্ত হইয়া গিয়া ন্যায়ভাব প্রবল হইয়া উঠিবে। দয়া আপনার ব্রতপালনে বাহির হইল, ন্যায় বলিল "আমি বুঝি নির্জনে বসিয়া খেদ করিব, কখনই না। জগতের উদ্ধারের জন্য আমিও যাইব।" যেখানে অন্যায় হইতেছে দেখ ন্যায়ভাব সেখানে গমন করিল, আর সে ঘরে থাকিতে পারিল না। জগৎকে সুবিচারের পথে আনিব, ন্যায়ভাব এই প্রতিজ্ঞায় বাহির হইল। এই প্রকারে এক একটী সাধুভাব প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল এবং জগতের উপরে বিস্তৃত হইয়া বাড়িতে লাগিল। বৃক্ষ যেমন উপযুক্ত ভূমি পাইয়া সতেজ ও বর্দ্ধিত হয়। সাধুভাব সকলও তেমনই উপযুক্ত পাত্র লাভ করিয়া সতেজ ও বর্দ্ধিত হয়। সমুদয় জীবনের গতি যে প্রকার উন্নতির দিকে, আত্মারও সেই প্রকার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির দিকে গতি। একই নিয়ম ভৌতিক ও মানসিক জগৎকে শাসন করিতেছে, সুতরাং স্বভাবের উৎপীড়নে সাধুতা বাহির না হইয়া থাকিতে পারে না।

ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন হইতে সেবার আরম্ভ। সেবা পরম ব্রত। ভক্ত এই ব্রত গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হন। জগতের সেবা, ঈশ্বরের সেবা। সুতরাং সেবার আনন্দ লাভ করিয়া তিনি পরম আনন্দিত হন। সাধুভাব প্রস্ফুটিত হইয়া যে আনন্দ লাভ হয়, সে আনন্দ বাহির হইতে আইসে না। ব্রহ্মনাম শুনাইয়া সাধক আপনার হৃদয় আনন্দরসে প্লাবিত করিলেন, অন্যকেও আনন্দে ভাসাইলেন। অন্যের অভাব মোচন করিলেন, প্রাণ নিজগৃহে প্রবেশ করিয়া আত্মপ্রসাদ সম্ভোগ করিল, ঈশ্বরের চরণ ধারণ করিয়া পূর্ণ আনন্দ লাভ করিল। উপাসনায় অনুপম আনন্দ লাভ করিয়া আত্মা জিজ্ঞাসা করে জগতে

এই পর্য্যন্তই কি শেষ? ঈশ্বরের আরাধনা করিলাম, তাঁহার চরণ সেবা কি করিব না? এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টা তাঁহার উপাসনা করিলাম, সমস্ত দিন কি করিব? যদি তাঁহার চরণ সেবা না করি সমস্ত দিন যে বৃথা অতিবাহিত হইবে। সাধক এরূপ অলস ভাবে থাকিতে পারেন না। সমস্ত সাধুভাব তাঁহাকে চরণ সেবার দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানিতেছেন, ঈশ্বরের আজ্ঞা জগতের সেবা করিবার জন্য, জগতে প্রেম বিলাইবার জন্য, অন্যায় দূর করিবার জন্য। সুতরাং আমরা ঈশ্বরের আদেশ জানিয়া সেবাব্রত গ্রহণ করিব। সমস্ত দিন কার্য্য করিব, রিপু সকলকে দমন করিব, ঈশ্বরের আদেশ পালনে যত ত্যাগস্বীকার করিতে হয় করিব, কর্ত্তব্যসাধনে নিয়ত তৎপর থাকিব। এইরূপ বিশ্বাসী ভৃত্য হইয়া যিনি ঈশ্বরের নিকটে আসিবেন, তিনি আসিতে পারিবেন। সমস্ত দিন পরে যখন তাঁহার নিকটে যাইব, বলিতে পারিব "আজ তোমার অনুগত ভৃত্য সেবা করিয়া আসিয়াছে। আজ পাঁচটী কাজ করিতে সমর্থ হইয়াছে। দুঃখীর দুঃখ মোচন করিয়াছে, অত্যাচরিতকে অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছে, ক্ষুধার্ত্তকে আহার, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দিয়াছে, পাপব্যাধিগ্রস্তকে তোমার নাম-সুধা পান করাইয়াছে। দীন অনুগত দাস তোমাকে নমস্কার করিতে আসিল।" ভৃত্য নমস্কার করিয়া আনন্দসাগরে ভাসিল। ভোগানন্দ সেবানন্দ উভয় আনন্দের মহাসাগর উথলিত হইয়া উঠিল। এই দুই আনন্দের একটী হইতে আর একটী বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না। ভক্ত হইলে সমস্ত দিন তাঁহার সেবা করিয়া হৃদয়কে আনন্দে পূর্ণ করিতে হইবে। আজ ভৃত্য হই নাই, অনুগত হইয়া

তাঁহার কার্য্য করি নাই, রিপু দমন করি নাই, তাঁহার কথা শুনি নাই, এই অনুতাপে আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়া ভক্ত যোগানন্দের সুখ অনুভব করিতে পারিবেন না। "ঘরে বসিয়া তোমার মুখ দর্শন করিয়া সুখী হইব" ভক্ত এ কথা কখনও বলিতে পারেন না। ভক্ত যিনি তিনি ব্রহ্মের দর্শন স্পর্শন এবং তাঁহার সেবাতে নিয়ত সুখী হন।

হে ব্রাহ্মগণ, তোমরা সৎপথে থাকিয়া উভয় আনন্দ লাভের চেষ্টা কর। আমরা তাঁহার উপাসনা করিয়া সুখী হইয়াছি, কিন্তু সেবার মধ্যে কি আনন্দ-মহাসাগর আছে এখনও জানিতে পাই নাই। প্রেমময় বলিয়া ডাকিয়া আনন্দিত হইয়াছি, প্রভু বলিয়া ডাকিয়া এখনও আনন্দিত হইতে পারি নাই। প্রেমমুখ দর্শনের সুখ সম্ভোগ করিয়াছি, উহা স্মরণ করিয়া মনকে সুখী করিয়াছি। কিন্তু যখন চরণ সেবা করিয়া সুখী হইব, তখন আর সুখের শেষ থাকিবে না, নিয়ত সুখ-সমুদ্রে সন্তরণ করিতে থাকিব। তখন আর আমাদিগের আত্মাতে আনন্দ ধরিবে না। দুই আনন্দের প্রয়াসী হইয়া নিয়ত যত্ন কর, চেষ্টা কর। রিপু সকল দমন করিয়া পরসেবায় নিযুক্ত হও, ঈশ্বরের কার্য্য কর। প্রভু বলিয়া যত তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবে, প্রসন্ন হইয়া তিনি তোমাকে তত সুখী করিবেন। বিনীত হইয়া যত সেবায় নিযুক্ত থাকিবে, তত প্রভুর প্রতি ভক্তি বাড়িবে, অন্তরে বাহিরে ব্রহ্মদর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন এই প্রকারে যেন চিরদিন আমরা উভয় আনন্দ ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

আদেশ পালনে আনন্দ।

রবিবার, ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৭ শক; ৬ই জুন, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

আনন্দ মহাযোগ কোন্ সাধকের স্পৃহনীয় নহে? ব্রহ্মপূজা ব্রহ্মসেবা করিলে যে আনন্দ লব্ধ হয়, তাহার সমষ্টি কোন্ যোগী না প্রার্থনা করিবেন? আমরা সুখের জন্য প্রাণধারণ করিতেছি, অনন্তকাল ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিব এজন্য সৃজিত হইয়াছি। আমরা দুঃখ পাই, বিপদে নিপতিত হই সংশোধনের জন্য। লক্ষ্য সেখানে, গম্যস্থান সেখানে—যেখানে নির্ম্মলানন্দ উপভোগ করিব, ঈশ্বরপূজা করিয়া সিদ্ধকাম হইতে সক্ষম হইব। এক ঘণ্টা ঈশ্বর সহবাসের কি আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলা যায় না; এরূপ ভাবে সমস্ত দিন মগ্ন থাকিতে পারা যায়। পূজার আনন্দ বিশুদ্ধ, সুমিষ্ট, তাহাতে ব্রাহ্মের সমস্ত ভাব মগ্ন হয়। কেবলই ব্রহ্ম জ্ঞান, ব্রহ্ম ধ্যান, ব্রহ্মানন্দ-রস পান। নামরসে মত্ততা, উপাসনার অঙ্গ সাধন, এ সকলই আনন্দবর্দ্ধক। যে পরিমাণে ব্রহ্মের পূজা করি, সেই পরিমাণে হৃদয় ভৃত্য হইয়া সেবা করিতে চায়। "হে নাথ, বল, আমার এই জীবন তোমায় দিয়া যেন কৃতার্থ হইতে পারি" উপাস্য উপাসকের মধ্যে এ প্রকার সেবার ভাব স্বাভাবিক। বিবেচনা করিলে প্রতিপন্ন হইবে, উপাস্য কখনও উপাসককে ভৃত্যভাব হইতে দূরে রাখিতে পারেন না। আমরা উপাসনার স্রোতে ভাসিয়া যাই; প্রেম উদ্বেলিত হইয়া উঠে; অন্তরের গভীর স্থানে প্রেম ভক্তি উদিত হইয়া সমস্ত হৃদয়কে প্লাবিত করে। আমরা সংসারকে নিকটে আসিতে দিই না; পাছে সেই দ্বার

অবরুদ্ধ হয়, বিষয়চিন্তায় ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব আত্মাতে প্রতিভাত না হয়।

সাধক বিষয়চিন্তা হইতে নিবৃত্ত হইয়া ঈশ্বরের কার্য্য করিতেছেন, ভক্তি প্রেম উচ্ছ্বসিত হইতেছে, প্রাণ আকুল হইয়া অনুরোধ করিতেছে, "হে ঈশ্বর, তুমি কি চাও, গরিবের হাত হইতে তুলিয়া লও। প্রভুর সেবা করিতে না পারিলে জীবন বৃথা। অন্তরে প্রভুভক্তি আরও যথেষ্ট চাই, সেবকের মন ইহাতে সন্তুষ্ট হইবে না।" আজ্ঞা পালন করিতে গিয়া, তিনি হাতে তুলিয়া যে কাজ দেন সেবক তাহাই গ্রহণ করে, তিনি হাতে তুলিয়া না দিলে সেবকের মনে আনন্দ হয় না। নামের গুণে তাহার মন মাতান গেল, কিন্তু ভৃত্যভাবে দাসভাবে কর্ম্ম করিতে না পাইলে, কে তাহাকে পরিতৃপ্ত করিবে? এ আনন্দে ভৃত্য কৃতকৃতার্থ হয় না। উপাসককে আনন্দ দিয়া কৃতার্থ করিলেন, আজ্ঞা দিলেন এই কর্ম্ম কর, তখনই তাহার পূর্ণ আনন্দ হইল। এই আজ্ঞা পাইবার জন্য দুই চারি ঘণ্টা প্রভুর দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিল, যাই আজ্ঞা পাইল আর আনন্দ ধরে না। অদ্য তাঁহার আজ্ঞা উপার্জ্জন হইল, এই অপদার্থ শরীর তাঁহার কার্য্য করিবে, এই বলিয়া ভৃত্য আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। কার্য্য করা দূরে থাকুক, আদেশ শ্রবণ মাত্র ভৃত্য প্রফুল্ল হইতে লাগিল। গরিব, কাঙ্গাল, ব্যাধি ও রোগগ্রস্ত এই শরীর, নিতান্ত অক্ষম আমি কি করিব? প্রভু যে আজ্ঞা করিলেন, আমাকে প্রেমদৃষ্টিতে দেখিলেন, এই আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্য। আদেশ পালন করিতে পারিলে, না জানি কত আনন্দ হইবে। ক্ষমতা নাই, ঈশ্বর বলিয়াছেন সে কার্য্য সাধন করিতেই

হইবে। কার্য্যের উপকরণ সমুদয় একত্র করিল, প্রাণসখার আজ্ঞা পালন করিতে উদ্যোগ করিল, অল্প পরিমাণে পালন করিতে সমর্থ হইল, আনন্দ ধরে না। ভৃত্যের এই অপদার্থ শরীর দ্বারা তাঁহার আজ্ঞা পালন হইল, ইহার অপেক্ষা আর আনন্দের কারণ কি আছে? সামান্য কাজ করিয়া হস্ত আরও সক্ষম হইল, মন আত্মপ্রসাদ সম্ভোগ করিল। তাঁহার আদেশ সুসম্পন্ন করায় আনন্দ ভৃত্যের সমুদয় মনকে সুপ্রসন্ন করিয়া রাখিল। ভৃত্য আবার তাঁহার আদেশ শুনিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। শুনিতে পাইল না, আদেশ পালন করিতে পারিল না, তবু আশা উৎসাহে কর্ণপাত করিয়া একদৃষ্টে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিল, আবার আদেশ আসিল, সেই আজ্ঞা প্রতিপালনে বাহির হইল। যেখানে যায়, সেইখানেই তাঁহার কার্য্য করে, এক বৎসর, দুই বৎসর পরম আনন্দে অন্যের প্রতি দয়া বিস্তার করিয়া অতিবাহিত হইল, কত আনন্দ কত আহ্লাদ! আজ এক আজ্ঞা পালন করিলাম, আবার সন্ধ্যার সময় এই কথা শুনিলাম, তিনি বিশেষ ভার অর্পণ করিলেন। নিকটে আসিতে বলিলেন, প্রথমে বিশেষ স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, বিশেষ লোকের পদসেবা করিতে বলিলেন, আর শরীর অস্পৃশ্য, মন অগ্রাহ্য রহিল না, আর মরিবার ভয় রহিল না; কেন না প্রভু আনন্দে মরিতে দিবেন। দাস মরণ দিনের প্রতি আনন্দদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। তিনি শেষ দিনে বলিলেন, "দাস তোমার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি অনন্তকাল পুরস্কার সম্ভোগ কর।" অনুগত ভৃত্য নিশ্চিত জানেন, এখানে সেবার যৎপরোনাস্তি আনন্দ লাভ হইবে, মৃত্যু যন্ত্রণারও ভয় থাকিবে না, সে সময়ে ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া

আশীর্ব্বাদ করিবেন, ভৃত্য পরম আহ্লাদে পরলোক যাইতে সক্ষম হইবে।

ঈশ্বরের আদেশ পাইয়া যদি একটী কাজ করা যায়, সেটী অল্প হউক তাহাই যথেষ্ট। সাধু ব্যক্তি অনেক কাজ করেন, কিন্তু উহা ঈশ্বরের কাজ নহে। তিনি পরোপকার করিয়া সে সুখ সম্ভোগ করিতে পারেন না। পৃথিবীর ধর্ম্ম যেখানকার, পুরস্কার সেখানেই থাকিয়া যায়। ঈশ্বরের ভৃত্য সমুদয় বৎসর যদি তাঁহার একটী আদেশ সাধন করিতে পারে, তাহা হইলেই কৃতার্থ হয়। ধন্য সেই সাধক যিনি প্রতিদিন তাঁহার আদেশ শুনিতে চান, শুনিতে পাইয়া তাহা পালন করেন! তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে গিয়া আমার সমুদয় তাঁহাকে দিতে হইবে। আমার বলিবার যাহা কিছু আছে তাহা তিনি স্বহস্তে তুলিয়া লইলেন এইজন্য আমি বৈরাগী। সমুদয় বিষয় সম্পত্তির উপরে আর আপনার বলিবার কিছুই রহিল না। প্রথমে কেবল চাহিবে, কিছু দিব না এরূপ হয় না। তিনি যখন যাহা চান, তখন তাহাই দিতে হইবে। সংসারের বিষয়সুখ সকলই তাঁহার চরণতলে সমর্পণ করিয়া রখিব। যখন বলিবেন তাঁহার একটী তুলিয়া দাও, তখন তাহাই তুলিয়া দিব। যে বৈরাগী আপনি কষ্টে সৃষ্টে সব দিতেছেন তাঁহার পুরস্কার লাভ হইল না। তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশে দিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তরে প্রসন্নতা নাই। তিনি এক একটী বস্তু চাহিতেছেন, এক একটী করিয়া দিতেছি, এরূপ বৈরাগ্য না হইলে সুখ হয় না। এত দিলাম সংসারের বৈরাগী কেবল এই ভাবে। ঈশ্বরমন্ত্রে দীক্ষিত বৈরাগী দেখে ঈশ্বর আমার নিকটে একটী টাকা চাহিয়াছেন, আমি তাহা তাঁহাকে

তুলিয়া দিয়াছি, অন্ন চাহিলেন অন্ন দিয়াছি, এই সুখ হইতে বঞ্চিত হও বলিয়াছেন, বঞ্চিত হইয়াছি। আজ ভোগবিলাস-বিবর্জ্জিত আয়োজ করিতে বলিয়াছেন সেইরূপ করিয়াছি। বলিলেন ও পথে অগ্রসর হইও না, অগ্রসর হইলাম না; তৃষ্ণায় জল পান করিতে গেলাম, বলিলেন তৃষ্ণায় জল মুখে দিও না, অমনই দূরে বিষবৎ পরিত্যাগ করিলাম। বন্ধু বান্ধব ছাড়িয়া নির্জনে গিয়া কঠোর ব্রত সাধন করিতে বলিলেন, তাহাতেই প্রবৃত্ত হইলাম। যথার্থ বৈরাগ্যের বিধি এই; যথার্থ বৈরাগী—ভৃত্য এবং দাস। এরূপ বৈরাগীর কার্য্যে তৃপ্তি ও প্রসন্নতা লাভ হয়। বৈরাগী হইব বলিয়া সমুদয় সুখে জলাঞ্জলি দিলাম, যাহা কিছু ছিল সকলই ত্যাগ করিলাম, ইহা বিকৃত বৈরাগ্য। ইহার সমুদয় ত্যাগ ভস্মে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। ঈশ্বর অমুক সামগ্রী চাহিলেন, আমি তাহাকে অর্পণ করিলাম, এরূপ জানিয়া যে ত্যাগ করিতে পারিল না, তাহার সমুদয় ত্যাগের সামগ্রী নদীজলে নিক্ষেপ করা হইল। যখন ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার অর্পিত সামগ্রী তাঁহার চরণতলে অন্বেষণ করিতে লাগিল, তাহা দেখিতে পাইল না। জিজ্ঞাসা করিল, অমুক সামগ্রী তোমায় অর্পণ করিয়াছিলাম তাহা কই? সে সকল তুমি তোমারই হস্তে দিয়াছিলে, তিনি ত তাহা নিজ হস্তে গ্রহণ করেন নাই, তিনি তাহা স্পর্শও করেন নাই। ভ্রাতঃ, বিবেচনা করিয়া দেখ তুমি উদাসীন হইয়া প্রত্যেক সামগ্রী তাঁহাকে প্রদান করিলে, তাহা তিনি গ্রহণ করিবেন না, আর তিনি যাহা তোমার নিকট চাহিলেন, তুমি দিলে তিনি গ্রহণ করিবেন। তাঁহার আদেশ পালন করিবে বলিয়া সকল ছাড়িয়া ধর্ম্ম পালন করিলে, হৃদয়ে তোমার মাধুর্য্য

ফুল ফুটিল, তিনি তোমার হৃদয় উদ্যান হইতে স্বয়ং সেই ফুল তুলিয়া লইলেন, তোমার প্রত্যেক কষ্ট সুখ উৎপাদন করিল, নিরুপম প্রফুল্লতা লাভ করিলে।

ঈশ্বরের ভৃত্যের দুই অধিকার লাভ হয়। তাঁহার বলে সাধন, তাঁহার প্রসাদে তুলিয়া দেওয়া। উপাসক নয়ন নিমীলিত করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন, যতই ভাবেন উচ্চ গভীর ভাবে নিমগ্ন হন, স্মরণ মাত্র উচ্চ আনন্দ লাভ করেন। নাম শুনিয়া আনন্দ-সাগরে ভাসেন, কিন্তু ইহাতেও অর্দ্ধেক সুখ লাভ হইল, সমস্ত সুখ ভৃত্য না হইলে পাওয়া যায় না। প্রাণসখার ইচ্ছা পালন না করিলে হৃদয় বিষাদে আচ্ছন্ন হয়। হৃদয় বিপদের ঘন মেঘে আচ্ছন্ন, মনের অন্ধকার ঘুচিল না। দয়ার সাগর দুঃখ দূর করিবেন বলিয়াছেন, তাঁহার আদেশ পালন করিলাম, তাঁহার নিকট গিয়া দেখি তাঁহার মুখে সেই কথাটী লিখিত আছে। সেই আনন্দচন্দ্রের উপরে একখানি মেঘ আবৃত রহিয়াছে। যখন তাঁহার মুখে শুনিলাম, "সন্তান কেন নিজের দুঃখ বৃদ্ধি করিতেছ, কেন আমার আদেশ অবহেলা করিতেছ," তখন বুঝিলাম যতদিন তাঁহার বাধ্য দাস না হইব ততদিন এ দুঃখ সহ্য করিতেই হইবে। আর দুঃখ সহ্য করিব না। আজ এই আসক্তি তুলিয়া ফেলিতেই হইবে। ছাড়িতে হইবে বলিয়া অনুগত ভৃত্য পঞ্চাশ বৎসরের আসক্তি ছাড়িতে যত্ন করিল, তথাপি ছাড়িতে পারিল না। এখন এ আসক্তি ছাড়িবার জন্য শক্তি আসিবে কোথা হইতে? তিনি স্বয়ং দিবেন। যিনি ভৃত্য করিলেন, তিনি অবশ্য সাধন করাইয়া লইবেন। এ সম্বন্ধে ক্ষমতা বল তিনিই দিবেন। সম্মুখে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে চলিতে হইবে। যে দশ ক্রোশকে

এক ক্রোশ ভাবিবে সে অনায়াসে চলিতে পারিবে, পথ সুগম প্রতীত হইবে, কেন না পথ সঙ্কীর্ণ করিয়া লওয়া হইয়াছে। যে মনে করিল চল্লিশ বৎসর বাঁচিব, উঃ! এতদিন অমুক পাপ করিব না, মনে ভাবিয়া হতাশ হইয়া পড়িল। এত রিপু কিরূপে ছেদন করিব ভাবিতে ভাবিতে মন অবসন্ন হইল, আশাপ্রদীপ নির্ব্বাণ হইল। বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রকে সঙ্কীর্ণ কর। আমার বল নাই, সম্বল নাই নিবেদন করিয়া বল, আমি এক সপ্তাহ কেবল ভৃত্য থাকিব; এক সপ্তাহের সেবা ভার গ্রহণ করিয়া তুষ্ট করিবার যত্ন করিব, ঠিক থাকিতে চেষ্টা করিব, ঈশ্বর এ যুক্তি শ্রবণ করিবেন। এ প্রকার প্রণালী অবলম্বন করিলে নিশ্চয় কৃতার্থ হইবে। যে ব্যক্তি মনে করে আমি একেবারে সমস্ত জীবন নিষ্কলঙ্ক থাকিব, সে ভয়ানক অহঙ্কারী। তাহার পদে পদে পতনের সম্ভাবনা। বল "হে ঈশ্বর, আমি সপ্তাহ ব্রত গ্রহণ করিতেও সাহসী নই, দুই দিন তোমার নিকটে দাস হইয়া পড়িয়া থাকিব।" ঈশ্বর স্বর্গ হইতে তোমার উপরে কত আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিবেন। তোমার কিছুতেই রাগ পরাজয় হয় না, বল, "এই ব্রত গ্রহণ করিলাম দু দিন রাগ করিব না।" দু দিন রাগ করিলে না। চল্লিশ বৎসর জীবিত রহিলে, সে চল্লিশ বৎসর মধ্যে দু দিনও নির্ম্মল রহিয়াছ, দু দিন পাপ কর নাই স্মরণ করিয়া প্রসন্নতা লাভ করিবে। ফলতঃ দেখিবে, দুই দিন বলিয়া আরম্ভ করিলে, দুই দিবস হইতে এক সপ্তাহ, এক মাস, এক বৎসর রিপুর আক্রমণ হইতে মুক্ত থাকিতে পারা যায়। যে দুই দিন বিশুদ্ধ থাকিতে পারে, সে সমুদয় জীবন বিশুদ্ধ থাকিতে পারে। অতএব বলি, ব্রত গ্রহণে সমুদয় জীবন প্রমুক্ত থাকিব, ইহা বলিয়া লোভ

করিও না। অল্প সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া লও, যদি একদিন প্রভুকে সন্তুষ্ট করিতে পারি, সেটী চিরজীবনের জন্য আদর্শ রহিল। সেই দিকে দৃষ্টি করিয়া উৎসাহের অগ্নি প্রজ্বলিত থাকিবে। একদিনও যে পবিত্রভাবে তাঁহার সেবা করিয়াছি, ইহা স্মরণ করিয়া সকল দুঃখ চিন্তা ভাবনা চলিয়া যাইবে। যদি ভৃত্য একবার ব্রত গ্রহণ করিয়া পালন করিতে সমর্থ হয়, তবে তাহার চিরজীবনের আশা হইল।

স্বাধীনতা। *

রবিবার, ৭ই আষাঢ়, ১৭৯৭ শক; ২০শে জুন, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

ভাবিতে ছিলাম ঈশ্বর মনুষ্যকে স্বাধীনতা দিলেন কেন? ভাবিবার প্রয়োজন নাই। আপনি এই উত্তর উপস্থিত হয়, অধীন করিবার জন্য স্বাধীন করিয়াছেন। এ কথা শুনিলে সঙ্গত বোধ হয় না। পশ্চিম দিকে লইয়া যাইবার জন্য কে পূর্ব্ব দিকে লইয়া গিয়া থাকে? অন্ধকার ও আলোকের প্রভেদ কোন্ ব্যক্তি অস্বীকার করিবে? শাদা ও কালতে যত প্রভেদ, স্বাধীনতা ও অধীনতায় তত প্রভেদ। স্বাধীন হইয়া অধীন হওয়া যায়, এ যে বিপরীত কথা? স্বাধীনতা অধীনতার অর্থই যে বিপরীত? এক পথ দিয়া তাহার বিপরীত পথে কিরূপে লইয়া যাইবে? এরূপ করিবার গূঢ় অভিপ্রায় কি? যাঁহার জ্ঞান শক্তি অসীম, তিনি এ প্রকার কার্য্য করিলেন কেন? অসীম শক্তিময় ঈশ্বর মনুষ্যকে একেবারে জন্ম হইতে অধীন করিয়া সৃজন করিলেন না কেন? পিতার ইচ্ছার অধীন হইয়া সন্তান তাঁহার মতে চলিবে, তিনি মনুষ্য প্রকৃতিতে এমন ভাব দিলেন

না কেন? অসীম জ্ঞান শক্তি যাঁহার তাঁহার কি উহা অসাধ্য? তিনি আমাদিগের আত্মাকে এমন করিয়া কি গঠন করিতে পারিতেন না যে, আমরা জন্ম হইতে তাঁহার চরণতলে ভৃত্য হইয়া, অনুগত হইয়া পড়িয়া থাকিতাম? কি কথায়, কি ভাবে, কি কাজে, কি চিন্তায় কখনও তাঁহার বিরোধী হইতাম না? তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই অসম্ভব ছিল না, অসম্ভব নাই, অসম্ভব হইতে পারে না। তাঁহার জ্ঞান শক্তি অপূর্ণ নহে। তবে তিনি কি অভিপ্রায়ে এ প্রকারে সৃজন করিলেন না? যদি কোন অভিপ্রায় না থাকিবে তবে বিপরীত পথে যাইবার সামর্থ্য দিলেন কেন? তিনি আমাদিগের মধ্যে এমন একটা ভাব দিলেন যে, ক্রমে ক্রমে আমরা অধীনতার দিকে যাইতে পারি। একেবারে স্বাধীন করিয়া সৃজন করিবার অভিপ্রায় কি? তিনি চন্দ্র সূর্য্যকে জড় করিয়া এমন কঠিন নিয়মে বান্ধিয়া দিলেন যে, তাহারা সেই অবধি এ পর্য্যন্ত কিছুমাত্র নিয়ম অতিক্রম করিতে পারে নাই। তাবৎ ভৌতিক পদার্থকেই অধীন করিয়া সৃজন করিলেন। এইরূপ অধীন করিয়া সৃষ্টি করাতেই জগতের মঙ্গল, মনুষ্য জাতির উন্নতি। জগতের সমুদয় পদার্থের স্বাধীন ইচ্ছা থাকিলে, সে জগৎ থাকিত না। জনসমাজের উন্নতিই বা কোথায় থাকিত? ব্রহ্মাণ্ড নিয়মে আবদ্ধ, ইহাতে উহার আপনার কল্যাণ, মনুষ্য জাতির কল্যাণ। জীব জন্তু সকলেই স্বভাবের অধীন, ধর্ম্ম অধর্ম্ম এ দুয়ের মধ্যে তাহারা আসিতে পারে না। মনুষ্য স্বাধীন এইজন্য তাহার ধর্ম্ম আছে।

ঈশ্বর স্বাধীন করিলেন কেন? মনকে জিজ্ঞাসা করি, মন সহজে উত্তর দেয়, অধীন করিবার জন্য। পিতার ইচ্ছা, পিতার

আজ্ঞা, পুত্র ইচ্ছা করিলে পালন করিতে পারে, লঙ্ঘনও করিতে পারে। পিতা পুত্রকে স্বাধীনতা দিলেন এইজন্য যে, উহা অধীনতার পক্ষে উপায়। আপাততঃ ইহা অসঙ্গত বোধ হয়, কিন্তু বিশ্বাস করিতে হইবে। মনুষ্য স্বাধীনভাবে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে কথনও জ্ঞানের পথে কথনও অজ্ঞানের পথে, কথনও ধর্ম্মের পথে কথনও অধর্ম্মের পথে গমন করে। এইরূপ গমন কেবল স্বাধীনতা হইতে অধীনতায় আনিয়া দিবার জন্য। স্বাধীনতা প্রস্ফুটিত হইয়া অধীনতা জন্মে। পরিশুদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন হওয়াই মঙ্গল। অবস্থা নির্ব্বিশেষে তাঁহার অনুগত দাস দাসী হইয়া কর্ম্ম করিলে ধর্ম্মের আদেশ পালন করা হয়। সকলে তাঁহার পদানত হইবে, তাঁহার ইচ্ছার আনুগত্য স্বীকার করিবে, অধীন দাস দাসী হইবে, এইরূপ অধীন হওয়াই স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। অধীন হইয়া অধীন হইব না, কিন্তু স্বাধীন হইয়া অধীন হইব। ঈশ্বরের ইচ্ছা নয় যে, সূর্য্য চন্দ্র ধার্ম্মিক হয়, এইজন্য তিনি তাহাদিগকে নিয়মে বান্ধিয়াছিলেন। মনুষ্য ধার্ম্মিক হইবে, স্বাধীন হইয়া স্বাধীনভাবে স্বাধীনতা বিক্রয় করিবে, অধীন হইয়া অধীনভাবে কেহ বিক্রয় করিতে পারে না। অধীনভাবে কিছু দেওয়া যায় না, কিছু বিনিময় করা যায় না। পূর্ণ স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া ফেলিলে তিলার্দ্ধ অধীনতা থাকিবে না। অধীনতা থাকিলে বিপর্য্যয় হইবে। বিপাকে পড়িয়া স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়াছি, এ কথা বলিতে পারা যায় না, এজন্য ঈশ্বর বিপাকে ফেলিয়া আমাদিগের স্বাধীনতা গ্রহণ করেন না।

স্বাধীনতা আনন্দের সহিত বিক্রয় করিব। উহার বিনিময়ে পরিত্রাণ এবং অতুল আনন্দ লাভ করিব। স্বাধীনভাবে যথার্থ মূল্যে

অধীনতা গ্রহণ করিয়াছি সকলে সাক্ষ্য দিবে। ফলতঃ স্বাধীনভাবে অধীনতা গ্রহণ করিতে হইবে। সাধক সর্ব্বস্ব অর্পণ করিবেন। এক নিমেষ সাধক বিশ্বাস করিলেন, আমি সমুদয় ত্যাগ করিয়াছি। আমি আমি তুমি তুমি এ ভ্রম চলিয়া গেল, সমুদয় ঈশ্বর, তোমারই হইল। এক নিমেষ পূর্ব্বে অধিকার ছিল, যাই স্বত্ব পরিত্যাগ করিল, পৃথিবীর আইন মতে আর তাহাতে অধিকার থাকে না। ধর্ম্মরাজ্যেও স্বত্ব ত্যাগ করিলে আর তাহাতে অধিকার থাকে না। সেই নিমেষে সমুদয় জীবন পরিবর্ত্তন হইল। দশ সহস্র বৎসর পশ্চাদ্দিকে তাকাইয়া সেই দিন মনে করিয়া সুখ হয়। সমুদয় অর্পণ করিয়া নিমেষের মধ্যে, এক বিন্দু সময়ের মধ্যে সহস্র সূর্য্যের তেজ, কোটী চন্দ্রের জ্যোৎস্না প্রকাশিত হইল। এক নিমেষে যাহা হইল তাহাই অনন্ত কালকে পরিতুষ্ট করিল। অনন্তকাল সুধাপান করিতে লাগিল। বিশ্বাসী হইয়া অধীনতা ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, আমি আর নাই। আমার সকলই তোমারই। মহত্ত্ব শক্তি জ্ঞান অনন্তকাল সম্ভোগ করিতে চলিল। আমার সকলই ঈশ্বর গ্রহণ করিয়াছেন, যাহা তিনি বলিতেছেন করিতে হইবে। তাঁহার কথা মুখে বলিব, তাঁহার প্রেমে নিমগ্ন থাকিব, তাঁহার আজ্ঞা মস্তকে বহন করিব। এক নিমেষে এত ব্যাপার! এত কেন হইল? সেই এক নিমেষের পরিবর্ত্তনের জন্য। এতকালের স্বাধীনতা বিক্রয় করিলাম, ইহার জন্য বুদ্ধি জ্ঞান ধর্ম্ম মূল্যস্বরূপ পাইলাম। স্বাধীনতা কাড়িয়া লইয়া ঈশ্বর পরিত্রাণ দিলেন।

স্বাধীনতার কত আড়ম্বর! ধনে মত্ত, অহঙ্কারে মত্ত, কেহই অধীনতা স্বীকার করিতে চায় না, তথাপি তিনি বিপাকে ফেলিয়া

স্বাধীনতা লইতে চান না; কোন সন্তান বিপাকে পড়িয়া ধর্ম্মের অনুরোধে অধীনতা গ্রহণ করিয়াছে, এ কথা বলিতে না পারে এই প্রকার ঈশ্বরের কার্য্যপ্রণালী। বিপাকে পড়িয়া অধীনতা গ্রহণ করিয়াছে এ কথা বলিলে সমুদয় সুখ চলিয়া গেল। অমুক আমাকে টানিয়াছেন তাই আমি ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঐ সকল কার্য্য করিয়াছি, এ কথা বলিলে স্বাধীনভাবে অধীন হওয়া হইল না। স্বাধীনতা কয়েক বৎসর ভোগ করিয়া, পরে যদি অধীনতা গ্রহণ করা যায়, তবে অধীনতার আনন্দ অনুভব করা যায়। স্বাধীনভাবে স্বাধীনতা বিক্রয় না করিলে ধর্ম্মে অধীনতা হইতে পারে না। এই ক্ষমতা আমাদিগের হাতে দিয়া ঈশ্বর আমাদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন।

ঈশ্বর মনুষ্যকে স্বাধীনতা দিয়া যে ভাব রক্ষা করেন, পৃথিবীর সমুদয় মনুষ্যের প্রতি সেই ভাব রক্ষা করা উচিত। স্বাধীনতা সম্বন্ধে মনুষ্যের সঙ্গে ঈশ্বরের ব্যবহার আলোচনা করিলে জীবনের বিশেষ উন্নতি হইবে। যিনি উপদেশ প্রদান করেন, যাঁহারা উপদেশ গ্রহণ করেন, যিনি অপরকে পথ দেখান, যাঁহারা সেই পথ অবলম্বন করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যে প্রকার সম্বন্ধ তাহাতে তাঁহাদিগের জীবনে এই সত্যটী বিশেষরূপে জীবনে মুদ্রিত হওয়া আবশ্যক। উপদেষ্টা বা পথ প্রদর্শক স্বাধীনতা দিবেন কেন, না যাহারা উপদিষ্ট হইতেছে অথবা আদিষ্ট পথ অবলম্বন করিতেছে, তাহারা স্বয়ং অধীনতায় আসিবে এইজন্য। সর্ব্বত্র স্বাধীনতা দিয়া অধীনতা আনয়ন করিতে হইবে, অন্যথা সমুদয় যত্ন বিফল হইবে। যদি স্বাধীনতা বিনাশ কর বা তজ্জন্য চেষ্টা কর, সকলে ভয়ে ভীত হইবে, ক্রোধে প্রজ্বলিত হইবে, আরও স্বাধীনতা প্রকাশ করিবে। অতএব উপদেষ্টা বা

নেতা যেমন একদিকে স্বাধীনতা দিবেন, শিষ্যগণেরও কর্ত্তব্য এই স্বাধীনতা অধীনতায় পরিণত করেন। স্বাধীনতা অধীনতা আনিবার উপায়, এই অর্থ যেন সকলে গ্রহণ করেন। যে পাষণ্ড স্বাধীন হইয়া ধার্ম্মিক হইতে চায়, তাহাকে অনুতাপ সহ্য করিতে হইবে। স্বাধীন হইয়া ধার্ম্মিক হইব, ইহা এই পৃথিবীর কুশাস্ত্রের কথা। স্বাধীন হইয়া আপন মত বজায় রাখিব, বুদ্ধি তর্ক দ্বারা বুঝিয়া তবে ধর্ম্ম অবলম্বন করিব, যাহার মনের শক্তি অনন্ত সেই এ কথা বলিতে পারে। ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, মনুষ্য বুঝিতে গিয়া এক অংশমাত্র বুঝিবে। নূতন সত্যের যেমন এক অংশ বুঝিল তেমনই অবশিষ্ট শত অংশ জ্ঞানের বহির্ভূত রহিল। সহস্র চেষ্টা করিলেও তাহা জ্ঞানের বহির্ভূত থাকিয়া যাইবে। কেহ একেবারে জ্ঞানবলে সমুদয় পরিষ্কার করিতে পারে না। কেহ যেন এ বিষয়ে চেষ্টা না করে। স্বাধীনতার নামে অধর্ম্ম আনা হইবে। আমরা এখানে আসিয়াছি অধীন হইবার জন্য; স্বাধীনতা পাইয়াছি, অধীনতা ক্রয় করিবার জন্য; যাহা শুদ্ধ তাহা অধীনতায়, তাহাতে কোন পাপ নাই, অপরাধ নাই। সুতরাং অধীনতা ক্রয় করিয়া শুদ্ধতা গ্রহণ করিতে হইবে। শুদ্ধি আগে বুদ্ধি পরে। বুদ্ধি অপেক্ষা সর্ব্বাগ্রে শুদ্ধি প্রয়োজনীয়; বুঝি আর না বুঝি সম্পূর্ণ অধীন হইব। আমি আমার মতে চলিব এ কথা আর বলিব না। আমিত্ব বিনাশ করিব, আমি এ কথা আর থাকিবে না। আমার বুদ্ধি আছে, আমি বুঝিয়া চলিব এ অভিমান কখনও করিব না। আমি কিছুই করিব না, একবার ঈশ্বরের নিকটে দাঁড়াইয়া তাঁহার অধীন হইব। এই অধীন হওয়াই সমুদয় জ্ঞান বুদ্ধির মূল।

বুদ্ধি আমাদের নেতা, শুদ্ধি বুদ্ধির পরে, আমি স্বয়ং বুঝিয়া উপদেশ শুনিয়া, পুস্তক পাঠ করিয়া, সমুদয় স্থির করিব, এই ভ্রমজালে যতই বদ্ধ হইবে, বুদ্ধি ততই আরও জড়িত হইয়া পড়িবে। স্বাধীনতা প্রার্থনার বিষয় নয়, অধীনতা চাই, নতুবা সে মরিবে। একজনও স্বাধীন থাকিবে না, সকলে ঈশ্বরের অধীন হইবে। আমার বলিবার কাহার যেন কিছু না থাকে। আমার মনুষ্যত্ব বিনষ্ট করিয়া ফেলিব, অকুতোভয়ে সমুদয় ঈশ্বরের চরণে বিক্রয় করিব, সন্দেহ করিব না। পরে যখন সম্বলের প্রয়োজন হইবে, তখন কোথায় পাইব, এরূপ পাপ-সংশয় পোষণ করিব না। সন্দিগ্ধ আত্মা নিশ্চয় মরিবে। একবার দিয়া চিরজীবন পরিতাপ করিতে হইবে, এ আবার কি? যাহা দিয়াছি, বুঝিয়া দিয়াছি, অনুতাপ করিবার কিছুই নাই। সন্দিগ্ধ মনে কখনও দিব না, যাহা দিব নিঃসংশয় মনে। আর এখন বুঝিবার অধিকার রাখি নাই, তিনি বুঝাইলে বুঝিব। যত ভক্ত হইব, যত অধীন হইব, তত বুদ্ধি খুলিবে। গণনা করি, শাস্ত্র পড়ি, বুঝিতে যাই, অন্ধকার দেখি। কেন আর স্বাধীন হইতে গিয়া পতনের পথে যাইব? ঈশ্বরের ক্রীত দাস হইয়া অধীনতা-ব্রত গ্রহণ করিয়াছি; মনুষ্যের কাছে, ধর্ম্মসমাজের কাছে, ধর্ম্মশাস্ত্রের কাছে সর্ব্বত্র অধীন হইব। বুঝিতে পারি আর নাই পারি চলিতেই হইবে। তিনি যাহা দিলেন তদনুসারে কাজ করিবই। যদি এইরূপে চলিতে পারি, এখনই আগুন জ্বলিয়া উঠিবে। আর কতকাল অবিশ্বাসী ভীরু হইয়া অবস্থিতি করিব? সেই আগুনে পড়িতেই হইবে। কি ভয় আমাদিগের যদি ঈশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিয়া থাকি? সাধন, সাধন, সাধন বলিয়া মরিলাম, ভৃত্য হইয়া

থাকিলে এতদিন কি না হইত? কি জানি লোকে অধীন বলিবে, এই ভয়ে এতকাল অধীন হইলাম না। সমুদয় ভয় পরিত্যাগ করিয়া আমরা সম্পূর্ণ অধীন হইবার ব্রত গ্রহণ করিব। যিনি আমাদিগের নিকটে আসিবেন, যদি তিনি গরিবও হন, তবু আমরা তাঁহার নিকটে অধীন। আমরা দাসের দাস তাহার দাস। আমাদের ইহকালে অধীনতা পরকালে অধীনতা। ইহাতেই আমাদের সুখ, ইহাতেই আমাদের শান্তি। আইস এখন সাধন করি, যেটুকু স্বাধীনতা আছে, তাহা এককালে ক্ষয় হইয়া যাক্। সকল জগতের নিকট মস্তক অবনত করিয়া রাখিব, সর্ব্বদা অধীনের মত থাকিব, অহঙ্কারীর মত আপনার বলিবার কিছুই রাখিব না। আমাদের প্রভু আমাদিগকে সর্ব্বদা বাঁচাইবেন, যে অবস্থায় কেন পড়ি না তিনি বাঁচাইবেন। না বুঝিয়া করিলেও মরিব না, তিনি বাঁচাইবেন। যতদিন স্বাধীনতা থাকিবে, ততদিন দুঃখ পাইব। যতদিন স্বাধীনতা বিক্রয় না করিব, ততদিন সুখ নাই, পরিত্রাণ নাই। অতএব হে ব্রাহ্ম! অধীন হও, অধীন হইলে চিরদিনের জন্য সুখী হইবে, পরিত্রাণ লাভ করিবে।

অধীনতা-ব্রত।

রবিবার, ১৪ই আষাঢ়, ১৭৯৭ শক; ২৭শে জুন, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

আমরা এই মাত্র শুনিলাম, "যাহা কিছু পরবশ সকলই দুঃখের কারণ, যাহা কিছু আত্মবশ সকলই সুখের কারণ।" জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় এ কথা সত্য, সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

পরের অধীনতা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় কি আছে? যদি সকল বিষয়ে অন্যের উপরে নির্ভর করিতে হয়, সুখ কিরূপে হইবে? যে পরিমাণে আত্মবশ, যে পরিমাণে স্বাধীন, নিজ অভীষ্ট সাধনে সক্ষম, সেই পরিমাণে সুখী, সেই পরিমাণে আত্মদুঃখ বিমোচনে সমর্থ। এ কথার প্রতিবাদ কেহ করিতে পারেন না। ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিয়া উন্নত সোপানে আরোহণ করিলে, এ কথা অসার বুঝিতে পারা যায়। "যাহা কিছু আত্মবশ সকলই দুঃখের কারণ, যাহা কিছু পরবশ সকলই সুখের কারণ," উন্নত অবস্থায় এই কথা সঙ্গত হয়। আত্মবশে দুঃখী, পরের অধীনতায় সুখী, পৃথিবীর বর্ত্তমান বিশৃঙ্খল অবস্থাতে ইহা অসম্ভব। ঈশ্বরের প্রেমে, জগতের প্রেমে নিমগ্ন হইলে তবে সম্ভব। সেই নিমগ্ন অবস্থা না হইলে এ সত্য বুঝাইয়া দিতে পারা যায় না।

যখন ঈশ্বরের প্রতি প্রেমে, এবং মনুষ্যের প্রতি প্রেমে মনুষ্য ইচ্ছা-প্রবিষ্ট হইয়া আত্মস্বভাব বিলীন করিয়া ফেলে, তখন আত্মা অধীনতার উন্নত সুখ উপভোগ করে। আত্মবশে স্বাধীনতার ব্রত পালন করিতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের দুঃখ সহ্য করিতে হয়। আত্মা অধীন হইতে চাহিলে, ঈশ্বরের সহায়তায়, ধর্ম্মের সহায়তায় পরের অধীন হইতে পারে। সে অধীনতা সুখের কারণ। ইহাতে প্রেম ভক্তি শান্তি নিত্য লাভ হয়। ঈশ্বরের অধীন, জীবের অধীন হইলে সুখের অন্ত থাকে না। সেই সাধু আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হন, যাঁহার আত্মা ঈশ্বরের পদতলে, ভ্রাতা ভগ্নীগণের পদতলে সংস্থাপিত হয়। সে সময়ে জগতের মঙ্গল, আপনার মঙ্গল এক হইয়া যায়, ভিখারীর

বেশে বিশুদ্ধ সুখ লাভ করিতে থাকে। ইতিহাস পাঠ কর দেখিতে পাইবে, প্রভুত্ব চেষ্টা যে পরিমাণে, কলহ বিবাদ বিসম্বাদ সেই পরিমাণে। যতদিন এ প্রকার চেষ্টা থাকিবে, কলহ বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়া যাইবে না; বিষয় কর্ম্ম যত বাড়িবে সকল বিষয়ে উহা আরও বৃদ্ধি হইবে। প্রত্যেকের মন দাসত্ব-ব্রত গ্রহণ করিয়া অন্যকে প্রভু জানিয়া তাহার সেবায় আকৃষ্ট না হইলে কিছু হইবে না। তখন আপনার বলিয়া ভাবিবার কিছু থাকিবে না। প্রভুত্বের চেষ্টা আপনার দিক রক্ষা করে। দাসত্বের চেষ্টা পরের মঙ্গল চায়। দাসত্বাবস্থায় আত্মবিস্মৃতি জন্মে। আমি বড় হইব, প্রভুত্ব সংস্থাপন করিব সকলকে পদতলে আনিব, এরূপ মনে থাকিলে পৃথিবীর কার্য্য কর, ধর্ম্মরাজ্যে সুখী হইতে পারিবে না। এরূপ লোক আপনার হস্তে আপনি পরিত্রাণের ভার গ্রহণ করে। জগতে ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া সে আপনার বুদ্ধিকে নিয়োগ করে। ধর্ম্মের গভীর তত্ত্ব বুদ্ধির আলোকে বুঝিতে যায়, সহজে বুঝিতে পারে না, বুদ্ধি পরাস্ত হইয়া পড়ে। অন্যকে স্বীয় মতাবলম্বী করিয়া মিল করিতে যায় কিছুতেই হয় না, কিছুতেই প্রণয় হয় না। বুদ্ধিকে নেতা করিলে বিচারপতি করিলে, তাহার আদেশে চলিলে কখনও মিল হইবে না, ঐক্য হইবে না। স্বাধীন বুদ্ধি প্রত্যেককে আপনার দিকে টানিবে। আপনার দিকে আনিতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িবে। অতি উন্নত উপায় বাহির করিয়া বুদ্ধি অনুসারে চল, বিচার বিবেচনা কর, দুই জনের মধ্যেও মিল হইবে না। দেখিতে পাইবে, দুইজন সাধু ব্যক্তির মধ্যে যথার্থ প্রণয় না হইয়া প্রণয়স্থলে ভয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। একজন আর একজনের বিপরীত দিকে গমন করিতেছেন, পরস্পর

পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন না। স্বাধীন বুদ্ধিতে অপরকে আকর্ষণ করিতে গিয়া, সমুদয় ধর্ম্মানুষ্ঠানে, সমুদয় বিষয়ে বিবাদ কলহ আন্দোলন বৃদ্ধি পায়। অপ্রণয়ের সহস্র সহস্র দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া জনসমাজকে ভয়ানক কষ্টে দগ্ধ করে।

অধীনতা-ব্রত স্বতন্ত্র। ইহাতে পাঁচ কোটী পাঁচ সহস্র লোক এক হইয়া যায়। পরস্পরের কল্যাণ অধীনতার নেতা, বুদ্ধি নহে। বুঝিতে পারিতেছি না তথাপি অধীন হইব। ইহাতে আমার মৃত্যু হইতে পারে, তথাপি অধীন হইব। পদে পদে বিপদ হয় হউক, অনৈক্যের সম্ভাবনা অল্প। ইহাতে মিলন বন্ধন প্রগাঢ় হইয়া উঠে, পরসেবায় আনন্দ লাভ হয়। স্বীয় বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া আত্ম-ইচ্ছা পরের ইচ্ছার সঙ্গে মিলিত হয়। পরের অধীন হইয়া, সমস্ত জগতের অধীন হইয়া বিনীত হইবে, তখন এই তাহার চেষ্টা। তখন এই অবস্থায় নিজের ইচ্ছা, অন্যের ইচ্ছা, ঈশ্বরের ইচ্ছা এ তিনের যোগ হয়। স্বাধীন বুদ্ধিতে যেন বুঝিতে না হয়, তখন এইরূপ ইচ্ছা হইয়া থাকে, এ সময়ে বিপদ আসিলেও মঙ্গল হয়। বুদ্ধিতে বহু বিচার দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে চেষ্টা করিতে হয়, ইহাতে তাহা হয় না। অধীনতার মধ্য দিয়া স্বর্গের আলোক প্রকাশ পায়। পুস্তক দশ বৎসর পাঠ করিলেও কিছু জানা হয় না, পুস্তক না পাঠ করিয়া ঈশ্বরের মুখের দিকে তাকাইলে বহু পাঠের ফল অনায়াসে লভ্য হয়। সকল সত্য আপনি সহজে অবগত হওয়া যায়। দীনতা স্বীকার না করিলে সত্য বুঝা কষ্টকর। স্বাধীন ইচ্ছাতে না পারে জগৎকে আপনার দিকে টানিতে, না পারে আপনাকে জগতের দিকে টানিতে। ইহাতে আপনার মঙ্গলও হয় না, জগদ্বাসী নর

নারীগণেরও মঙ্গল হয় না। প্রেমের স্রোত সহজে জগৎকে আপনার দিকে, আপনাকে জগতের দিকে টানিতে পারে। ইহাতে আপনার কল্যাণ পরের কল্যাণ সাধিত হয়। স্বাধীন বুদ্ধি সামান্য বিপদে বিপরীত ভাব ধারণ করে। নূতন সত্য গ্রহণ করে; বারবার উহা পরিবর্ত্তন করে, কোনও স্থানে স্থিরভাবে থাকে না। কি করিলে সব ঐক্য হয় কিছুই স্থির হইয়া উঠে না। পরের ইষ্ট সাধন জন্য সমুদয় ভার ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ কর, প্রেমে আপনার ও সমুদয় জগতের কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হইবে। সমুদয় কর্ত্তব্য অভ্রান্তভাবে সাধিত হইবে। প্রেমের স্রোতে আপনাকে ছাড়িয়া দাও, নিশ্চয়ই সত্য ও মঙ্গল লাভ হইবে অজ্ঞান বুদ্ধি ইহা বুঝিল না, দীনভাব অবলম্বন কর, অন্ধকারের মধ্যে আলোক দেখিতে পাইবে।

ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ, জগতের সঙ্গে যোগ প্রেমভাবে। অন্যভাবে জগতের সঙ্গে মিল হইবে না, যে সাধক এই প্রেমভাবে বাস করেন, তাঁহারই সঙ্গে জগতের মিলন হইবে। বুদ্ধিসহকারে যত্ন করিলে দশ বৎসরে, দশ সহস্র বৎসরে মিল হইবে, স্বীয় বুদ্ধিবলে বিচার তর্ক দ্বারা ধর্ম্ম মত স্থির করিয়া শত বৎসরের চেষ্টায় একতা হইবে, এ আশা দুরাশা বলিয়া পরিত্যাগ কর। পরসেবায় নিযুক্ত হইয়া পরের অধীন না হইলে নিজে সুখী হইতে পারিবে না, প্রেম পরিবারও সংস্থাপিত হইবে না। বুদ্ধিকে নেতা করিলে সদ্ভাবের স্থলে নূতন অসদ্ভাব উপস্থিত হইবে। পরের দাস হইয়া পরের সেবা কর, সকলকে প্রাণযোগে নিজ হৃদয়ের সঙ্গে এক যোগে বদ্ধ কর, তাহাদিগের দুঃখে দুঃখী, তাহাদিগের সুখে সুখী, তাহাদের মঙ্গলে মঙ্গল এই ভাবে সকলের চরণতলে পড়িয়া থাক। এরূপে পড়িয়া

থাকিলে সকলের প্রাণ একত্রিত হইবেই। প্রেম-ব্রত গ্রহণ করিয়া স্বাধীন ইচ্ছা স্বাধীন বুদ্ধি পরিহার কর, এক মিনিটের মধ্যে অন্ততঃ তোমাদের পাঁচ জনের মধ্যেও মিল হইবে, সকল প্রকারের কলহ, বিবাদ, অসদ্ভাব, অপ্রণয় তিরোহিত হইবে। এক কথায় দশ জনের, সহস্র জনের মনে এই ভাব উদিত হইবে; সকলের মন ঈশ্বরের দিকে উন্মুখী হইবে আর মতের সঙ্গে মিলিবে না, এ আশঙ্কা থাকিবে না। ঈশ্বরের অমৃতময় বাণী তাঁহার আদেশ হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে, বুদ্ধির স্থলে প্রেম অধিকার পাইয়াছে, আমরা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের হইয়াছি, নিজের বুদ্ধির অনুসরণ করি না, কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুসরণ করি, আর মতের অমিল থাকিবে কেন? এ প্রকার ভাব হইলে সমুদয় সংশয় মীমাংসা হইয়া যায়। অধীনতার সুখে সমুদয় জীবন প্লাবিত হয়।

নর নারী দাস দাসীর ব্রত গ্রহণ করুন দেখিতে পাইবেন অধীনতার সুখ আছে কি না? এরূপ ব্রত গ্রহণ করিলে আর ভাবিবার কিছুই থাকিল না। বুদ্ধির আলোক সর্ব্বদা পাওয়া যায় না, পাইলেও মতের বিকার উপস্থিত হয়। বুদ্ধি চিত্তকে চঞ্চল করিয়া ফেলে। কুটিল বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সকলের অধীনতা, ঈশ্বরের অধীনতা, জগতের অধীনতা স্বীকার কর, সকলই বুঝিতে সক্ষম হইবে। প্রেমে অধীন হইলে সমুদয় জগৎকে আপনার দিকে টানিতে পারিবে। পৃথিবীর কল্যাণে আমার কল্যাণ, আমার কল্যাণে পৃথিবীর কল্যাণ, এইরূপ যাহার হইয়াছে সেই প্রাণ মন সমুদয় জগৎকে দিয়াছে। এরূপ একজন মানুষ হইতে পাঁচ জন হইবে, পাঁচ জন হইতে সহস্র জন হইবে। সকলের কথা এক

হইবে, সকলের মন্ত্র এক মন্ত্র হইবে। অধীনতার সুখই সমুদয় পৃথিবীর সুখ হইবে, অধীনতার সুখই সমুদয় পরিবারের সুখ হইবে। প্রেমের উদয় হইয়া কলহ বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়া যাইবে, শান্তি ও সুখের অবস্থা উপস্থিত হইবে। বুদ্ধির অধীন হইলে কেবলই কষ্ট। কেবল দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ বিপাকে সঙ্কটে পড়িতে হইবে, নিজ নিজ স্বতন্ত্র বুদ্ধিতে বিনাশ উপস্থিত হইবে, জগৎ কখনও এক হইতে পারিবে না। সেবক হইলে সুখের উদয় হয়, নিজের ধর্ম্ম জগতের সুখের ধর্ম্ম হইয়া উঠে। ঈশ্বরের নামরস আস্বাদন করিয়া আমাদের জিহ্বা ভক্ত হউক, রসনা সর্ব্বদা তাঁহারই নাম গ্রহণ করুক, জগতের অধীন সেবক হইয়া সকলকে সেবা করা আমাদের বিশুদ্ধ ধর্ম্ম হউক, আর ভাবিবার কিছু থাকিবে না, আর বুদ্ধির প্রয়োজন থাকিবে না। জ্ঞানের প্রয়োজন হইলে ঈশ্বর জ্ঞান দিবেন, হৃদয়কে প্রেমিক করিয়া লইবেন। হৃদয়ে সর্ব্বদা কেবল আনন্দের আবির্ভাব থাকিবে।

যদি স্বাধীনতার অহঙ্কার আশ্রয় করিতে চাও তবে "যাহা কিছু পরবশ সকলই দুঃখের কারণ, যাহা কিছু আত্মবশ সকলই সুখের কারণ।" এই নীতি গ্রহণ করিয়া পৃথিবীর ধর্ম্ম সাধন কর। আত্মবশ হইতে গিয়া স্বাধীনতা অহঙ্কার বৃদ্ধি হইবে, সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদায় হইবে, ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা আসিবে, সহস্র বৎসর চলিয়া যাইবে, তথাপি দু জনের মধ্যে সম্পূর্ণ একতা হইবে না। স্বাধীনতা প্রণয়ের স্থলে বিবাদ, যোগের স্থলে বিয়োগ আনিয়া উপস্থিত করিবে। অধীনতার ধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে, অধীন অনুগত দাস না হইলে, মনুষ্যের মনে প্রেম সঞ্চয় হয় না। "আত্মবশ দুঃখের

কারণ, পরবশ সুখের কারণ।" এই নীতি অবলম্বন করিয়া অধীন হইয়া সেবা কর, আপনার দুঃখভার অন্তে বহন করিবে, সকল বিষয় নির্ভয় হইবে। অন্যকে প্রভু করিয়া নিজে দাস হইলে সাম্প্রদায়িক বিবাদ বিসম্বাদ অনৈক্য হইবে না। এখানে কেবলই প্রেম বিরাজ করিবে। প্রত্যেকে প্রভু, ইহা যে রাজ্যে মূল মন্ত্র, সেখানে ভিন্ন সম্প্রদায় ভিন্ন ভাব, ভিন্ন মত না হইয়া যায় না। এক লোকে এক রাজ্য হয় ভিন্ন ভাব ভিন্ন প্রবৃত্তি ভিন্ন ধর্ম্মে এক রাজ্য হইতে পারে না। প্রকৃত ধর্ম্মরাজ্যে একজনও স্বাধীন নহে। পরের দাস হইয়া জীবন ধারণ করিলে সুখ লাভ হইবে, এবং যে প্রেমরাজ্যের কথা আমরা শুনিয়াছি, তাহা সংস্থাপিত হইবে। যদি পাঁচজনও এখন স্বাধীনতাকে শত্রু দুরন্ত রাক্ষস বলিয়া বিদায় দেন, অহঙ্কার এবং স্বতন্ত্র সত্তাকে বিনাশ করেন, তখনই তাঁহাদিগের মধ্যে প্রেমরাজ্য অবতীর্ণ হয়; স্বাধীনতা অহঙ্কারকে পোষণ করিয়া সহস্র বৎসর চেষ্টা করিলেও কিছু হইবে না। অধীন হইয়া প্রাণেশ্বরের নাম গান কর, শান্তিধামে যাইবে, স্বর্গরাজ্যে উত্তীর্ণ হইয়া কৃতার্থ হইবে।

বিধাতার অর্চ্চনা। *

রবিবার, ২১শে আষাঢ়, ১৭৯৭ শক; ৪ঠা জুলাই, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

কেহ মনে করিতে পারেন, যে নাম লইয়া পূজা করা যাউক, সমান ফল হয়। ঈশ্বরের যে নাম কীর্ত্তন করা যাউক উন্নতি সমান, ফল সমান, এ কথা যথার্থ নয়, এক এক নাম এক এক গুণবাচক। সেই সেই নাম সেই সেই গুণসম্বন্ধে বিশেষ উন্নতির উপায়। ভিন্ন ভিন্ন

নামের ভিন্ন ভিন্ন মহিমা, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উহার সাধন। জগদীশ্বরের পূজা, বিধাতার পূজা এক হইতে পারে না, পূজার প্রভেদ আছে। জগদীশ্বর নাম সাধন এক প্রকার, বিধাতা নাম সাধন আর এক প্রকার, আমার ঈশ্বর মনে করিয়া অল্প লোকে বিধাতার পূজা করিয়া থাকে। ঈশ্বরের কৃপায় সমুদয় হইতেছে, অল্প লোকে মনে করে। তাহাদের সংখ্যা অল্প, যাহাদের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিবাণ ঈশ্বরের দয়াময় বিধানে মঙ্গল হয় ইহা বিদ্ধ করিয়াছে। বর্ত্তমান ঘটনা সকলের প্রাণ বিধাতা-পুরুষ ইহা সকলে দেখিতে পায় না। সকলের চক্ষু সমান নহে, কাহার চক্ষু অল্প কাহার চক্ষু বেশী দূর যায়। দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা সাধন দ্বারা প্রবল হয়। ভাল সাধক জগদীশ্বরের পূজা, সৃষ্টিকর্ত্তার পূজা অতিক্রম করিয়া, চক্ষের সম্মুখে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, তাহার মধ্যে ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া ইতিহাসের ঈশ্বর পূজা করেন। ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা বলিয়া পূজা করিলে কথনও এরূপ উপলব্ধি হইতে পারে না। বিধাতা সাক্ষাৎ পুরুষ হইয়া আপনার প্রবল ইচ্ছা, করুণা, জ্ঞান সহকারে নানা লীলা দেখাইতেছেন; সাধক তাহা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন। ঈশ্বরের কার্য্য স্বচক্ষে দর্শন করিলে, কৃতার্থ হইলে, এই অবস্থায় অবস্থিতি কর, জগদীশ্বরের পূজা পরিত্যাগ করিয়া বিধাতা পূজার সাধন অবলম্বন কর, ইহাতে বিশেষ আনন্দ লাভ করিবে।

অনন্ত কাল অনন্ত দেশ অসীম আকাশব্যাপ্ত জগদীশ্বরকে ধ্যান চিন্তা দ্বারা উপলব্ধি করিলে বিধাতারূপে তিনি স্বভাবতঃ নিকটবর্ত্তী হইলেন। এ সময়ে অনন্ত কালের স্থলে বর্ত্তমান, অসীম আকাশের স্থলে নিজের দেশ আসিল। অসীম কাল, সময়ে, অসীম দেশ

স্বদেশে পরিণত হইয়া, একদিকে দৃষ্টি সঙ্কুচিত হইল বটে, কিন্তু প্রেম বর্দ্ধিত হইল। দূর হইতে বন্ধুকে নিকটে আনিলে যেমন আনন্দ হয়, নদীর জল নিজ উদ্যানে প্রবাহিত হইলে যেমন আহ্লাদ হয়, আত্মারূপ নিজ গৃহে সেই পরম দেবতাকে অর্চ্চনা করিলে ভক্তের সেইরূপ আনন্দ হয়। অসীম আকাশ, অসীম স্থান ঘরে আনিয়া অসীম রাজ্যের অসীম কালের রাজাকে দর্শন করিলাম; তাঁহার বিশেষ করুণা উপলব্ধি করিয়া বিধাতা পূজায় নিমগ্ন হইলাম। সমুদয় ঘটনার মধ্যে সেই বিধাতা-পুরুষকে দেখিতে পাইলাম, উহার একটাও আমাদের কল্পনা নহে, উহার মধ্যে ঈশ্বরের হস্ত, ঈশ্বরের কার্য্য। উহা নিকটে সর্ব্বদা রাখিলাম, যতই পড়িতেছি অভ্রান্ত বেদ পাঠ হইতেছে, এক একটী ঘটনা উহার এক একটী অক্ষর। উহাতে ঈশ্বরকে পাঠ করিতেছি, অধ্যয়ন করিতেছি। এরূপ নিকট সম্বন্ধ সংস্থাপন ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ সৌভাগ্য। আমরা বিধাতার বিশেষ বিধান লাভ করিয়াছি। ঈশ্বর এক্ষণে আমাদিগের গৃহের নিকটে, স্বদেশ ছাড়িয়া অরণ্যে কেন ভ্রমণ করিব? সকল ব্রাহ্মের নিকটে এখন বিধাতার পূজা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বিধাতাকে অবহেলা করিয়া তাঁহারা জগদীশ্বরের পূজা কেন করিবেন? ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে, ব্রহ্মমন্দির মধ্যে, পারিবারিক ঘটনা সকলের মধ্যে, ঈশ্বরের জীবন্ত প্রীতি নিত্য দেখিতে পাইতেছি, এত নিকটে তিনি, তাঁহাকে ছাড়িয়া কেন দূরে গমন করিব? চন্দ্র যদি দূর হইতে নিকটস্থ হন, তবে নিকটস্থ চন্দ্র পরিত্যাগ করিয়া কে দূরস্থ চন্দ্রের জন্য লালায়িত হইবে? বিধাতাকে ছাড়িয়া জগদীশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তার অর্চ্চনা, বিশেষ ছাড়িয়া সাধারণের উপাসনা, ঘর ছাড়িয়া স্বদেশ

ছাড়িয়া দূরে পরিভ্রমণ। ঈশ্বর নিকটে অমৃতপাত্র লইয়া আসিলেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া কেন অন্যত্র যাইব, তাঁহার দ্বারস্থ না হইয়া দূর দেশে কেন পর্য্যটন করিব ?

গৃহের মধ্যে চারিদিকের ঘটনার মধ্যে ঈশ্বর বিরাজ করিতেছেন। উহাই ব্রাহ্মসমাজের অভ্রান্ত পুস্তক, উহার মধ্যে মনুষ্যের ভ্রম ভ্রান্তি নাই। সর্ব্বদা সেই ব্রাহ্মসমাজের অভ্রান্ত পুস্তক পাঠ করিব, সেই সকল ঘটনা কেন ঘটিয়াছিল বুঝিব এবং বিশ্বাস চক্ষে সে সমুদয়ের মধ্যে জীবিতেশ্বর কার্য্য করিতেছেন দেখিব। সমস্ত ঘটনাতে তাঁহারই মঙ্গলকীর্ত্তি প্রকাশ হইতেছে। মান অপমান, নিন্দা প্রশংসা, লজ্জা গৌরব, সুখ দুঃখ, সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য যে কোন ঘটনা কেন হউক না, বিশ্বাসীর নয়নে সেই সমস্ত ঘটনার প্রত্যেকটী এক একটী বিধি। বিধাতা সেই সকলের মূলীভূত কারণ হইয়া নিয়ত অমৃত স্রোত প্রবাহিত করিতেছেন, উহাতে বিশ্বাসীদিগের বিশ্বাস জাগ্রত হয় এবং প্রতিদিন উহা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই শতাব্দীতে আমাদিগের জন্ম হইয়াছে ইহা আমাদিগের পরম সৌভাগ্য। এ সময়ে পুস্তকে ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করিতে হয় না, তাঁহার অন্বেষণে অরণ্যে গমন করিতে হয় না। চক্ষু খুলিয়া ব্রাহ্ম নিজের জীবন পাঠ করিলে, আর অন্য পুস্তক পাঠ করার প্রয়োজন থাকে না।

বিধাতাকে নিকটে রাখিয়া ব্রাহ্মসমাজের বিধান। ইহাতে বিশেষ বিশেষ উপদেষ্টা, বিশেষ বিশেষ আচার্য্য, বিশেষ বিশেষ গুরুকে স্তব স্তুতি করিতে হয়, এরূপ বিশ্বাস করিতে হয় না। সমুদয় ব্রাহ্মসমাজের বিশ্বাস এই যে, তিনি তাঁহার বিধান প্রত্যেক হৃদয়ের ভিতরে প্রতিভাত করিয়া দিতেছেন। সাধনাদি সকলই বিধানমূলক

সত্য। সাধু বিশ্বাসীর হৃদয়ে তিনি ঐ সকল প্রস্ফুটিত করিয়া দেন। বর্ষে বর্ষে বিধানের নূতন নূতন ভাব সকলের হৃদয়ে আবির্ভূত হইতেছে। এক সময়ে এক বৎসর এক ভাব, পর বৎসর আবার নূতন আর এক ভাব। পূর্ব্ব বৎসরে যাহা, বর্ত্তমান বৎসরে তাহা নহে। পূর্ব্ব বৎসরে ঈশ্বর যাহা বলিয়া দিয়াছেন, পর বৎসর আবার তদ্ব্যতীত আরও নূতন বলিবেন। তিনি চল্লিশ বৎসর একই ভাবে বিধান পূর্ণ করিয়া আসিয়াছেন, একচল্লিশ বৎসরে নূতন ভাব ও বিধি প্রবর্ত্তিত করিলেন এরূপ কখনও হয় না। এক বৎসরে বিধি সংসাধিত হইল না, বৎসরের শেষে দেখিবে আর সে ভাব সে বিধি নাই, নূতন ভাব ও বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এক মাস এমন কি একদিনের জন্যও বিধাতা পূজার সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলে চলে না। কারণ ইহাতে নানা বর্ণের ভাব প্রতিক্ষণে উদিত হইতেছে। আমাদের ঈশ্বর বর্ত্তমান সময়ে, সুতরাং সর্ব্বদা বর্ত্তমান সময়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যে দিন ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন হইয়াছে, সেই দিনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিধাতার উপাসনা করিব তাহা নহে। তিনি অদ্যকার বিধাতা, বর্ত্তমান ঘটনা আমার গুরু। কাল যিনি গুরু ছিলেন, আজ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। নূতন গুরু, নূতন বিধি, নূতন শাস্ত্রের আজ প্রয়োজন। সুতরাং দিন দিন নূতন গুরু, নূতন বিধি, নূতন শাস্ত্র লাভ করিতেছি। সমস্ত বিধানের ভাব নূতন হইতেছে। আজ যে সাধুভাব প্রস্ফুটিত হইল, বর্ষে বর্ষে উহা নবীন ভাব ধারণ করিবে, নূতন নূতন পুষ্প প্রস্ফুটিত হইবে; এক মাসে এক ফুল, অন্য মাসে অন্য ফুল, এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ফুলে বিভূষিত করিবে। বিধানের বৎসর সকল যেমন চলিয়া

যায়, তেমনই ভক্তি, বৈরাগ্য, জ্ঞানের ভাব প্রস্ফুটিত হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে গুরুর পরিবর্ত্তন পুস্তকের পরিবর্ত্তন হইয়া নূতন গুরু নূতন পুস্তকের নিয়োগ হয়। যে মন্ত্রে পূর্ব্বে দীক্ষিত হইয়াছিলাম আজ উহা পুরাতন হইয়া গেল, আবার নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হইলাম। পুরাতন পত্তনভূমি রহিয়া গেল বটে, কিন্তু তদুপরি ঘর ক্রমে উচ্চ হইতেছে। মূলে যে সকল ভাব ছিল তদুপরি নব নব ভাব-পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া আরও আত্মার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিল।

বিধাতা সাধনে আশ্চর্য্য এই যে, নিত্য নূতন ব্যাপার, নূতন বল, নূতন ভাব, নূতন উৎসাহ। কল্য যাহা ছিল, আজ তাহা অপেক্ষা নূতন বিধি। ঈশ্বর দিন দিন নূতন বিধি প্রচার করিতেছেন। বিধাতার উপরে যদি ভয় ও বিশ্বাস স্থাপন করা যায়, তবে সর্ব্বদা আকুল থাকিতে হয়, হৃদয়-কপাট সর্ব্বদা খুলিয়া রাখিতে হয়। কি জানি কোন্ সময়ে নূতন বিধি প্রচারিত হইবে তাহা কে জানে? ইহাতে নিদ্রিত থাকিতে পারা যায় না, সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিতে হয়। বিধির একটী কথা জানিতে না পাইলে মরণ পর্য্যন্ত ঠিক সেটী আর পাওয়া যাইবে না। কেন না পর সময়ে বিধি পুনরায় নূতন হইবে, পূর্ব্ব বিধি আর তখন নাই। সে সময়ে যে মন্ত্রে দীক্ষিত হইলে, যে শাস্ত্র পাঠ করিলে, সেই মন্ত্র সেই শাস্ত্র পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা। একদিন নিদ্রিত রহিলে, ঈশ্বর তোমার দ্বারে আঘাত করিলেন শুনিলে না; আজ তাঁহার আজ্ঞা পালন করা হইল না। পরদিন জাগ্রত হইলে, তাঁহার কথা শুনিলে, তাঁহার আজ্ঞা কার্য্যকর হইল। আবার এক মাস অচেতন রহিলে, গভীর গভীর সত্য তোমার নিকটে প্রচ্ছন্ন রহিয়া গেল। সেই এক মাস

কাল লঙ্ঘন করাতে বিধি তোমার সম্বন্ধে পূর্ণ হইল না। ব্রাহ্মসমাজে কোন্ সময়ে কি প্রকার বায়ু প্রবাহিত হইবে, কোন্ সময়ে কোন্ আজ্ঞা প্রচারিত হইবে, কোন্ সময়ে নূতন নূতন ভাব আসিবে, বিশ্বাসী তজ্জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবেন। কেন না তাঁহার সম্বন্ধে উহা অভ্রান্ত শাস্ত্র! এই শাস্ত্রের এক অংশ পাঠ করিলে হইবে না। হিন্দুগণকে বেদের সমুদয় কথায় বিশ্বাস করিতে হইবে, একটী কথায় অবিশ্বাস করিলে চলিবে না। হিন্দু মতে বেদের কি কখনও পরিবর্ত্তন হইতে পারে? খৃষ্টানগণের বাইবেল মুসলমানগণের কোরাণ সেই সেই ধর্ম্মাবলম্বিগণের নিকট অভ্রান্ত, কোন কোন অংশ অভ্রান্ত, কোন কোন অংশ ভ্রান্ত, এ কথা তাঁহারা বলিতে পারেন না। হয় তাঁহারা সমুদয় গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন, নয় একেবারে সমুদয় অগ্রাহ্য করিবেন। পরিত্রাণাকাঙ্ক্ষিগণের সম্বন্ধে এই কথায় বিশ্বাসের একই রীতি। সকলেই অভ্রান্ত শাস্ত্রে বিশ্বাস করেন।

বিধান মধ্যে যতগুলি অনুজ্ঞা আসিবে, যতগুলি ঘটনা ঘটিবে, যতগুলি ব্যাপার হইবে, সে সমুদয়গুলি আমি মানি, মানিতে হইলে সমুদয় মানি। অমুক শতাব্দীতে যাহা হইল তাই মানি, পর বা পূর্ব্ব শতাব্দীতে যাহা হইয়াছে মানি না, ব্রাহ্ম এ কথা বলিতে পারেন না। আমি ভক্তি মানি জ্ঞান মানি না, প্রাচীনকালে ব্রাহ্মসমাজে যাহা হইয়াছে, তাহা মানি না, এখন যাহা হইতেছে কেবল তাহাই মানি, এরূপ অংশমাত্র গ্রহণ করিলে চলিবে না। অভ্রান্ত পূর্ণ গ্রন্থ গ্রহণ করিতে হইলে সমুদয় মানিতে হইবে। অবিশ্বাসী হইয়া বুদ্ধিবলে জানিতে গিয়া বিধান বুঝিবে না। অমুক অমুক সময়ে অমুক স্থানে এইরূপ ঘটিয়াছিল এ প্রকার ভাবিয়া চেষ্টা করিয়া বুঝিতে পারিবে

না, ইহার দ্বারা মীমাংসা করিতে পারিবে না। এক শত বর্ষ অতীত হইলে এখনকার ঘটনা বুঝিতে পারিবে এখন বুঝিতে পারিবে না। বুঝিতে পার আর না পার সমুদয় মানিতে হইবে, ঈশ্বরের ব্যাপার বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। বিনয় গ্রহণ করিব, সদনুষ্ঠান গ্রহণ করিব না, সদনুষ্ঠান গ্রহণ করিব বিনয় গ্রহণ করিব না, বৈরাগ্য গ্রহণ করিব সংসার পরিত্যাগ করিব ভক্তিস্রোতে ভাসিব, ভক্তির ভিতরে ডুবিব, তখন বৈরাগ্যে প্রয়োজন কি? বৈরাগ্যের পূর্ণ ভাব গ্রহণ করা নিষ্ফল, এ সমুদয় ঈশ্বরের নয়; ইহার একটী ঈশ্বরের কার্য্য, একটী মনুষ্যের কার্য্য, ইহা বলিলে বিধান মানা হইল না। যখন যে প্রকার অভাব হইতেছে, প্রয়োজন হইতেছে, ঈশ্বর তদনুরূপ সত্যেতে ভাবেতে বিধান পূর্ণ করিতেছেন; যখন যাহা চাই, তাহাই দিতেছেন। আহার চাই, খাদ্যদ্রব্য দিতেছেন, তৃষ্ণার জল দিতেছেন, পাপের জন্য কাঁদিলাম শাস্তি দিতেছেন, প্রীতি ভক্তি দিতেছেন। দিন দিন পরিত্রাণের দিকে অগ্রসর করিতেছেন বুঝিতে পারিতেছি। তাঁহার কৃপায় ভাবোদ্গম হইতেছে, সংসারাসক্তি দূর হইতেছে, জ্ঞানের আলোকে হৃদয়ের অন্ধকার বিনষ্ট হইতেছে, পরলোকে বিশ্বাস দৃঢ় হইতেছে, পাপযন্ত্রণা দূর হইতেছে, ইন্দ্রিয়সংযম হইয়া মন দমন হইতেছে, প্রত্যেক অভাব দূর হইতেছে, হৃদয়ে বন্ধু ভাব সামাজিক ভাব বর্দ্ধিত হইতেছে। আমার তোমার সমুদয় অভাব জানিয়া বিধান করিতেছেন। আজ বিধান করিলেন, তার পরদিন বিধান করিলেন, ক্রমে বিধানের স্রোত চলিতেছে। প্রতিদিনের বিধানে প্রাণ জুড়াইতেছে। ইহার একটীও পরিত্যাগ করিতে পারি না। পূর্ণ বিধান অভ্রান্ত গ্রন্থ। যখন যে ভাব আসিতেছে,

বিধাতা হইতে আসিতেছে, যদি ঐ ভাব কোন প্রবঞ্চকের হয় পদাঘাত করিয়া বিদায় করিয়া দাও। বস্তুতঃ বিধান হইতে যাহা আসিতেছে, তাহার একটীও বাদ দিতে পার না। বুঝিতে পারিতেছ না, মস্তক পাতিয়া লও; তিনি বুঝাইয়া দিবেন। যদি বিধানের অনুগত হইয়া থাক, যথা সময়ে যাহা যাহা প্রয়োজন সকলই প্রাপ্ত হইবে। বিধানে কখন কোন্ দৃশ্য প্রকাশিত হয়, আনন্দের সহিত দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাক। যখন যাহা আইসে, রত্ন বলিয়া গ্রহণ কর। গ্রহণান্তর ভক্তিরূপ মালায় গাঁথিয়া রাখিয়া দাও। যতদিন বাঁচিবে গ্রহণ করিতে থাক, সেই বিধানের বলে স্বর্গে যাইতে পারিবে।

নিগূঢ় উপাসনা।

মাসিক সমাজ, প্রাতঃকাল, রবিবার, ২৮শে আষাঢ়, ১৭৯৭ শক; ১১ই জুলাই, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

কেহ উপাসনা করেন, কাহাকেও ঈশ্বর উপাসনা করান। ধর্ম্মরাজ্যের উপাসনা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ইহা প্রতিপন্ন হইবে, উপাসকগণের মধ্যে কেহ কেহ ঈশ্বরের নিকট বসিয়া উপাসনা করেন, পৃথিবীর বিষয় ব্যাপারকে সে সময়ে নিবৃত্ত করেন, মন প্রাণ আত্মা সমাধান করিয়া আরাধনা স্তবস্তুতি দ্বারা আত্মাকে পবিত্র করেন। আর এক পদ্ধতির উপাসনা বাহিরের পদ্ধতিতে ভিন্ন তাহা নহে, কিন্তু বাস্তবিক উহার পদ্ধতি ভিন্ন। এ পদ্ধতির উপাসকগণ উপাসনা করেন না, উপাসনা করিতে জানেন না, উপাসনা

করিতে চাহেন না। ঈশ্বর তাঁহাদিগকে উপাসনা করান। তাঁহারা চলেন না পরিচালিত হন, তাঁহারা কথা কন না, কথা মুখে আসে, তাঁহারা দেখেন না, পদার্থ আপনি দেখা দেয়, রস পান করেন না, রস আপনি হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়, তাঁহারা আপনারা সন্তরণ করেন না, স্রোতে চলিয়া যান।

তত্ত্বদর্শী বিশ্বাসী ব্যক্তি অচলা ভক্তিসহকারে উপাসনা করেন। উপাসনা করিয়া চলিতে চলিতে চালিত হইবার স্থানে পরে আইসেন। সন্তরণ করিতে করিতে ভারি স্রোতে আসিয়া পড়িয়া স্রোতে চলিয়া যান। এই দুই ভাবের উপাসকবৃন্দকে বিভেদ করা যায়। অন্যে বাহ্যিক লক্ষণ দেখিয়া বুঝিতে পারে না, কিন্তু তাঁহারা আপনারা দুই অবস্থা দেখিয়া থাকেন। এক পক্ষ নিজের জ্ঞান চৈতন্য বুদ্ধিতে বুঝিতে পারেন আমি উপাসনা করিতেছি, আর এক পক্ষ বুঝিতে পারেন উপাসনা দেবতা করান, তিনি তাঁহাকে হাত ধরিয়া চালান। বাহ্যিক লক্ষণে দুইই ভক্ত, দুইজনই এক প্রকারে চলিতেছেন। নিকৃষ্ট উপাসক বিশ্বাস ভক্তি অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন, তেমন বিশ্বাস নাই যে আত্মা ঈশ্বর কর্ত্তৃক চালিত হইবে। ইনিও বিনয়ী ভক্ত এবং প্রেমিক হইতে পারেন। সংসার-অরণ্যে ইনি স্বয়ং ঈশ্বরের হস্ত ধরিয়া চলেন। উচ্চাবস্থায় ভক্তের বাহ্যে এক ভাব হইলেও অন্তরে তাঁহার পূর্ণ নির্ভরের ভাব। তাঁহার হস্ত ঈশ্বরের হস্তে ধৃত হইয়াছে। ঈশ্বর তাঁহাকে ধরিয়া টানিতেছেন তিনি আকৃষ্ট হইয়া চলিতেছেন। অপর শ্রেণীর উপাসক নিজে চলিতে পারেন। তিনি বলেন, "হাত দাও ধরি।" ইনি এই বলিয়া ডাকেন, "হাত ধর, ধরিয়া লইয়া চল।" বাহ্য লক্ষণে এ প্রভেদ কি প্রকারে বুঝা

যাইবে? বাস্তবিক ইহাঁদের হৃদয় ভিন্ন। সময় এমন আছে, যখন আমি উপাসনা করি, আবার উপাসনা আমাকে টানিয়া লইয়া যায়। এ সময়ে ঘড়ী দেখিয়া সময় জানিতে হয় না। সংসার ঘেরিয়া আছে, অথচ কে কোথায় আছে, কি কোথায় আছে কিছু স্থির থাকে না, প্রাণকে টানিয়া লইয়া উপাসনার ভিতরে প্রবিষ্ট করে। অন্তরে দর্শন সহজ অবস্থা হইয়া পড়ে। গভীর উপাসনার মধ্যে আড়ম্বর বিভব কোথায় রহিল? মন কুচিন্তা পরিত্যাগ কর, শুদ্ধ থাক, বিষয়গরল পান করিও না, মনকে এইরূপে বুঝাইয়া উপাসনা করিতে হইত, এবার আর তাহাকে তেমন করিয়া বুঝাইতে হইল না, মন আপনি উপাসনা আরম্ভ করিল, কে যেন তাহাকে উপাসনা করাইল। এইরূপে উপাসনা স্বাভাবিক অবস্থা হইয়া গেল।

উপাসনার প্রথমাবস্থায়, উপাসনার আরম্ভে মনকে ডাকিয়া আনিতে হয়, নানা উপায়ে আকর্ষণ করিতে হয়, মনকে প্রবোধ সান্ত্বনা দিয়া উপাসনায় আনিতে হয়। এ জীবনে ঈশ্বর ব্যতীত আর সুখের উপায় কি আছে, তিনিই আমাদিগের শেষ গতি চরম লক্ষ্য, এইরূপ বিচার করিয়া মনকে টানিতে হয়। আমরা উপাসনা করি, তাঁহার নাম গান করি, সঙ্গীত আরাধনা ধ্যান যত কিছু উপাসনার অঙ্গ সমুদয়ের অনুষ্ঠান করি, সময়ে সময়ে তাঁহার প্রেমরস পানে মত্ত হই। কিন্তু আমরা এই সকল করিয়া উচ্চাবস্থা লাভ করিবার জন্য সঙ্কল্প করি, তাহা নহে। আমরা মনের মধ্যে একটী সীমা করিয়া রাখি, সেই সীমা পর্য্যন্ত গেলেই ফিরিয়া আসি। আমাদের মনে একটী চিহ্ন আছে যেখানে উঠিলে তদপেক্ষা উন্নত অবস্থায় আর আমরা উঠিতে চাই না। এরূপ অবস্থায় আসিতেও

সৌভাগ্য নাই বটে, কিন্তু এতদপেক্ষা অনেক দূর যাইয়া একটী উপাসনার ঘর আছে, গম্যস্থান আছে, সেটী অবশ্য মনোহর স্থান। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মন সরল করিয়া পরমাত্মায় সমর্পণপূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন করিলে তদগত হইয়া মন মুগ্ধ হয়। তদপেক্ষা আর উচ্চ অবস্থা কি হইতে পারে মনে করিয়া ফিরিয়া আইসে। অজ্ঞ লোকে যেমন মনে করে হিমালয় পৃথিবীর শেষ সীমা, উহার পর দিকে আর পৃথিবী নাই, ইহা সেইরূপ হইল। দূর হইতে মনে করিলাম ঐ স্বর্গ, এমন আর দেখি নাই, ইহার পরেও স্বর্গ আছে মনে কল্পনা করিতে পারা যায় না। যেই স্থানে বসিয়া মনে করে শেষ হইয়াছে, এই পৃথিবীর শেষ সীমায় আসিলাম। মানুষের এই প্রকার প্রকৃতি। কতকদূর গিয়া বলে এই শেষ, আর এ অধীন ইহার পর যাইতে চায় না, আর যাইবার আশাও করে না। ভক্ত সেইখান হইতে ফিরিয়া আইলেন, হিমালয়ের উপরে আরও উঠিবেন তাহা হয় না। উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মগণেরও এই অবস্থা, তাই তাঁহারা সুখ পান না। তোমরা উপাসনা কর না আমি বলি না। তোমরাও প্রমুগ্ধ হইয়া থাক, কিন্তু ঈশ্বর তোমাদিগের নিকট হইতে আরও অধিক চান। আর একটু গিয়া দেখিবে হিমালয়ের ওদিকেও স্থান আছে। চারি সমুদ্র পার হইয়া আরও শত শত রাজ্য আছে। উপাসনার আবার কিছু শেষ আছে বিশ্বাসী মনে করেন না। ব্রহ্মভক্ত যত উপাসনা করেন গভীর হইতে উপাসনার গভীরতর স্থানে গিয়া উপস্থিত হন, পরিশেষে এমনই নিমগ্ন হন যে তাহার আর কূল কিনারা পান না। এরূপ উপাসনা শিখিবে, ঈশ্বরের অনেক কৌশল এখন যাহা জানিতে পারিতেছ না, জানিবে; তাঁহার গভীর

জ্ঞানের পরিচয় পাইবে। সহস্র সুচতুর হও সেরূপ উপাসনাশীল না হইলে ঈশ্বরের নিকটে পরাস্ত হইবে। উপাসনা কর, খুব উপাসনা উপভোগ কর গভীর জ্ঞান লাভ করিবে।

ঈশ্বর প্রেমজাল বিস্তার করিয়া বসিয়া আছেন, সেই জালে পড়িলে আপনার উপর কর্ত্তৃত্ব থাকিবে না। তিনি ভুলিতে দিবেন না কোথায় যাইতেছ, কি করিতেছ, কোথায় আনিলেন। এখানেও সেই উপাসনা সেই আরাধনা সেই ধ্যান। পাঁচ ঘণ্টা মন স্থির করিয়া ক্রমে ভাল উপাসনা হইল, এ এক উপায় বটে, কিন্তু উপাসনায় যখন টানিতে থাকিবে, দেখিবে আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনায় দাঁড়াইবার আর সময় নাই। এক অগাধ আবর্ত্তে পড়িয়াছ, উহার উপরেই ভাস আর নিম্নেই ডোব, ক্রমাগত চলিতে থাকিবে। আর হৃদয়ে ধারণ করিতে পার না এবং এ কথাও বলিতে পার না আজ এই পর্য্যন্ত। হে ঈশ্বর, এখানেই ছাড়। সাগরে যদি একবার ডোব, ক্রমাগত নীচে চলিয়া যাইবে দাঁড়াইবার স্থান পাইবে না। ফিরিয়া তাকাও কতদূর যাইবে অন্ত দেখিবে না। আজ এখানেই থাকি কাল এখান হইতে চলিব, আর এ কথা বলিবার উপায় নাই, সেই দুর্জ্জয় ভয়ানক স্রোতে পড়িয়া সাধ্য কি কোন স্থানে দাঁড়াইবে। সাগর মধ্যে পড়িয়া ঘাট কোথায় বলিয়া চীৎকার করিলে, ঈশ্বর উত্তর দিলেন, সন্তান, ঘাট কোথায়, মধ্যসাগরে কিনারার কথা বলিতেছ কেন? চারিদিকে তাকাইয়া দেখিবে কোথাও ঘাট দেখা যায় না। সেই স্থানে চলিয়া যাইতেছি যেখানে ভক্তি প্রেম অসীম, তাহার সীমা করিবার উপায় নাই। সাধক ক্রমে গভীর স্থানে ডুবিতে আরম্ভ করিলেন, যাহে

সেই আরাধনা ধ্যান প্রার্থনা রহিল, সেই ঘর সেই কথা রহিল, সব সমান, ভিতরে কি এক ঘটনা ঘটিল, তাহাতেই প্রভেদ। ঈশ্বরের হাতে উপাসনার ভার রহিলে, সে উপাসনা মিষ্ট হইবেই। ভক্তিসুধা প্রেমসুধা পান করিয়া মন মত্ত হইল, আর কি উঠিবার শক্তি আছে যে চলিবে। যে পর্য্যন্ত কথা বলিবার চক্ষু খুলিবার শক্তি আছে, জ্ঞান চৈতন্য আছে, ব্রহ্মের সুমিষ্ট কথা শুনিবে, তিনি আরও তোমার মুখে সুধা ঢালিয়া দিবেন। ব্রহ্ম কথা কহিবেন, শুনাইবেন, উপাসনা করাইবেন এবং ভজনের দিকে টানিয়া লইয়া যাইবেন। ব্রহ্মরাজ্যে যে তুমি মনে করিবে এত পরিমাণে ভক্তিসুধা পান করিব, তাহা হইবে না। কি করিতেছ কি ফল হইবে বুঝিবার শক্তি নাই। আপনি সুধা পান করিলে, প্রেমে নিমগ্ন হইলে, কিন্তু কে উপাসনা করিল? তুমি স্থির করিয়া বলিতে পার না, আমি এতক্ষণ উপাসনা করিলাম। আমার মুখ হইতে যে সকল কথা বাহির হইল এ সকল কাহার কথা? আমার অভিধানে ত এ সকল কথা ছিল না, আমি ত এ সকল সৃজন করিতে পারি না। এরূপ কথা আমার মুখে কে দিল? পাপশ্রবণে এ সকল কথা কিরূপে শুনিতেছি, পাপমুখে এ সকল কথা কিরূপে বলিতেছি। এ কথামৃত কিরূপেই বা পান করিব? পরীক্ষা করিয়া দেখ এ সকল কথা তোমার কি না? আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিলে এ সকল কথা কি আমার? দুইই সমান পণ্ডিত, কে কাহার জিজ্ঞাসার উত্তর দিবে, দুইই হতবুদ্ধি হইল। আপনা আপনি উপাসনা কর নাই, সে সকল কথা অন্য স্থান হইতে আসিল, প্রাণ তাহা উপভোগ করিল মাত্র।

—

যদি এইরূপ অবস্থা লাভ করিতে আকাঙ্ক্ষা থাকে, অন্যত্র আশা ভরসা ছাড়িতে হইবে। সেই উপাসনাই সমুদয় আশা ভরসার স্থান। যিনি উপাসনার উপরে সমুদয় আশা ভরসা রাখেন তিনি জগৎকেও নিজের দিকে আকর্ষণ করেন। ব্রাহ্মসমাজ যদি পৃথিবীর উপকারী বন্ধু হইতে চান, ঈশ্বরের দিকে জগৎকে টানিয়া লইতে চান, এই পথ অবলম্বন করিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজ উচ্চতর উপাসনা দিবার জন্য দায়ী, ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া যেরূপ উপাসনা করা হইত, এখন আর সেরূপ করা যাইতে পারে না, সে সময় চলিয়া যাইতেছে। এখন মন্দিরের অতীত উপাসনা অবলম্বনীয়। যেখানে গেলে আর কেহ ফেরে না, সেইখানে যদি যাইতে চাও অল্প দিন মধ্যে এ অবস্থা ছাড়িয়া যাইতে হইবে। ক্রমে আরও নিগূঢ় উপাসনা করিতে থাক দেখিবে দিন দিন উপাসনা গভীর হইতে গভীর ভাব ধারণ করিবে। আজ হইতে আর উপাসনা ছাড়িয়া উঠিতে পারি না এইরূপ অধিকার হইয়াছে দেখিলে নিজে সুখী হইবে, জগৎকেও ইহা জানাইতে সক্ষম হইবে।

দ্বিজত্ব—নবশিশু। *

সায়ংকাল, রবিবার, ২৮শে আষাঢ়, ১৭৯৭ শক;
১১ই জুলাই, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

যদি জিজ্ঞাসা করা যায় কত বর্ণ আছে? শ্বেত পীত নীল লোহিত বর্ণ আছে উত্তর দিবে। জড়ে যে কয়েকটী বর্ণ আছে, তাহা আমরা জানি। এ সমুদয়ের অতীত নূতন বর্ণ আছে, উহা

স্বর্গীয়। পৃথিবীর রঙের সঙ্গে উহার তুলনা হয় না। দেখিলেই জানা যায় যে উহা স্বর্গীয়, পার্থিব নহে। এ পৃথিবীর কোথাও সে প্রকার রং নাই। পরমেশ্বরজাত ব্যক্তিতে সে প্রকার বর্ণ আছে। তাঁহার মুখাবলোকনেই জানা যায়, এ পৃথিবীর বর্ণ সেখানে নাই। গৌর বর্ণ বলিয়া সে বর্ণের বর্ণনা করিলে বর্ণনা হইল না। অন্ত যে বর্ণ বলা হইতেছে সেরূপ ভাবে ব্যক্ত করা হইতেছে না। এক স্বর্গীয় বর্ণ আছে উহা সাধকের মুখ সুশোভিত করে, ঈশ্বরের সন্তানের মুখের লাবণ্য সম্পাদন করে। স্বর্গে তাহা প্রস্তুত হয়, পৃথিবীর লোকে তাহা কি প্রকারে আনয়ন করিবে, প্রস্তুত করিবে? যদি সে বর্ণ দেখিতে চাও ঈশ্বরের মন্দিরের দ্বারের পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিবে। সাধন, ভজন, নামকীর্ত্তন, যোগ সম্ভোগ করিয়া ভক্তবৃন্দ যখন মন্দির পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবীতে যাইবেন, দ্বারের এক পার্শ্বে লুকাইয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখ কি প্রকার বর্ণে তাঁহাদের মুখ শোভিত হইয়াছে। তাঁহাদের মুখে পৃথিবীর বর্ণ আছে, অথবা পৃথিবীর অতীত কোন বর্ণে তাঁহাদের মুখ অনুরঞ্জিত হইয়া, তাঁহারা ঈশ্বরের মন্দির হইতে পৃথিবীর অভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহাদিগের চক্ষুর জ্যোতি কি শান্তিপূর্ণ হয় নাই? তাঁহারা যে প্রকার সৌন্দর্য্য ও ভাব লইয়া মন্দিরে আসিয়াছিলেন, তাহাই লইয়া কি ফিরিয়া যাইতেছেন? যিনি কদাকার লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন, তিনি কি কদাকার লইয়াই বাহির হইলেন? কুৎসিত কি কুৎসিতই রহিল? এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া গুপ্ত ব্যক্তি লুক্কায়িত থাকিয়া কি শিক্ষা করিল? যে মূর্খ সে তত্ত্বজ্ঞান সঞ্চয় করিয়া লইয়া গেল। তুমি স্বীয় জীবনে সে প্রকার জ্ঞান অন্ত

কোনরূপে লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। যে দুঃখ-অগ্নিতে দগ্ধ, মলিন সৌন্দর্য্যবিহীন ভাবে আসিয়াছিল, বাহির হইয়া যাইবার সময়ে তেজস্বী, রূপে গুণে ভাবে অনুরঞ্জিত, নূতন বর্ণে পরিশোভিত হইল। যে গুপ্তভাবে এই সকল দেখিল সেও সাধক হইয়া গৃহে ফিরিয়া গেল, তাহার এই দৃশ্য দেখিয়া পরম লাভ হইল।

তোমার ব্রহ্মদর্শন হইয়াছে কি না, মুখের দিকে তাকাইয়া বলিতে পারা যায়। যাহার ব্রহ্মদর্শন হইয়াছে তাহার মুখ অদ্ভুত সুন্দর বেশ ধারণ করিয়াছে। নূতন সৌন্দর্য্য নূতন বর্ণে মুখ অনুরঞ্জিত হইয়াছে। সে লাবণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হইবে। তুমি যদি ভক্ত হও, তোমার মুখের ভাবের রূপান্তর হইবে। ভক্ত দেখিয়া ত বলিবেই, স্থূলদর্শী ব্যক্তির নিকটেও সেই রংই বলিয়া দিবে। উৎসবে যখন ভক্তি প্রেমের উচ্ছ্বাস হয়, তখন সকলের মুখের কেমন সৌন্দর্য্য হয়। সে মুখ আর পৃথিবীর মুখের ন্যায় কলঙ্কিত নয়। কিন্তু নূতন শোভায় অনুরঞ্জিত। তাহার লাবণ্য চারিদিকে বিস্তৃত হয়। এমন সময়ে পাষণ্ডেরও চক্ষু ফেরে। ঈশ্বরের দিকে তাকাইয়া থাকিলে তাহার মনে অদ্ভুত ভাবের সঞ্চার হয়। এরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ কি? উহার যে কারণ আছে, তাহার নিগূঢ় তত্ত্বানুসন্ধান সুলভ। জনক জননী সন্তানের মুখে প্রতিবিম্বিত হন সকলেই বলে। সংসারে মুখ দেখিয়া চিনিতে ভ্রম হয় না। পিতা এবং সন্তানের মুখের দিকে তাকাইলেই যেমন লোক কেন হউক না পিতার মুখশ্রী সন্তানে, সন্তানের মুখশ্রী পিতাতে দেখিতে পাইবে। সহজ বুদ্ধিতে গঠনের তুলনাও বুঝিতে পারা যায়। পুত্র কন্যাকে দেখিলে পিতা মাতার সাদৃশ্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবে। এক এক সন্তানে দুয়েরই গঠন

হইয়া থাকে। সংসারে যে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, ধর্ম্মরাজ্যেও সেই সাদৃশ্য আছে। সাদৃশ্য দেখিয়া পরিচয়, এ যুক্তি উভয় স্থলেই সমান। ইহা সর্ব্বত্রব্যাপী। কিন্তু সে সাদৃশ্য এখনও দেখিতে পাই নাই। পিতা মাতার সঙ্গে পুত্র কন্যার সাদৃশ্য পার্থিব, ঈশ্বরের সঙ্গে নিরাকার আত্মার সাদৃশ্য স্বর্গীয়।

আমার দ্বিতীয়বার জন্ম না হইলে, দ্বিজত্ব লাভ না হইলে তাহাতে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব নিপতিত হয় না। আত্মাতে ঈশ্বরের মুখশ্রী প্রতিবিম্বিত হইয়া সেই বর্ণের জ্যোতি বাহিরের মুখ শোভিত করে। মানুষ ঈশ্বরে সজীব হইলে সংসার সম্বন্ধে মৃত হয়। পাষণ্ড অবিশ্বাসীরাও বলে ঈশ্বরের নিকটে প্রণাম করিয়া মনোমালিন্য দূর হইল। মনুষ্য ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া তাঁহার নিকটে দাঁড়াইলে, ঈশ্বর তাঁহার দৃষ্টিতে নূতন জন্ম দিলে ঈশ্বরের যথার্থ পুত্র হইয়া ঈশ্বরের ভাবে জন্মগ্রহণ করে। ঈশ্বরের নিকটে দাঁড়াইলে আমরা সকলেই তাঁহার পুত্র হই। তুমিও তাঁহার পুত্র আমিও তাঁহার পুত্র। সাধু অসাধু সকলেই তাঁহার পুত্র। পাষণ্ডতা পরিহার করিয়া উপাসনা দ্বারা নূতন ভাবে সঞ্জীবিত হইলে ঈশ্বরের কাছে দাঁড়াইতে পারি, করযোড়ে তাঁহাকে স্তবস্তুতি করিতে পারি। জীবনে নরক নাই, শরীরে নরক নাই, পাতকীর ব্যবহার সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিয়াছি, সমুদয় পুনর্গঠন হইল, সমুদয় সংস্কৃত হইয়া গেল। যে অহঙ্কারী নারকী অবিশ্বাসী ছিল, সে এখন বিনীত শান্ত সুন্দর পুণ্যবান্ হইল। যে শরীর নরকের কূপে নিমগ্ন ছিল, তাহা হইতে কি এই সৌন্দর্য্যের ভাব বাহির হইল? না উহা অন্য কোথা হইতে আসিল? পাষণ্ডের পাষণ্ডতা পুণ্যময়ের পুণ্য-অগ্নিতে দগ্ধ হইল, তাই নূতন শোভা ধারণ

করিয়া স্বর্গে প্রসূত হইল, স্বর্গীয় পিতা মুখচুম্বন করিয়া গ্রহণ করিলেন; পাতকী দ্বিজত্ব লাভ করিল। এখন সেই সন্তানের মুখে পিতার মুখের সাদৃশ্য দেখ। সাধন ভজন উপাসনাতে সাধক নূতন জন্মগ্রহণ করিলেন, তাঁহার মুখ তাই আশ্চর্য্য ভাব ধারণ করিল। ঈশ্বরের জ্যোতিতে তাঁহার সমুদয় জ্যোতিষ্মান্ হইল। পূর্ব্বে যে কুৎসিত ছিল ঈশ্বর তাহাকে আদর করিয়া ক্রোড়ে লইয়াছেন; দেখ এখন তাহার মুখশ্রী কেমন সকলের মনকে আকৃষ্ট করিতেছে। ঈশ্বর-সন্তান সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী হইয়া পৃথিবীর রোগ শোক যন্ত্রণা সমস্ত নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিলেন, সকলকে দয়াল নাম বিতরণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার মুখশ্রী দেখিয়া কেন সকলে মোহিত হইবে না, কেনই বা তাহা ঈশ্বরের অনুরূপ সুন্দর হইবে না? আমরা সেই সৌন্দর্য্য সেই বর্ণ দ্বারে লুক্কায়িত থাকিয়া দেখিতে পাইলাম। সাধনগৃহে ভক্তিগৃহে প্রেমগৃহে নূতন শিশু জন্মগ্রহণ করিলেন, আমরা তাহা তাঁহার উপাসনায় মুখশ্রী দেখিয়া বুঝিলাম।

সেই নবজাত শিশুর মুখ এমন শোভা কেন ধারণ করিল? ঈশ্বরের মুখের জ্যোতি সন্তানের মুখের উপর পড়িল বলিয়া এরূপ হইল কেন? নূতন জন্মের জন্য। পিতার মুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাঁহার চক্ষুর কোমল জ্যোৎস্না তাঁহার মুখের উপর পড়িল। বিনীত হইয়া যতই সে তাঁহার মুখের দিকে আরও তাকাইতে লাগিল, ততই সেই স্বর্গীয় জ্যোতিতে মুখ পরিবর্ত্তিত হইতে চলিল। ব্রহ্মদর্শন কি? ব্রহ্মে এমন জ্যোতি আছে যাহা উপাসনায় মুখে প্রতিভাত হয়। ভক্তিপ্রেমে হৃদয় আর্দ্র হইয়া ঈশ্বরের নামকীর্ত্তন করিতে করিতে যখন হৃদয় বিনীত হয়, তখন ঈশ্বরের দৃষ্টির লাবণ্য

সেই সন্তানের মুখকে আলোকিত করিয়া শোভা দান করে। তাঁহার দিকে দুই মিনিট পাঁচ মিনিট অর্দ্ধ ঘণ্টা এক ঘণ্টা তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে মুখ এত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় যে, তাহাতে আর পূর্ব্বভাব থাকে না, এক অপূর্ব্ব নূতন ভাবের সঞ্চার হয়, এবং উহা এক নূতন লাবণ্য অর্পণ করে। দর্শনের ফল এই।

ঈশ্বরের পুত্র কন্যাগণের মুখশ্রী ঈশ্বর-মুখ দর্শনে অধিকতর উজ্জ্বল হয়, নূতন জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হয়। বিষয়ী সংসারীগণের মুখ সেরূপ নহে। উহা ম্লান মলিন এবং বিষণ্ণ। কতকগুলি সাধক এক স্থানে দাঁড়াইলে দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়, কাহার মুখে পিতার মুখশ্রী পড়িয়াছে, কোথায় তাঁহার মুখের শোভা প্রকাশিত হইয়াছে। জ্যোৎস্না মুখে নিপতিত হইলে বুঝিতে পারা যায়, এখানে আর ব্রাহ্ম কপট হইয়া চেষ্টা করিয়া মুখ ঢাকিতে পারেন না। ঈশ্বরের প্রেমসুধা পান করিয়া উপাসনা-গৃহ হইতে বাহির হইলে দেখিতে পাওয়া যায়, সাধক প্রেমেতে ভক্তিতে সুখী হইয়াছেন। যে ব্যক্তির মুখ শুষ্ক, মলিন, তাহাকে দেখিয়া কেহ বলে না, এ ব্যক্তি উপাস্য দেবতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিল। হে ব্রাহ্ম! যথার্থ উপাসনা কর। যাহার যথার্থ উপাসনা হয়, সে কি দশ বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ ছিল সেইরূপ থাকে? শুষ্ক পূজাতে মুখ বিবর্ণ মলিন এবং ম্লান থাকিয়া যায়। যথার্থ উপাসনাতে ঈশ্বর দর্শন হয় এবং তাঁহার প্রেমমুখের আবির্ভাব তোমাদের মুখে আবির্ভূত হইবে, প্রাণের ভিতরে মুখের ভিতরে স্বর্গের আশ্চর্য্য বর্ণ প্রকাশ পাইবে; হৃদয়-উদ্যানে বিচিত্র ফুল প্রস্ফুটিত হইবে। তোমাদিগকে দেখিয়া পৃথিবীর সমুদয় লোক তোমাদিগের অনুগামী হইবে। যে দেখিবে তাহারই

চিত্ত বিমোহিত হইবে। উপাসনা-গৃহ হইতে যদি এমন ভাব লইয়া আসিতে পারি, তবে জানিলাম ঈশ্বরের উপাসক হইলাম, নতুবা উপাসনা স্তবস্তুতি সকলই বৃথা।

ভক্তমুখে ব্রহ্মের লক্ষণ।

রবিবার, ৩রা শ্রাবণ, ১৭৯৭ শক; ১৮ই জুলাই, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

মনুষ্য মাত্রেই ভ্রাতা ভগিনী, এটী সম্বন্ধ জন্য। উপাসনান্তে যে ভ্রাতা ভগিনী ভাব হয়, তাহা তদপেক্ষা গূঢ়তর। কারণ ইহাতে মুখের আকারের সাদৃশ্য হয়। সমস্ত পৃথিবীর লোক পরস্পর ভাই ভগিনী, তন্মধ্যে যাহারা এক পিতা এক মাতার পুত্র কন্যা, তাহারা আরও বিশেষ সম্বন্ধে ভ্রাতা ভগিনী। কেন না তাহাদিগের উভয়ের মুখে পিতা মাতার মুখের সাদৃশ্য আছে এবং তাহাদিগকে দেখিলেই চিনিতে পারা যায়। ভক্তবৃন্দ মধ্যেও ভ্রাতা ভগিনী ভাব, কিন্তু তাঁহাদিগের মূর্ত্তিতে একটী বিশেষ সুন্দর বস্তু আছে, তাহা এই ভক্তবৃন্দের মুখের প্রস্ফুটিত স্বর্গের বর্ণ। তাঁহাদিগের হৃদয় ও মুখ স্বর্গীয় প্রফুল্লতা অনুরাগে অনুরঞ্জিত এবং তাঁহারা পরস্পর অতিমাত্র প্রিয় হন। এক ঈশ্বরের পুত্র কন্যা এই সম্বন্ধ ধরিয়া তাঁহাদিগের ঘনিষ্টতা স্থির করিলে, তাঁহাদিগের অবমাননা করা হয়, যথার্থ কথা বলিতে হইলে বলিতে হয়, তাঁহাদিগের প্রাণ আকৃষ্ট হইয়া পরস্পরের মধ্যে এক হইয়া গিয়াছে, তাই তাঁহাদিগের সকলের মুখে এক আকার এক বর্ণ প্রকাশিত রহিয়াছে। সে রং দেখিলে, সে মুখ দেখিলে, সে নয়ন দেখিলে, আর পর ভাব থাকিতে পারে না। দেখিয়া ভালবাসা

হইবেই। ঈশ্বরের মুখের শোভা ভক্তে প্রতিবিম্বিত হইলে, ভক্তের মুখের বিশেষ লাবণ্য হয়। উপাসনা করিতে করিতে মুখের ভাব নিশ্চয় পরিবর্ত্তন হইবে। ঈশ্বর-দর্শনে যেমন মুখ ছিল, তেমনই রহিয়া গেল, ইহা হইতে পারে না। ঈশ্বরের ঘরে গিয়া নূতন আকার, নূতন প্রভা, নূতন আলোক, নূতন শোভা হয়। সে আকার, সে জ্যোতি ভাবান্তর করিয়া দেয়। ক্রমে গূঢ় সাধনে নিযুক্ত হইয়া সাধক যতই ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিবেন, প্রেমময়ের সন্নিকর্ষ বশতঃ ততই তাঁহার মুখ পরম আনন্দের গূঢ় জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হইবে। ঈশ্বর গৃহসাধকে প্রতিষ্ঠিত সেই ভাব রক্ষা করিবে, একজন নয়, দুই জন নয়, শত সহস্র লোক সেখানে গিয়া সাধন ভজন করিয়া, পরিবর্ত্তিত মুখের ভাব লইয়া ফিরিয়া যাইবে। ধর্ম্মরাজ্যের এটী প্রাচীন কথা। সেখানে গিয়া ভাবান্তর হইবেই।

উপাসনা করিয়া মুখ জ্যোতিবিহীন রহিয়া গেল, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত। ইহাতে উপাসনা অস্বীকার করিতে হয়, ফল অস্বীকার করিতে হয়। উপাসনা-বীজ হহতে যে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তাহার ফল নিশ্চয় ফলিবে। অগ্নির উত্তাপ, জলের শীতলতা, ইহার কোন কালে অন্যথা হয় না। ভৌতিক জগতের নিয়ম যেমন নিত্য, ধর্ম্মরাজ্যের নিয়মও সেইরূপ নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয়। উপাসনা সময়ে নূতন ভাবের সঞ্চার হইবে, সেই স্বর্গীয় জ্যোৎস্না হৃদয়ের মধ্য দিয়া মুখে আসিয়া পড়িবে, চক্ষে প্রকাশিত হইবে। অন্য ভক্তের সঙ্গে কথা কহিতেছ, উহা চক্ষুপথ দিয়া সেই ভক্তের হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইবে, চক্ষু হইতে ঈশ্বরের ভাব আসিবে। ভক্ত, হৃদয়ে যাহা লুকাইয়া রাখিবেন, চক্ষু তাহা প্রকাশ করিয়া দিবে। ঈশ্বরের সন্তান পরস্পর

পরস্পরকে চিনিবে। ব্রহ্মসন্তান অপর ব্রহ্মসন্তানকে বুঝিতে পারে। ব্রহ্মসন্তানের বাহ্যিক উপবীত কি? তিনি যে দ্বিজ তাহা জানিবার উপায় কি? ঈশ্বরের ভক্তিপ্রেমে তাঁহার নূতন সংগঠন হইয়াছে, চক্ষু বলুক, মুখ পরিচয় দিক। অভিধান কি শব্দ নির্ম্মাণ করে? অভিধান উহা বলে না, মুখ বলিয়া দেয়। আকৃতি প্রকৃতি, ভাব ভঙ্গী দেখিয়া, দ্বিজকে জানা যায়। তাঁহাকে দেখিলেই দ্বিজ মনে হওয়া নিশ্চয় ব্যাপার। সকল দেশেই ভক্তগণ পরস্পরের নিকট প্রিয়। ভক্ত কথা কহিলেন না, উপাসনার পর তাঁহাকে দর্শন করিলে চক্ষু কথা কহিবে, রসনা শব্দ উচ্চারণ করুক আর নাই করুক তাহাতে ক্ষতি কি? তিনি অশব্দ কথায় কথা কহিলেন। সে উপবীত কি? নিগূঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব বলিয়া দিবে। উপাসনার সময় সেই ভাব, সেই লক্ষণ প্রবেশ করিবে। কারণ যদি থাকে, কার্য্য অবশ্য হইবে। ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হইবার বিনয়ভাব মুখের নূতন রং করিয়া দিবে। সে রং পৃথিবীর বাজারে ক্রয় করা যায় না। পৃথিবীর নিম্নশ্রেণীর সামান্য লোকে তোমাদিগকে বিনয়ী বলিবে, লোকমণ্ডলীর মধ্যে তোমরা বিনয়ী বলিয়া প্রশংসিত হইবে —সে বিনয়ের প্রশংসা করি না। ধর্ম্মরাজ্যে সে বিনয়ও অহঙ্কার। বিনয় আছে এই মনে, উপাসনা-গৃহে প্রবেশ করিয়া যথার্থ উপাসনা করিলে, আপনার জঘন্যতা বুঝিতে পারা যায়। জ্ঞানী ধনী মানী এ বলিয়া অহঙ্কারী হইলে, আর তখন চলে না।

উপাসনার প্রথম অক্ষরে বিনয়। সে সময়ে আর মস্তক উপরে রাখিতে পারা যায় না। যাই উর্দ্ধদৃষ্টি করিবার পর সেই মহান্ পুরুষের জ্যোতি আসিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করে, অমনই

দুর্ব্বিনীত ভাব পলায়ন করে। কার কাছে গিয়া উপস্থিত? কাঙ্গাল দরিদ্র কলঙ্কে জর্জ্জরিত ঈশ্বরের নিকটে দাঁড়াইতে পারে না; সেখানে প্রবেশ করিবা মাত্র মন বিনীত ভাব ধারণ করে, ক্রমে অহঙ্কার গিয়া বিনয় শোভা প্রকাশ করে। যন্ত্রণা দুঃখ অন্ধকার মুক্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিবে। ঈশ্বর-মুখের আনন্দচ্ছটা ভক্তমুখে পতিত হইয়া ভক্তের পাপশরীর দগ্ধ হইয়া আনন্দজ্যোতিতে বিবর্ণ-মুখ উজ্জ্বল এবং নূতন বর্ণে অনুরঞ্জিত হয়। দুঃখের দিন মুহূর্ত্ত মধ্যে চলিয়া গিয়া সাধক সুখী হন। হৃদয় ভগ্ন, অনেক পাপ করিয়াছি স্মরণ করিয়া তিনি ক্রন্দন করেন। সেই অশ্রু প্রবাহিত হইয়া তাহা হইতে এমন এক আনন্দজ্যোতি বিনিঃসৃত হয়, ভক্তিজল প্রেমজল চক্ষু বহিয়া পড়িতে থাকে, উহাতে ঈশ্বরের মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইয়া বিষাদের মধ্যে প্রসন্নতা আসিয়া উপস্থিত হয়। ঈশ্বরের মুখজ্যোতি তোমার মুখে প্রকাশিত হইবে, ঈশ্বরের আনন্দে হৃদয় মন নিমগ্ন হইবে, ঈশ্বরের প্রেমরস পানে উন্মত্ত হইবে, তাঁহার পবিত্র জ্যোতিতে আত্মার অন্ধকার ঘুচিয়া যাইবে। ঈশ্বরের মুখ পানে তাকাইয়া থাকিলে যে ভাব হয়, সে ভাব তোমার মুখে নাই। দুঃখের সঙ্গে সেই মধুর জ্যোতি লাভ করিবার জন্য কাঁদিয়া নয়ন ভাসাইয়া দাও, দেখিবে বিষাদে আনন্দতরী ভাসিবে। অন্ধকারের মধ্যে প্রাণের ভিতরে এমন এক জ্যোতি প্রকাশ পাইবে লোকে বলিবে যে, ইহার দুঃখের উপরে দুঃখ, সমুদয়ই ইহার সম্বন্ধে বিষাদের ব্যাপার; অথচ সমুদয় দুঃখ বিষাদ ভেদ করিয়া কেমন ইহার প্রসন্নতা প্রকাশ পাইতেছে। ফলতঃ দুঃখ দুর্ব্বলতা তখন চলিয়া যাইবে, বীরের

তার উপাসনা করিবে, পাপ প্রবৃত্তিকে যত্নপূর্ব্বক পরিহার করিতে হইবে না, তাহারা তোমার পদানত ভৃত্য হইয়া পড়িবে। দেখিতে পাইবে, অগ্ন ভক্ত হইয়া উপাসনা-ঘরে সর্ব্বশক্তিমানের মুখের দিকে তাকাইলাম, এমনই বল আসিয়া প্রবেশ করিল, এমনই স্ফূর্ত্তি, এমনই উৎসাহ হইল যে, ধর্ম্মবীরের সেই মুখ দর্শন করিয়া পাপপ্রবৃত্তি সে দিক দিয়া যাইতে পারিল না। সে বীরকে চিনিতে পারিল এবং তাঁহার নিকটে তাহার মস্তক চূর্ণ হইল। সংসার তাঁহার নিকটে আসিতে পারিল না। তিনি পূর্ব্বে ভীরু দুর্ব্বল ছিলেন, উপাসনা-গৃহ হইতে সবল নির্ভীক হইয়া ফিরিলেন, শত শত সহস্র সহস্র রিপু তাঁহাকে দেখিয়া ভীত হইল, পাপ এবং পাপীরা কম্পিত হইল, জানিল ইনি আর এখন সেই দুর্ব্বল ভীরু নহেন। দু একবার তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্ত অল্প চেষ্টা করিয়াই পলায়ন করিল। পাপের প্রতি এক শক্ত বাক্য উচ্চারণ করিলেন, দল শুদ্ধ সকলের গা কাঁপিয়া উঠিল। দেখিতে যোগীর বেশ, তপস্বীর বেশ। চক্ষু স্ফূর্ত্তিমন্ত, যে স্থানে দৃষ্টি পড়িল, সে স্থান শুকাইয়া গেল, এমনই তেজ যাহার উপরে দৃষ্টি পড়িল, সে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। তেজে যিনি পরিপূর্ণ, সেখানে ঈশ্বরের তেজ প্রবিষ্ট হইয়াছে, পৃথিবীর বল সেখানে তিষ্ঠিতে পারে না। যাঁহার মুখ সর্ব্বদা ঊর্দ্ধে পরমেশ্বরের দিকে নিবদ্ধ আছে, তিনি আর সংসারের দিকে তাকাইবেন কিরূপে? পাপ, দুর্ব্বলতা, অহঙ্কার, বিষাদ সমুদয় চলিয়া গেল। নূতন বেশ পরিধান করিয়া, সুন্দর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, ঈশ্বরের গৃহ হইতে তিনি অবতীর্ণ হইলেন।

ভক্তবৎসলের চক্ষুর সঙ্গে মিলন হইলে, ভক্তের মুখে তাঁহার

মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইলে, ভক্তের মুখ পবিত্র হয়। আর নারকীয় মূর্ত্তি দেখা যায় না। পূর্ব্বে লোকে তোমাদিগকে পাপী বলিত, তোমরা কোন কথা কহিলে না, উপাসনা হইতে ফিরিয়া যাইবার সময় সকলে তোমাদিগকে যোগী বলিয়া জানিল, অনেকের তোমাদিগের সঙ্গে থাকিবার ইচ্ছা জন্মিল। ভক্ত যিনি, তাঁহার সঙ্গে থাকিবার প্রথমতঃ উপযুক্ত হওয়া চাই। তাঁহার বিনয়পূর্ণ সহাস্য প্রসন্ন মুখ আমাদিগের চিত্তকে নূতন ভাবে গঠন করে। এইজন্য পুণ্যাত্মার সঙ্গে মিলিত হইয়া সকলে সুখী হন। একত্রে সকলে ঈশ্বরের গৃহে মিলিত হন, সকলের মুখে তাঁহার প্রতিবিম্ব প্রতিভাত হয়। পরস্পরের চক্ষু পাঠ করিয়া তাঁহারা দর্শনসুধা পান করেন, যত পরস্পরকে দেখেন ঈশ্বর-দর্শন হয়, দর্শনসুধা পানে মত্ত হন। তাঁহাদিগের চক্ষুর পানে তাকাইয়া ঈশ্বরের মুখের প্রতি দৃষ্টি পড়ে, সাধকের সঙ্গে থাকিয়া ভক্তের মুখশ্রী দেখিয়া প্রমত্ততা বাড়িতে থাকে। যাই সঞ্চিত প্রমত্ততা একটু কমিতে আরম্ভ করে, অমনই তাঁহাদিগকে দেখিয়া পুরণ করিয়া লন। হৃদয়ের ভিতরে গিয়া দেখিলেন পুরাতন ভাব আসিতেছে, সাধুগণের মুখের দিকে তাকাইলেন, তাঁহার মধ্যে পরমেশ্বরের মুখ দেখিয়া মোহিত হইলেন, আর সে পুরাতন ভাব কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গেল। তাঁহাদিগের সৌন্দর্য্য এবং সৌভাগ্য দেখিয়া জগৎ মুগ্ধ হইল। বলিও না, ভ্রাতা বলিতে চেষ্টা করিব, প্রেম-পরিবার আপাততঃ হইতে পারে না। তোমাদের ভালবাসা নাই, এইজন্য তোমাদের মুখশ্রী তেমন হয় না। যথার্থ ভাবে উপাসনা করিতে পারিলে, পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইলে, মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রেম-পরিবার গঠন হইতে পারে। আমি বলিয়া দিতে

পারি, তুমিও বলিয়া দিতে পার, ভ্রাতঃ! আজ তোমার উপাসনা ঠিক হয় নাই। তোমার মুখ চক্ষু দেখিয়া বুঝা যাইতেছে, আজ তুমি আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা ও নব নব সঙ্গীত করিয়াছ বটে, কিন্তু প্রকৃত উপাসনা হয় নাই। সেই প্রফুল্ল মুখশ্রী তোমাতে আইসে নাই। তাঁহার রূপ তোমার মুখেতে প্রতিফলিত দেখিতেছি না।

একটী জলবিন্দু দ্বারা যে দিক প্রক্ষালিত কর নাই, সেই দিক বিবর্ণ রহিয়া গিয়াছে। যে ভাগ প্রক্ষালিত করিলে তাহাতে তাঁহার প্রতিবিম্ব পড়িবে, যাহা প্রক্ষালিত কর নাই, সেইটুকুতে তাঁহার প্রতিবিম্ব পড়িল না। ঈশ্বরের জ্যোৎস্না পাপান্ধ মুখে প্রতিফলিত হইল না, তাই সেই মুখ লইয়া ফিরিয়া আসিলে। যাও ফিরিয়া যাও, ঈশ্বরের নিকটে যাও, সংসারে ফিরিয়া যাইও না। মুখের রং পরিবর্ত্তন করিয়া আইস। যাহার উপাসনা হয় নাই, তাহাকে ঈশ্বরের গৃহের দ্বারে বসিয়া স্নেহাশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া বলিব, আবার যাও, তোমার জন্য আমি বসিয়া থাকিলাম। যাহার উপাসনা হয় নাই, কনিষ্ঠ জানিয়া সকলে তাঁহাকে ঈশ্বরের ঘরে প্রেরণ করুন। নিজে প্রমত্ত হইব, উপাসনা করিয়া আসিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিব, বিশ্বাস বাড়িয়াছে কি না, হৃদয় প্রফুল্ল হইয়াছে কি না? কে সম্পূর্ণরূপে উপাসনায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন দেখিব। দেখিতে পাইব, একদিন তোমার উপাসনা ভাল হইয়াছে, একদিন আমার উপাসনা ভাল হইবে। আজ উপাসনা ভাল হয় নাই, তাই আজ পরস্পরকে তেমন ভালবাসিতে পারিতেছি না; আজ উপাসনা ভাল হইয়াছে, তাই আজ দিন ভাল গেল; অনুরাগ বর্দ্ধিত হইল, পরস্পরে এই সকল বিষয়েই কেবল আলাপ করিব। উপাসনা ততক্ষণ হয় নাই,

যতক্ষণ মুখশ্রী উজ্জ্বল না হয়। এই সংস্কারটী উপাসনা সম্বন্ধে দৃঢ়রূপে সংস্থাপন কর, আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা প্রভৃতি সাধনের অঙ্গ সকলের মধ্যে এই ভাবটী রক্ষা কর। ইহাতে সকল অঙ্গ সুমিষ্ট হইয়া আসিবে। উপাসনা, ধ্যান, আরাধনা, সঙ্গীতে যতবার আমরা নিমগ্ন হইব, আমাদিগের মুখ ঈশ্বরের দিকে ফিরিবে, বিজয় লাভ হইবে। ইহা যদি না হয়, তাহা হইলে আমরা আকাশ, নিজ নিজ কল্পনা বা কোন দানবের আরাধনা করিতেছি; তাই আমাদিগের মুখ সুন্দর হইল না। যে ঈশ্বরের গৃহে যায়, সে শ্রীপূর্ণ মুখ লইয়া দেবগৃহ হইতে ফিরিয়া আইসে। পরস্পরকে এ সম্বন্ধে শাসন কর, এক মাসের মধ্যে প্রার্থনা, আরাধনার সৌন্দর্য্য সৃজন করিবে। নূতন প্রভা দৈবভাবে মুখের লাবণ্য বর্দ্ধিত করিবে। ভক্তিপূর্ব্বক প্রেমময়ের পূজায় প্রবৃত্ত হও, যতক্ষণ মুখ সুন্দর না হয়, ম্লান বিবর্ণ ভাব না যায়, মন শান্ত, হৃদয় পবিত্র, নূতন জ্যোতিতে পূর্ণ না হয়, ততক্ষণ চরণ ধরিয়া পড়িয়া থাক; সমুদয় ভক্তবৃন্দকে আলিঙ্গন কর, উপাসনা করিয়া কেমন আনন্দ সুখ শান্তি লাভ করিলে, এই সংবাদ প্রচার করিয়া জগতে বিশ্বাসের রাজ্য বিস্তার কর।

সংসারে ব্রহ্মসাধন।

রবিবার, ১০ই শ্রাবণ, ১৭৯৭ শক; ২৫শে জুলাই, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

এখানে যে জনসমাজ দেখিতেছি, এখানেও যে কোলাহলে কর্ণভেদ হয়, এখানে সাংসারিকতার দুর্গন্ধে চারিদিক পূর্ণ, এখানে তপস্যার বাধা হইবার সম্ভাবনা, এই বলিয়া সংসারত্যাগী বনান্বেষী সাধক

আরও অগ্রসর হইয়া চলিলেন। সম্মুখে নগর, তাহাও পশ্চাতে ফেলিয়া মনে করিলেন, সংসার পরিত্যাগ করিয়া নির্লিপ্ত ভাবে ঈশ্বরের সাধন করিব। প্রাচীন হিন্দুগণ সমুদয় ত্যাগ করিয়া যেখানে লোকালয় আছে, কার্য্য আছে, বিষয়চিন্তা আছে সমুদয় ত্যাগ করিতেন। দশ ক্রোশ, এক শ ক্রোশ ক্রমাগত চলিলেন, সেখানেও লোকের শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিল, বলিলেন এ স্থানও আমার জন্য নহে। সমুদয় লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া গভীর অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন, সেখানে লোকের সমাগম নাই। দেখিলেন সেখানে আর পৃথিবীর কোলাহল ক্রোশ ক্রোশান্তর উল্লঙ্ঘন করিয়া আসিল না, পৃথিবী তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণ করিলেও সেখানে গেল না, সংসারের শব্দ, সংসারের বস্তু সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় না, লক্ষ হয় না। যোগী উপযুক্ত স্থান পাইয়া মনের আনন্দে যোগারম্ভ করিলেন। যতক্ষণ সেই স্থান অন্বেষণ করিয়া পান নাই, এ দেশ ছাড়িয়া ও দেশ, এ নগর ছাড়িয়া ও নগর, এ পল্লী ছাড়িয়া ও পল্লী, এইরূপে এক মনুষ্যহীন নিভৃত স্থান অন্বেষণ করিয়া বেড়াইয়াছেন। যাই সেইরূপ স্থান পাইলেন অমনই তপস্যাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রাচীন রীতি এই ছিল; বর্ত্তমান রীতি কি? প্রাচীনকালে বনবাসী হইয়া সাধক ঈশ্বরের সহবাস সম্ভোগ করিতেন, বর্ত্তমান সময়ে ঈশ্বর-সহবাস সম্ভোগের পদ্ধতি কি? যদি শতবার বল সংসারে থাকিয়া সাধন করিতে হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্মের উহা প্রথম পরিচ্ছেদ। বিষয়ের সহিত সংগ্রাম করিতে গিয়া পরিশেষে অনেকের মনে নিরাশা অসদ্ভাব বর্দ্ধিত হইয়াছে, সংসার ঈশ্বর একত্র করিতে গিয়া মনুষ্য দুর্ব্বিপাকে পড়িয়াছে। হয় সংসার জয়ী হইবে, নয়;

সংসারত্যাগীর কল্পিত ধর্ম্ম লাভ করিবে, সংসার ঈশ্বর একত্র করিয়া কেহ সুখী হইতে পারিবে না। এ পুরাতন মত আর দাঁড়াইতে পারে না। এইজন্য বলি ঈদৃশ মতকে ভ্রম বলিয়া বিদায় করিয়া দাও। তর্ক করিয়া এই মত স্থির রাখিবার চেষ্টা বৃথা। সাধন-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া দেখিতে পাইবে, কি ভয়ানক রণক্ষেত্র, সংসার এবং ধর্ম্মে কি প্রবল বিবাদ! বিচার করিয়া বহু চিন্তা করিয়া স্থির হইল সংসার ত্যাগ করিয়া সংসারাশ্রমে বনবাসী হইয়া যোগাভ্যাস করিব। বনবাসী হইয়া তপস্যাচরণ, সেই পথ কি আমাদিগের অবলম্বনীয় নহে? বনবাসী ব্রাহ্ম ভিন্ন কেহ যথার্থ ব্রাহ্ম হইতে পারে না। এ দেশ ও দেশ করিয়া কি আমাদিগকে সেই বন অন্বেষণ করিতে হইবে? সে বন কোথায়? কোথায় গেলে বনবাসী ব্রাহ্ম হওয়া যায়? সংসারকে পদ দ্বারা বিদলিত না করিলে শান্তিলাভ করা যায় না, কিন্তু সে বন কোথায়? ভূগোল পাঠ করিয়া দেখ, ধর্ম্মরাজ্যের কোন্ দিকে গেলে সেই বন উপলব্ধি হইবে? প্রাচীন ঋষিগণের ন্যায় সংসার ত্যাগ করিয়া বনে গেলে উপদ্রব কমিয়া যায়, এই ভাবিয়া বনে গমন করিব। কিন্তু এই বন গমনে ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্কেতে গমন করিব। বাহ্যিক পদ্ধতি গ্রহণ না করিয়া যুক্তি দ্বারা মূল গ্রহণ করিব, অসার ভাগ পরিত্যাগ করিয়া উহার সার গ্রহণ করিব।

যদি বাহে সংসার ছাড়িয়া যাইতে চাও, এক সংসার ছাড়িয়া আর এক সংসারে গিয়া পড়িবে। বাহিরে সংসার পরিত্যাগ করিলেও যে রিপুগণের অতীত স্থানে উপস্থিত হওয়া যায় তাহা নহে। সেই জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া পূর্ণ ফল লাভ হয় না। সেখানেও সংসার

সঙ্গে সঙ্গে চলে। সংসার ছাড়িয়া যে পথে যাও, দেখিতে পাইবে সম্মুখে উহা প্রতীক্ষা করিয়া আছে। চল্লিশ বৎসর একজন ব্রাহ্ম হইয়াছেন, অদ্যাপি যৌবনকালের সমুদয় ব্যাঘাত বিদ্যমান রহিয়াছে। এতদূর আসিয়া বৃদ্ধ হইতে চলিলাম, এখনও একটা না একটা লালসা লোভ দেখাইতেছে; মনের ভিতরে কুপ্রবৃত্তি রহিয়া গিয়াছে। যত চলি এ পথের অন্ত নাই, যোগ লাভ দূরের কথা। পরিশেষে এই সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে, সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া দুর্গম বনের ভিতরে প্রবেশ না করিলে ঈশ্বরের কাছে বসিবার উপায় নাই। সংসারলালসা যতদিন থাকিবে, দুষ্প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতকাল থাকিবে, গভীর আনন্দ সম্ভোগের সম্ভাবনা নাই। যথার্থ আনন্দ সম্ভোগ করিতে হইলে সম্পূর্ণ বনবাসী হওয়া কর্ত্তব্য।

যথার্থ সাধক ক্রমাগত মনের ভিতরে চলিবেন। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মনের ভিতরে যে যে স্থানে প্রলোভন আছে উহা ছাড়িয়া চলিবেন। সে চক্ষু এমনি নিপীড়ন করিয়া বদ্ধ করিতে হইবে যেন সেখানে সংসারের একটী বস্তুও যাইতে না পারে। সেখানে গিয়া বিষয় অন্তর্দৃষ্টিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া বিরক্ত করিলে, তদপেক্ষা আরও একটী গভীর স্থানে গিয়া প্রবেশ কর। সেখানেও সংসারের অত্যাচার উত্তেজনা একেবারে যায় না। অন্তরে এক স্বর্গ হইতে অপর স্বর্গ এইরূপ সপ্ত স্বর্গে উত্থিত হইলেও একটী না একটী রিপুর আক্রমণ থাকিয়া যাইবে; মনের মধ্যেও বিঘ্নপূর্ণ প্রলোভন-পূর্ণ এক একটী নগর প্রকাশিত হইবে। মনকে ভেদ করিয়া আরও গভীরতার মধ্যে বন অন্বেষণ কর। এমন করিয়া মাসের পর মাস বর্ষের পর বর্ষ চলিতে থাকিবে, উপাসনা গভীর ভাব

ধারণ করিবে। এমন স্থান নিকটবর্ত্তী হইতেছে, যেখানে পৃথিবীর সংশ্রব যাইতে পারে না। হিমালয়ের উপরে নহে, সাগরপারে নহে, মনের ভিতরে এমন স্থান আছে যেখানে যোগী যোগ সাধন করেন, ভক্ত উপাসক উপাসনা করেন, সাধন করেন, ঈশ্বরের রাজ্য অন্বেষণ করেন। উপাসনা করিতে করিতে, সাধন করিতে করিতে ভিতরে গিয়া একটী সুন্দর স্থান পাইবে। আজ যে স্থান পাইয়াছ তাহা পরিত্যাগ করিয়া যত্ন চেষ্টার দ্বারা সেই স্থান লাভ করিতে হইবে। ঈশ্বর করুন যেন এ জীবন সেই স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে ক্ষেপণ না হয়!

আমরা সংসার ছাড়িব না, ভিতরে গমন করিয়া বেশ একটী চমৎকার স্থান পাইব। সেখানকার ঘাসগুলি কেমন সুন্দর, কেমন অপূর্ব্ব পুষ্প সকল শোভা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, মনোহর পাখীগুলি ডাকিতেছে, এই সেই বন, চিরদিন যাহা অন্বেষণ করিতেছিলাম। এখানে বসিয়া যোগী হইয়া যোগারম্ভ করিব। এখানে স্তবস্তুতি করিয়া দেব দর্শন লাভ করিব, মনোহর ভাব উপার্জ্জন করিব। এ স্থান যতদিন না পাইতেছি ধ্যান ভঙ্গের পদে পদে সম্ভাবনা। যেমনই পাপ আসিয়া হৃদয়ে দেখা দিল, কোথায় গেল ধ্যান, কোথায় গেল তপস্যা, কোথায় গেল যোগীর যোগ, কোথায় গেল প্রেমিকের প্রেম। চন্দ্র ঘনমেঘে আবৃত হইল, ঝড় উঠিল, শক্ত গৃহ আন্দোলিত হইল, তপস্যার ঘর ভাঙ্গিয়া গেল, যত্নের ধন হারাইল। চক্ষু মুদ্রিত করিলে সেই পাপ, চক্ষু খুলিলেও সেই পাপ। চল্লিশ বৎসর পঞ্চাশ বৎসর সাধন করিলাম, কোথা হইতে কে আসিয়া সর্ব্বনাশ করিল। এইরূপে দিন যায়। যোগী

নিরুপায় হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সংসার ছাড়িলেন, সব ছাড়িলেন, প্রলোভন কিছু নাই, আবার নূতন প্রলোভন উপস্থিত হইল, দুষ্প্রবৃত্তি সকল লুক্কায়িত ছিল, নির্ব্বাণপ্রায় হইয়াছিল, আবার পুনরুদ্দীপিত হইল। চারিদিকে প্রবঞ্চনার জাল বিস্তারিত দেখিয়া যোগী আকুলিত হইয়া বলিতে লাগিলেন "হে প্রভু, বিপন্ন যোগীকে উদ্ধার কর। পঞ্চাশ বৎসর সংগ্রামে গেল, আমার কি এ জীবন সংগ্রামেই অতিবাহিত হইবে? ইহকালে আশা পূর্ণ হইল না, মৃত্যুর পর কি বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে?" ভক্তবৎসল যোগীর প্রার্থনা শুনিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার হৃদয়যন্ত্রে আঘাত করিলেন, সঙ্কেত দ্বারা স্বর্গীয় ভাষায় বলিয়া দিলেন "উচ্চতর স্থানে যাও," যোগী অমনই চলিলেন, সেই উচ্চ স্থানে গিয়া প্রকৃত বন পাইলেন। নিরাপদ স্থান কাহাকে বলি, যেখানে সংসারের ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ করা হইয়াছে। সংসার ঋণীকে ধরিবে। ঋণ পরিশোধ করিয়া না গিয়া কোথাও আরাম নাই। ঋণ তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইবে। যত দেনা পাওনা আছে পরিশোধ করিয়া না গেলে কষ্ট পাইতে হইবে। তোমার মন বেশ সংযত হইল মনে করিলে, বিষয় কামনা কিন্তু সঙ্গে রহিল, তার বস্তু সে অন্বেষণ করিয়া লইবেই। এজন্য বলি রিপুগণকে সম্যক্‌রূপে পরাজয় করিয়া, সংসারের সমুদয় ঋণ পরিশোধ করিয়া বনে গমন কর। আর কেহ তোমায় সেখানে বিরক্ত করিবে না, সকলেই অনুকূল হইবে, যোগের পক্ষে সহায় হইবে। বন সেখানে যেখানে বিষয় চিন্তা নাই। এখানে উপাসনা আরাধনা একাগ্রতা ভঙ্গ হয় না। ঈশ্বরচিন্তা, ক্রমাগত ঈশ্বরচিন্তা, সেখানে আর বিষয়চিন্তা আসিতে পারে না।

বনবাসী ব্রাহ্ম ব্রহ্মেতে মত্ত হন। অন্য কামনা আর তাঁহাকে বিরক্ত করিতে পারে না। যে পরিমাণে একাগ্রতা ভঙ্গ হয়, সেই পরিমাণে সেই সাধক বনবাসী হন নাই। যে পরিমাণে একাগ্রতা সেই পরিমাণে বনবাস। বনে সংসারচিন্তা আসিয়া প্রাণকে ঈশ্বর হইতে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে না, বনে পৃথিবীর মায়াজাল আসিয়া প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারে না। সকলই বনের বাহিরে পড়িয়া রহিল, নিবিড় বনে সংসারের শব্দ গেল না। নিশ্চিন্ত বৈরাগী এই পৃথিবীতেই সুফল লাভ করিলেন, সংসারের ভিতরে থাকিয়াই বনের মধ্যে থাকিলেন, মনকে আর কিছুতেই কলুষিত করিতে পারিল না, সংসারকে জয় করিলেন, একদিনের ধ্যানে পঞ্চাশ বৎসরের কার্য্য সমাধা হইল। বনের বাহিরে চলিলে ধ্যান ভঙ্গ হইল, যাই বনের ভিতরে প্রবেশ করিলাম, একটী পাপচিন্তাও আর সেখানে আসিয়া উত্যক্ত করিতে পারিল না। সেখানে একটী তরঙ্গ নাই, চাঞ্চল্য নাই; ঈশ্বরের আরাধনা ধ্যান সুস্থ সুগভীর হইবে। এই প্রকার স্থান অন্বেষণ করিয়া বনের মধ্যে বসিয়া যোগ সাধন কর, ঈশ্বর-সহবাসের প্রকৃত আনন্দ সম্ভোগ করিতে সক্ষম হইবে।

আংশিক ধর্ম্ম এবং পূর্ণ ধর্ম্ম। *

রবিবার, ১৭ই শ্রাবণ, ১৭৯৭ শক; ১লা আগষ্ট, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

এখানেও ধর্ম্মের সাধন হয়, সেখানেও ধর্ম্মের সাধন হয়, কিন্তু সে অঞ্চলের সাধনের অপর রীতি। সেখানে ঈশ্বরতত্ত্বে আনন্দ, এখানে আরাধনা, ধ্যান, সেবা। ধ্যান সম্বন্ধে সে এক রাজ্য, এ

এক রাজ্য। এখানে মুখ ম্লান; হস্তে বল আছে, হৃদয়ে উত্তাপ আছে, বুঝিতে পারা যায় না। এখানে উপাসনা চলিল, সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান চলিল, সাধনের স্রোত ক্রমাগত চলিতে থাকিল, সুখ নাই, বল নাই, ইন্দ্রিয় দমন হইল না, পাপ প্রবল ভাবে অত্যাচার করিতে থাকিল। কিন্তু সে স্থান প্রকাণ্ড যুদ্ধক্ষেত্র, সেখানে বীরের সংগ্রাম। সেখানকার প্রত্যেকে প্রবল পরাক্রমশালী, সিংহধ্বনি করিলেন অমনই শত্রু সকল পলায়ন করিল, পাপপ্রবৃত্তি মরিয়া গেল। অন্ধকার অপরাধ দোষ সেই সংগ্রাম স্থানে তিষ্ঠিতে পারিল না। সেই সাধকই এখানেও সেখানেও, এত উপায়ের আড়ম্বর, তবে ম্লান কেন? ভীরু কেন? বিভীষিকা দেখিয়া ভূতলে পড়েন কেন? আবার এই অপর স্থান, এখানে নূতন তেজে নূতন বলে ব্রহ্মপূজা হয় কেন? অবশ্য ইহা স্থানের গুণ, স্থানের জল বায়ুর গুণ। এখানে সাধকের মুখে একটী কথা নাই। এখানে সেনাপতির আজ্ঞা পালনে সকলে এক মত। সেনাপতির ভাষাই এখানকার ভাষা। তাঁহার কথা মানিতে হইবে, নইলে তখনই মস্তক ছেদন হইবে। সম্ভ্রম মান্য যত কিছু সেনাপতির প্রাপ্য, সৈন্যেরা কেবল তাঁহার আজ্ঞা পালনে বাধ্য। জান আর না জান প্রাণ দিতেই হইবে, বিন্দু বিন্দু করিয়া শরীরের শোণিত অর্পণ করিতে হইবে। এই ত গেল সে অঞ্চলের কথা। এ অঞ্চলে দেখ যিনি উপাসক, তাঁহার উপরে লোকের চক্ষু পড়িয়াছে, বড় বলিয়া উচ্চপদস্থ বলিয়া সকলে বরণ করিতেছে, চারিদিকে প্রশংসা ব্যাপ্ত হইতেছে। ইনি দুই ঘণ্টা উপাসনা করেন, একা নিত্য উৎসব করেন, একাদিক্রমে চল্লিশ বৎসর নানা বিঘ্ন বিপদ মধ্যে ব্রহ্মের পূজা করিয়া আসিতেছেন, এই সৌভাগ্যের

প্রশংসা। এ কেবল ফাঁকি দিয়া প্রশংসা লাভ। এ রাজ্যে উপাসনা করিলেই হইল চরিত্রের সংবাদ কে লয়? ব্রাহ্মসমাজের গভীর স্থানে গরল বাহির হইতেছে, কে জিজ্ঞাসা করে? কে উত্তর দেয়? যৌবনকালে নবীন উৎসাহে পূর্ণ, বার্দ্ধক্যে নিরুদ্যম, কে তাহার কারণ জানিতে প্রয়াস পায়? এক আনা ধর্ম্ম, পোনের আনা সুখ্যাতি তাহার মূল্য দেওয়া হইল। দয়াময় ঈশ্বরের গৃহে এরূপ ব্যাপার নহে। সেখানে কেবলই বীরত্বের কার্য্য। দেখ, সেখানে জয় পতাকা উড্ডীন হইতেছে, সেখানকার সমুদয় ব্যাপারই আশ্চর্য্য। সেখানে সহস্র উপাসনা করিলেও সুখ্যাতি নাই। রিপুগণ পরাস্ত হইয়া গিয়াছে, মন খাটিতেছে, হস্ত তাঁহার আদেশ পালন করিতেছে। সমুদয় জীবন ঈশ্বরে উৎসর্গ করিয়া ঐ রাজ্যের প্রজা হইলে, প্রশংসা পাও আর না পাও, সেই রাজ্যের লোক বলিয়া গণিত হইবে।

এই উভয় অঞ্চলের এত প্রভেদের কারণ কি? এখানে ওখানে বিভিন্ন সাধনতত্ত্ব আছে। এ স্থলে সংসার ও ধর্ম্মের প্রভেদ বলা হইতেছে না, ধর্ম্মরাজ্যের মধ্যেও যে আংশিক ধর্ম্ম এবং পূর্ণ ধর্ম্ম আছে, তাহারই কথা বলিতেছি। এখানে দশ বৎসর সাধনের পর পুণ্যের স্থলে পাপ আসিয়া ধর্ম্মের অহঙ্কারীকে জলমগ্ন করিল। ওখানে যে ভীরু, নিরুদ্যম ছিল, সেই ব্রাহ্ম সেনাপতির নয়নের নিম্নে দল হইয়া হুঙ্কারে পাপ তাড়াইল। পাপ আর তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না, ভস্ম হইয়া গেল। এই সেখানকার তত্ত্ব। দলে বল হয়। ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ হইয়া সাধক বল লাভ করিলেন। ধর্ম্মরাজ্যে যে একাকী থাকিতে অভিলাষ করে, সে মৃত্যুকে নিকটে ডাকিয়া আনে। একাকী কে কার্য্য করিতে পারে? সকলেরই

দল চাই, আশ্রয় চাই। সংশয়ে হৃদয় আচ্ছন্ন হইল, ঈশ্বরকে ডাকিতে পারিলাম না, তখন উপায় কি? একাকী পাইয়া রিপু সকল প্রবল হইল। কাগজে প্রতিজ্ঞা লিখিলাম, আর কখনও তাহাদিগের আক্রমণে বশীভূত হইব না। কাগজে লিখিত প্রতিজ্ঞা কি কাম ক্রোধ বিনাশ করিতে পারে? কাগজে লেখা কাগজেই রহিয়া গেল। একাকী যুদ্ধ করিয়া সে জয়ী হয় নাই। সৈন্য একত্র করিয়া সেনাপতি তাহাকে ডাকিলেন, তাঁহার আজ্ঞা শ্রবণ মাত্র সে দলবদ্ধ হইল, দলবদ্ধ হইয়া বাঁচিয়া গেল। সহস্র কামান মুখব্যাদান করিয়া আছে, সেই পথে চলিয়া যাও, কিছু ভয় নাই। এই সকল রিপু একজনের উদ্যম উৎসাহ অগ্রাহ্য করিয়াছিল, এখন মত্ত দল দেখিয়া পলায়ন করিবে। একাকী দাঁড়াইয়া সহস্র চেষ্টা কর শত্রু ভ্রূক্ষেপও করিবে না। শত্রুই ভয় দেখাইবে, তুমি থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকিবে। শরীর মৃতপ্রায় কিছুমাত্র বল বা তেজ নাই। সেই রুগ্ন ম্লান শরীর লইয়া যোদ্ধাদিগের সঙ্গী হইলে, সৈন্যদল ভুক্ত হইলে, তখনই মৃত শরীরে নবজীবন লাভ করিবে; যুদ্ধের তুরী ভেরীর শব্দ শুনিয়া উৎসাহ প্রকাশ করিবে, সেনাপতির আজ্ঞা শ্রবণ মাত্র সমর সজ্জায় সজ্জিত হইবে, একটী মনুষ্যের ন্যায় একপ্রাণ হইয়া অগ্রসর হইবে। যে বলে আমার বল নাই, সেই মৃতকে সৈন্য মধ্যে ডাকিয়া আন। সৈন্যের সঙ্গে মিলিত হইয়া শত্রুর প্রতি ধাবিত হও। সেনাপতির সেনার সঙ্গে মিলিত হওয়া ভিন্ন জয় লাভের উপায় নাই। একাকী অরণ্যে গমন করিলে সামাজিক পবিত্র কর্ত্তব্য সাধন কিরূপে সিদ্ধ করিবে? কাম, ক্রোধ, অভিমান, অহঙ্কার, বিষয়ের প্রতি আসক্তি, ঈশ্বরের ক্রীত দাস হইয়া পড়িয়া থাকিলে বিদুরিত হয়,

কিন্তু ইহাতে এইরূপ সঙ্কেত অবলম্বন করা চাই। একাকী যাইলে পথে নাহি পরিত্রাণ। যুদ্ধের বস্ত্র পরিধান না করিলে হুঙ্কারে শত্রু তাড়াইতে পার না। যুদ্ধের বস্ত্র পরিধান করিলে নূতন বল লাভ করিবে। বস্ত্রভেদে ভাব ভেদ হয়। সেই সজ্জা সংস্পর্শ মাত্রে বলীয়ান্ হইবে, পূর্ব্বের দশ জন উৎসাহবলে এক শত জন হইবে। নূতন বেশে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে এমন আর কি থাকিবে যাহা সাধ্যাতীত? যদি অসম্ভব সম্ভব না হইল, তবে সে বল বল নয়। "ঈশ্বর" বলিতেই আমার সুখ হইবে, জ্যোতি বিকীর্ণ হইবে, শত সহস্র শত্রুকে ছেদন করিতে আমি সমর্থ হইব। যখনই শত্রু মারিতে আসিবে, তখনই বলিব "হে ঈশ্বর! আমি তোমারই।" মত্ত হস্তীর ন্যায় সমুদয় বিপদ অতিক্রম করিবে; এক বাণে সমুদয় রিপুকে জয় করিবে।

আজ বিশ বৎসর কত পুণ্য উপার্জ্জন করিলে, উপাসনা করিলে, কোন্ ব্রাহ্ম বলিতে পারেন সমুদয় রিপু দমন হইয়াছে? যদি দেখিতে পাই তাঁহার হৃদয় নির্ম্মল হইয়াছে, রিপু সকল পরাস্ত হইয়াছে, জীবনে সত্যরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা হইলে মানিব তাঁহার এত দিনের উপাসনা সরল উপাসনা। হে ভীরু, পৃথিবীর রাজ্যে অবস্থিতি করিয়া কি নির্ম্মল হইবে, রিপু সকলকে পরাজয় করিবে, আশা কর? হস্ত তোমার নিদ্রিত, তাহাতে কিছুমাত্র বল নাই। একবার এ রাজ্য ছাড়িয়া ঐ রাজ্যে যাও, দেখিবে ইঙ্গিতে সমুদয় কার্য্য সাধিত হইবে। একত্র হইবার বিধি এখনও তোমরা অবলম্বন কর নাই, একবার সেই বিধি পরীক্ষা করিয়া দেখ। তোমরা সকলে দলবদ্ধ হইয়া সাধন করিতে আরম্ভ কর,

দেখিবে সমস্ত পাপ চলিয়া যায় কি না? দলবদ্ধ হইয়া এতদিনের মধ্যে সমুদয় পাপ রিপু তাড়াইয়া দিব, এই প্রতিজ্ঞায় প্রাণপণ করিয়া সাধন আরম্ভ কর, ব্রাহ্মসমাজকে বীরসমাজ করিয়া তোল। দুরন্ত পাপরাক্ষস আমার মনে দুঃখ দিতেছে এই বলিয়া কাঁদিয়া ঈশ্বরের চরণ ধারণ কর, শত্রুকে অনায়াসে বিনাশ করিবে। সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া মনের মধ্যে যত রিপু আছে তাহাদিগকে বিনাশ না করিলে সুখ নাই, শান্তি নাই। শরীরের ভিতর শত্রু বসিয়া আছে, কোন প্রকারে আমাকে ছাড়িল না, এখন আর এরূপ অবস্থায় থাকিতে পারি না। এইজন্য সকলকে ডাকিতেছি। এখন অবিশ্বাস পাপ, ধ্যানভঙ্গ পাপ, ঈশ্বরে প্রেম ভক্তি করিতে না পারা পাপ। শাণিত অস্ত্র দ্বারা এই সকল পাপকে এখনই কাটিতে হইবে। রিপু সকলকে দমন করিয়া উপাসনা করিব। এরূপ না করিয়া উপাসনা করা এখন মহৎ পাপ, এ পাপে আর অবস্থিতি করিতে পারা যায় না। এস, ক্রন্দন দ্বারা পাপ জয় করিব। যদি এরূপ উপাসনা না কর, রিপুগণকে বুকে বাঁধিয়া যদি প্রার্থনা কর, "হে ঈশ্বর! আমাকে পাপ হইতে মুক্ত কর" তাহা হইলে উপাসনা পরিত্যাগ কর। যদি পাপ পরিত্যাগ করিতে চাও, যথার্থ বীরত্ব দেখাও। প্রেম-মদিরা পান কর, বীরবস্ত্র পরিধান কর, বীরবর্ণে মুখ রঞ্জিত কর, দক্ষিণে বামে যে দিকে তাকাইবে শত্রুগণ ভয়ে পলায়ন করিবে, বজ্রসম কঠোর তোমার হস্ত যে রিপুর উপরে পড়িবে, সেই মরিবে, রিপুগণ অনায়াসে দমন হইবে।

এখন তোমাদের যে উপাসনা হইতেছে, যে সাধনে তোমরা প্রবৃত্ত হইতেছ, তাহা গভীর হউক। একবার স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া

সেই রাজ্যে গিয়া দলবদ্ধ হও, দেখিবে তোমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। উপাসনার যোগ স্থাপন কর, প্রজাগণের মধ্যে অসম্মিলন চলিয়া যাউক। দাসত্ব স্বীকার করিয়া শরণাগত হও, রিপুগণকে অনায়াসে দমন করিতে পারিবে, পাপ কুসংস্কার অনায়াসে বিদায় করিয়া দিতে সক্ষম হইবে। একাকী যাহা করিতে পার নাই, এক শত একত্র হইয়া পাপ দমন কর, প্রতিজ্ঞা কর আর পাপ হৃদয়ে আসিতে দিব না। দশ দিন এইরূপে সাধন কর, শত্রুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হও, দেখিবে কিরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পন্ন হয়। যদি সেনাপতির আজ্ঞা না শুনিলে, বল তবে বল আসিবে কোথা হইতে? সেই স্বর্গীয় আজ্ঞা এক অগ্নির স্ফুলিঙ্গ, মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহাতে চিরসঞ্চিত পাপরাশি ভস্মীভূত হইয়া যায়। বৈরাগী হও, সর্ব্বত্যাগী হও, তোমার নিজের বিচার করিবার আর কিছু রহিল না। সেনাপতি যখন যাহা বলিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা অবিচারে করিবে। "এতক্ষণের মধ্যে তোমার সমুদয় পরিত্যাগ করিতে হইবে, বৈরাগীর বেশ ধারণ করিয়া দশটার মধ্যে এখানে উপস্থিত হইতে হইবে," যাই তিনি আদেশ করিলেন অমনই প্রস্তুত। বন, সমুদ্র, পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া যাইতে হইবে, কিছু জানি না। ধন মান ঐশ্বর্য্য ছাড়িতে বলিলেন ছাড়িলাম, আমি আর ভাবিব কেন? এ মস্তক সেনাপতির চরণে অর্পণ করিয়াছি, মস্তক দিতে চলিলাম তাহাতেই বা কি? সংসার, তোমার সঙ্গে আর তর্ক করিব না। প্রাণেশ্বর প্রাণকে টানিতেছেন, দশটা বাজিতে না বাজিতে যাইতেই হইবে। এস সকলে বৈরাগ্য বেশ পরিধান করি, চল সকলে একত্র মিলিত হইয়া যাই। ঢং ঢং করিয়া দশটা বাজিল, সেনাপতি প্রজ্বলিত অগ্নিময় বাক্যে আদেশ

করিলেন, চারিদিকে প্রকাণ্ড অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। প্রমত্ত হস্তীর ন্যায় বৈরাগী সাধকগণ সমুদয় ভুলিয়া চলিলেন, কোথায় চলিলেন জানেন না। তখন মুখের বর্ণ, হৃদয়ের ভাব কি এক আশ্চর্য্য বেশ ধারণ করিল বলিতে পারা যায় না। ঈশ্বর প্রত্যেকের মস্তকে হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। 'সেনাগণ সমস্ত দিন যুদ্ধ করিয়া সন্ধ্যার সময়ে সেনাপতির কাছে আসিল। সেনাপতি আনন্দমনে প্রত্যেকের হস্তে আনন্দ-রত্ন দিলেন। আমরা সকলে বীরের ন্যায় সমস্ত দিন যুদ্ধ করিব, যোগী হইয়া তাঁহার কাছে বসিব। যেমন উপাসনা তেমনই চিত্তশুদ্ধি, যেমন প্রেম তেমনই পবিত্রতা, যেমন বল তেমনই পাপদমনে ক্ষমতা। যুদ্ধের শাস্ত্র পাঠ করিতে আরম্ভ কর। বৈরাগী বীরের বেশে সমুদয় পাপ তাড়াইয়া দাও। সর্ব্বদা সেনাপতির আজ্ঞা পালন কর, আপনার মধ্যে দেশের মধ্যে সত্যরাজ্য সংস্থাপন করিয়া কৃতার্থ হও।

উপাসনা। *

রবিবার, ২৪শে শ্রাবণ, ১৭৯৭ শক; ৮ই আগষ্ট, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

ব্রহ্মরাজ্যের পথে উপাসনা-ব্রত, ব্রহ্মরাজ্যের নিকটে উপাসনা সুধা। ব্রত এইজন্য যে উপাসনা করিতে করিতে সেই রাজ্যে উপনীত হইব। যতদিন এই বিশ্বাস থাকে যে উপাসনা কেবল ব্রত, ততদিন প্রতিদিনের নিয়মিত উপাসনা সমাপ্ত হইলেই আমাদের ব্রত পালন হইল মনে করি; কিন্তু উপাসনা করিতে করিতে যখন উপাসনাতে আত্মার রুচি জন্মে, তখন দেখিতে পাই উপাসনা কেবল

ব্রত নহে; কিন্তু ঈশ্বরের চরণতলে আমাদিগকে বাঁধিবার জন্য ইহা একটী স্বর্গীয় কল। পাপ ভারাক্রান্ত দুঃখী সন্তানদিগকে স্বর্গে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য নির্লিপ্ত ঈশ্বর কি করেন? কতগুলি জাল বিস্তার করেন। সন্তানেরা ঐ সকল ধর্ম্ম-জাল, প্রেম-জাল, অথবা উপাসনা কলে পড়িল, আর মধ্য-বিন্দু-স্থিত পরমেশ্বর ক্রমাগত তাহাদিগকে টানিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ মনুষ্য স্বর্গের সুধা খাইতে চাহে না, কারণ তখন সংসারের সুখভোগেই সে প্রমত্ত, অতএব কর্ত্তব্যজ্ঞানে, ঔষধ সেবনের ন্যায় সেই মলিন সুখোন্মত্ত মনুষ্য প্রথমতঃ উপাসনা-ব্রত পালন করিতে থাকে; কিন্তু উপাসনা করিতে করিতে পূর্ব্বে যাহা ব্রত ছিল, সাধকের নিকটে তাহা সুধার পাত্র হইল। গুরু বন্ধু হইলেন, উপাসনার ভাবান্তর হইল। প্রথমাবস্থায় ভাল লাগুক আর না লাগুক, ঈশ্বরের দেখা পাও আর না পাও, নিয়ম বলিয়া ব্রত বলিয়া উপাসনা করিতেই হইবে। কিন্তু যেখানে পৌঁছিলে উপাসনার রসাস্বাদ পাওয়া যায়, সেখানে পড়িলে উপাসনাকে সুধা বলিয়া বর্ণনা করি। সেই আরাধনা, সেই ধ্যান, সেই প্রার্থনা, সেই সঙ্গীত; যখন উপাসনা-ব্রত ছিল, তখন তাহাদের প্রতি টান ছিল না, ব্রত টানিতে পারে না; কিন্তু যখন উপাসনা-রাজ্যের গভীরতর স্থানে নিমগ্ন হইলাম, তখন উপাসনা প্রাণকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। আগে মনে হইত উপাসনা সাঙ্গ হইলেই সেই দিনের কাজ শেষ হইল; কিন্তু যখন উপাসনার মধুরতা সম্ভোগ করিতে অধিকার পাইলাম, তখন দেখি, যখন উপাসনা সমাপ্ত হইল বলিলাম, তখন সেই সুধা পান আরম্ভ হইল মাত্র; সমস্ত দিন, সমস্ত সপ্তাহ, সমস্ত মাস, সমস্ত বৎসর, এবং অনন্ত জীবনেও তাহা শেষ হইবে

না। প্রথমাবস্থায় প্রাতঃকালে ব্রত বলিয়া উপাসনা আরম্ভ করিলাম, ব্রত বলিয়া তাহা শেষ করিলাম। পরে যখন সংসারের কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম উপাসনা যে করিয়াছিলাম প্রাণের মধ্যে তাহার কোন চিহ্ন দেখিলাম না।

যতদিন উপাসনাতে প্রাণ মজিয়া না যায় ততদিন এই দুরবস্থা থাকে; কিন্তু যখন মাদক দ্রব্য সেবনের ন্যায় উপাসনা দ্বারা নেশা আরম্ভ হয়, তখন উপাসনা সমাপ্ত হইলেই সেই দিনের কার্য্য শেষ হয় না; কিন্তু সেই উপাসনার ফল অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। উপাসনা শেষ হইল, কিন্তু তাহার ফল সমস্ত দিন ভোগ করিতে লাগিলাম। বাস্তবিক যতদিন উপাসনা কেবল ব্রত থাকে, ততদিন প্রাতঃকালের উপাসনার সময় যেমন ঈশ্বরের ভাবে মন পূর্ণ থাকে, সমস্ত দিন তেমন আর সেই ভাবটী থাকে না। এই অবস্থায় উপাসনার অব্যবহিত পরেই সংসার সেই দুর্ব্বল প্রাণকে আক্রমণ করে, এবং সেই দুর্ব্বল আত্মা প্রলোভনে পড়িয়া পাপের দিকেও চলিয়া যায়। এই অবস্থাতেই ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও অনেকে বলেন, উপাসনার ভাব সমস্ত দিন থাকে না। যাঁহারা বাঁচিয়া যাইতে চাহেন এই উপাসনা লইয়া তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। সেই ভাবের উপাসনা তাঁহাদের আবশ্যক, যাহা দ্বারা আত্মার ভিতরে একটী স্বর্গীয় নূতন জীবন আসিয়া, পুরাতন মনুষ্যকে একেবারে বিনাশ করিয়া ফেলে এবং যখন সাধক বুঝিতে পারেন যে, আমার ভিতরে আর আমি নাই। এই অবস্থায় সাধকের নিকট প্রলোভন পাপ সকলই মিথ্যা, কিছুতেই তাঁহার মনকে ভুলাইতে পারে না। যে প্রাণ পাপের সুখে মত্ত হইত,

সেই প্রাণ ঈশ্বর কাড়িয়া লইয়াছেন। প্রলোভন আর বিচলিত করিবে কাহাকে? কিন্তু যতদিন প্রাণ এই ভাবে ঈশ্বরের প্রেমে মত্ত না হয়, ততদিন মনুষ্য হয় ত তাহার মনোমত খুব ভাল উপাসনা করিল; কিন্তু উপাসনান্তে যাই কার্য্য করিতে গেল, আবার তাহার সেই গুপ্ত পাপগুলি দেখা দিল। অতএব ইহা সত্য কথা নহে যে, ভাল উপাসনা হইলেই সমস্ত দিন ভাল যায়। যদি সমস্ত দিন ভাল থাকিতে চাও, তবে সেখানে যাও যেখানে সুরার দোকান, তাঁহার নিকটে যাও যিনি সুরা ঢালিয়া দেন, একবার প্রাণ ভরিয়া সেই সুরা পান করিয়া লও, দেখিবে পান করিতে করিতে নেশা আরম্ভ হইল। সুরাপান সমাপ্ত হইল তথাপি সেই নেশা আর যায় না, তাহা আরও বাড়িতে লাগিল; আর সুরাপান করিতেছ না, কিন্তু সুরাপানের ফল মত্ততা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সমস্ত দিন উপাসনা করি না; কিন্তু প্রাতঃকালে একবার যে সেই প্রেম-মদিরা পান করিয়াছিলাম, তাহাতে প্রাণ মন কেমন মত্ত হইয়া রহিয়াছে; সমস্ত দিন বুঝিতেছি যেন ঈশ্বর চারিদিকে, যে দিকে দেখি সেই দিকে তিনি, তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কিছুই করিতে পারি না। দেখি এক প্রমত্ততার রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি, সেই নেশা আর যায় না।

ভক্ত জানেন নেশা কি বস্তু। নির্ব্বোধ ভক্ত তুমি কি জান না প্রেম-সুরার কত বল? ভক্ত একবার সেই সুরা পান করিলেন, আবার বলিলেন প্রেমময়, আর একবার ঐ অমৃত ঢালিয়া দাও। ঈশ্বর আরও অমৃত ঢালিতে লাগিলেন, ভক্ত পান করিতে করিতে একেবারে অচেতন বিহ্বল হইলেন। তাঁহার ধ্যান,

আরাধনা, প্রার্থনা সকলই মিথ্যা, সকলই তাঁহার চাতুরী, সুরাপান করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তাঁহার ধ্যান, উপাসনা, এবং ইহকাল পরকাল সকলই কেবল সুরাপান; সকল প্রকারে স্বর্গের সুধাস্বাদ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। লোকে বলে, আজ অমুক ব্যক্তি উপাসনা দ্বারা পবিত্র হইয়াছে, উপাসনা দ্বারা অমুক ব্যক্তির শুষ্ক প্রাণে জীবে দয়ার সঞ্চার হইয়াছে। কিন্তু ভক্ত ভক্তকে চেনে, ভক্ত জানে যে পবিত্রতা, দয়া এ সকল কিছুই নহে, আসল কথা সুরাপান করিয়া মত্ত হওয়া। ভক্ত সেই যে একবার সুরাপান করিয়া লইল, তাহাতেই সমস্ত দিন প্রেম-সাগরে মত্ত থাকিবে। সংসার শত সহস্র প্রলোভন আনিয়া উপস্থিত করিবে, লোকে তাঁহার নিকট টাকা রূপা সোণা আনিবে, কিন্তু ভক্ত সে সকল দেখিয়া উপহাস করিবে। মাতাল হইয়াছে যে ঈশ্বরের প্রেম সুধাপানে, সংসার তাহাকে কি সুখ দেখাইয়া ভুলাইবে? বিপদ যাহার কাছে সম্পদ, মৃত্যু বিভীষিকা তাহার কি করিতে পারে? সাধক! তুমি যদি এই সুধাপানে উন্মত্ত হইতে পার আর তোমার ভয় নাই। যাঁহারা এই সুধাপানে মত্ত হইয়াছেন তাঁহারা অভয়পদ পাইয়াছেন, এই সুধার এমনই গুণ যে ইহা পান করিলেই মানুষ পাগল হয়। ইহার স্বভাবই মত্ত করা, এই দ্রব্যের গুণেই মত্ততা হয়। তবে যে আমরা দেখি পাঁচ ঘণ্টা উপাসনা করিলেও কাহার মন মত্ত হয় না, আবার উপাসনা আরম্ভ করিবা মাত্র কাহারও প্রাণ প্রেমরসে মজিয়া যায়, তাহার কারণ এই, একজন সুধাপান করিতে জানে না, আর একজন সহজেই এই সুধাপান করিতে সক্ষম হয়।

বাস্তবিক উপাসনা করিতে করিতে সেই যে স্বর্গীয় মত্ততা হয় তাহাই

প্রকৃত উপাসনা। সেই মত্ততার ব্যাপার উপাসনার পরেও ভিতরে ভিতরে প্রাণকে একেবারে আচ্ছন্ন করিতে থাকে। এই প্রমত্ততাই কেবল সংসার এবং ধর্ম্মের সামঞ্জস্য করে। আমি নিশ্চিতরূপে বলিতেছি এই প্রমত্ততা ভিন্ন কেহই সংসার এবং ধর্ম্মকে এক করিতে পারিবে না। ব্রহ্ম-সহবাস-সুখ কি সুখ ভক্তেরা অন্তরে অন্তরে তাহা জানে, তাই চতুরের ন্যায় জগৎকে ফাঁকি দিয়া তাহারা দিবানিশি সেই আমোদ সম্ভোগ করে। জগৎ দেখিয়া শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলে, ইহারা ভক্ত হইয়াছে, ইহারাও খায়, কার্য্যালয়ে যায় যথার্থ; কিন্তু ইহাদের প্রাণ ব্রহ্ম-মদে মত্ত হইয়া রহিয়াছে। তোমার আমার মত্ততা হয় ত এক ঘণ্টা নয় পাঁচ ঘণ্টা থাকে; কিন্তু যে ভক্ত অভয়পদ পাইয়াছেন তাঁহার মত্ততা এক উপাসনা হইতে অন্য উপাসনা পর্য্যন্ত স্থায়ী। স্বর্গের সুরা পান করিয়া ভক্তের এমনই নেশা হয় যে, আর তিনি সংসারের কোলাহল শুনিতে পান না। ধন, মান, সুখ্যাতি, টাকা কড়ি, সুখ, সম্পদ ইত্যাদি পৃথিবী লইয়া, কিন্তু তাঁহার কাণের কাছে চীৎকার কর, তিনি শুনিতে পাইবেন না; কেন না তিনি প্রেমে মাতাল হইয়া ভিতরে ভিতরে এমনই ডুবিয়া রহিয়াছেন যে, বাহিরের কিছুই আর গ্রাহ্য হয় না। তাঁহার শরীর মাতালের শরীরের ন্যায় পড়িয়া আছে; কিন্তু ভক্ত অনেক দিন হইল চলিয়া গিয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন? পৃথিবী বুঝিল না। পৃথিবী কাণের কাছে গিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, উঠ, টাকা আনিয়াছি, সুখ আনিয়াছি; কিন্তু কে শুনিবে? ভক্ত যে সে ঘরে নাই। সেই ঘরের দ্বারে আঘাত করিলে কি হইবে? শুনিবে যে, সে যে মাতাল হইয়া অচেতন হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রকার

প্রমত্ত বৈরাগী ভক্ত যিনি তিনি এই বাহিরের ঘর ফেলিয়া চলিয়া যান। সেই ঘরটী কিন্তু সংসারে থাকে। ইহা কর্ম্মচারী, যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আপনার কাজ করে। শরীরটা পৃথিবীতে আপনার কাজ করিতেছে, কিন্তু আসল আত্মা ভক্ত যিনি তিনি ঘরে নাই, পৃথিবী তাঁহাকে দেখিতে পায় না, তাঁহাকে ধরিতে পারে না, তিনি পৃথিবী ছাড়িয়া অনেক দূর চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার হস্ত পদ পৃথিবীতে কার্য্য করিতেছে; কিন্তু তাঁহার প্রাণের মধ্যে পৃথিবীর কোন সুখের স্পৃহা নাই, কোন লালসা নাই। যে প্রাণ ব্রহ্মসুরা পানে মত্ত, পৃথিবী কি আর তাহা ছুঁইতে পারে? যতই উপাসনা করেন ততই ভক্তের প্রাণ প্রমত্ত হয়। মত্ততার উপাসনার পর আবার উপাসনা করিলেন, ভক্ত দেখিলেন তাঁহার প্রাণ এবার আরও দশ হাত গভীরতর প্রেমহ্রদে, মত্ততাহ্রদে নিমগ্ন হইল। যদি ভক্তের জীবন ধারণ করিতে চাও, তবে এইরূপে দিন দিন প্রমত্ততা বৃদ্ধি করিতে হইবে। এই প্রমত্ততা ভিন্ন ভক্তের আর কিছুই ভাল লাগে না; কিন্তু এই সুরারাজ্যে, এই প্রমত্ততার অবস্থায় প্রমত্ত ভক্তের কেবল একটী বিষয় ভাল লাগে। তাহা এই যে, আরও কতকগুলি লোক এই সুধারস পানে প্রমত্ত হইয়া পরস্পরের প্রমত্ততা বৃদ্ধি করুন। এস উপাসনা করিতে করিতে আমরা সেই মত্ততা সঞ্চয় করি। দেখিব আমাদের মাথার উপর দিয়া মাস বৎসর চলিয়া গেল; কিন্তু আমাদের প্রমত্ততা ফুরায় না। এস, সকলে মিলিয়া সুরার দোকানে সুরা ক্রয় করি, এই সুরা পান করিয়া সকলে বিহ্বল হই। সমস্ত দিন এই সুরা ভিন্ন আর কোন সামগ্রী ভাল লাগিবে না। উপাসনাকে আর কঠোর

ব্রত মনে করিও না, উপাসনাকে সুধা কর, এবং সেই সুধাপানে সকলে প্রমত্ত হও।

গণ্ডীর বাহিরে যাওয়া।

মাসিক সমাজ, প্রাতঃকাল, রবিবার, ৩১শে শ্রাবণ, ১৭৯৭ শক ;
১৫ই আগষ্ট, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

জগৎ বিঘ্নময় স্থান বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। কি প্রাচীন, কি আধুনিক, সকল দেশের এবং সকল কালের ভক্ত সাধকেরাই এই পৃথিবীকে বিঘ্নময় স্থান বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। এই সুবিস্তীর্ণ ভয়ের রাজ্য মধ্যে এক হস্ত স্থান আমাদের পক্ষে নিরাপদ। অভয় এক হস্ত পরিমাণ স্থানে, আর ভয় সমুদয় পৃথিবীতে। যদি নিরাপদে থাকিতে চাও, তবে সেই স্থানটুকু অধিকার করিয়া থাকিবে। যদি অভেদ্য প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করিয়া সেই এক হস্ত পরিমাণ স্থান মধ্যে দুর্ব্বল ভীরু আত্মাকে রাখা যায় তাহার ভয় নাই। অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ স্থান, তন্মধ্যে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করা যায় না। সেই স্থানটী কি তাহা জানিবার জন্য সাধক ব্যাকুল। যে স্থান-টুকুর মধ্যে বসিয়া আমরা ঈশ্বরের উপাসনা করি, ইহা সেই স্থান। যতক্ষণ "সত্যং" বলিয়া আরম্ভ করিয়া সাধক উপাসনা করেন ততক্ষণ তাঁহার মনের ভিতরে সমুদয় সাধুভাব প্রস্ফুটিত হয়। যতক্ষণ অতি গম্ভীর ভাবে তিনি সেই স্থানে বসিয়া থাকেন, তিনি নির্ভয়, নিরাপদ। কিন্তু যাই গণ্ডীর অর্দ্ধ হস্ত বাহিরে আসিলেন, দেখিলেন সেখানে আর একটী রাজ্য, সেখানকার বিধি শাসন সকলই

স্বতন্ত্র, সেখানে অনেক কষ্ট, চেষ্টা করিয়া হয় ত ইন্দ্রিয় শাসন করিতে পারেন ; কিন্তু সেই নিরাপদ রাজ্যে আর তিনি নাই। সেই উপাসনা-স্থানে যতক্ষণ ঈশ্বরের নাম করিবে, ততক্ষণ নিরাপদ। এ কথা বলিতে পার না, উপাসনাগণ্ডীর মধ্যে বসিলেই একেবারে আত্মার গভীরতম স্থান নির্ম্মল হইয়া গেল ; কিন্তু সেই দাগের মধ্যে স্বর্গ আসিয়া অবতীর্ণ হয়। সেই স্থান পৃথিবী নহে। সেই স্থানে বসিলেই, বিঘ্নময় জগৎ, অরণ্য সমান সংসার, তোমার নীচে পড়িয়া রহিল। সেইথানে যতক্ষণ বসিতে পার ততক্ষণ লাভ। আমাদের সৌভাগ্য যে এই পৃথিবীর মধ্যে অন্ততঃ এক হস্ত স্থানও পাওয়া যায় যাহাকে স্বর্গ বলিতে পারি। সেই স্থানটুকু শুদ্ধ।

দয়াল নাম প্রতিষ্ঠিত হও, সত্যং জ্ঞানমনন্তং প্রতিষ্ঠিত হও, সাধকের এই সকল মন্ত্র পাঠ দ্বারা সেই স্থান পবিত্র হইল। সেই স্থানে ঈশ্বরের জন্য বসিয়াছ ঈশ্বর তাহা বুঝিলেন। সেই স্থানে মন চঞ্চলতাবিহীন। মনের সেই গাম্ভীর্য্য, সেই একাগ্রতার ভিতরে ঈশ্বর আসিয়া তাঁহার কার্য্য করিয়া লইলেন। সেই স্থানটুকু তোমার স্থান, আর এই শত শত ক্রোশ স্থান তোমার নহে। এইটুকু স্থানের ভিতর যখন বসিলে তখন ঈশ্বরের আদেশ, প্রত্যাদেশ স্রোতের ন্যায় তোমার আত্মার মধ্যে আসিতে লাগিল। সেই স্থান হইতে তুমি পাপ বিদায় করিয়া দিলে, ঈশ্বর তাহা স্বর্গের নিয়মাধীন করিয়া লইলেন। সেই স্থানে বসিয়া যখন সাধক ঈশ্বরের দিকে তাকাইলেন, দেখিলেন "সকল পবিত্র হইয়াছে, যে দিকে দেখেন, সেই দিকেই ঈশ্বর, চারিদিক শুদ্ধ, চারিদিক মধুময়।" এমনই এক হস্ত পরিমিত স্থানের মাহাত্ম্য, এমনই সেই স্থানের গুণ যে, এখানে

বসিলেই আত্মা সকল বস্তু হইতে মধু আহরণ করে। পৃথিবীতে দৈত্য, দানব, রাক্ষস, প্রলোভন, বিপদ আছে; কিন্তু সেই গণ্ডীর বাহিরে তাহাদের অধিকার। তাহারা এই গণ্ডীর ভিতর হইতে কোন সাধককে লইয়া যাইতে পারে না। সাবধান! বাহিরে গেলেই মারা যাইবে। যদি অত্যন্ত দুর্ব্বল হও, আরও দৃঢ় হইয়া ঐ গণ্ডীর মধ্যে বসিয়া থাক। পৃথিবীর শত্রুরা কথনও সেই স্থানে যাইতে পারে নাই, কথনও যাইতে পারিবে না। চিরকালই ঈশ্বরের আজ্ঞা দ্বারা সেই স্থানে তাহাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ রহিয়াছে। যদি চিরকাল সেই স্থানে থাকি তবে অভয় থাকিব; কিন্তু নির্ব্বোধ মনুষ্য বাহির হয়।

তোমরা রামায়ণের আখ্যায়িকায় শুনিয়াছ সীতা যতক্ষণ গণ্ডীর মধ্যে ছিলেন, ততক্ষণ দুর্দ্দান্ত রাবণ তাঁহাকে ছুঁইতে পারে নাই; কিন্তু যাই সীতা গণ্ডী হইতে বাহির হইলেন, তিনি শত্রু কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলেন। তোমার চরিত্র সীতার ন্যায় নির্ম্মল; কিন্তু তুমি যদি গণ্ডীর বাহিরে যাও নিশ্চয়ই শত্রু তোমাকে বধ করিবে। গণ্ডীর বাহিরে সেই দুর্দ্দান্ত রাবণ তোমাকে ধৃত করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। প্রাণ যদি রক্ষা করিতে চাও, ঐ গণ্ডীর মধ্যে পড়িয়া থাকিবে। ঈশ্বর যেখানে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিয়াছেন, সেই স্থান নিরাপদ। এই চিহ্নিত নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া থাকি, শত্রু সহস্র প্রলোভন বিভীষিকা দেখাক্ না কেন, কিছুতেই কৃতকার্য্য হইবে না। ঐখানে আমি অটল পর্ব্বতের ন্যায় স্থির হইয়া থাকিব। এক চুল মাত্র ব্যবধান; কিন্তু দেখ দৈত্য রাবণ এখানে সাহস করিয়া আসিয়া তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। অতি সাধু যাঁহারা

তাঁহাদিগকেও এই গণ্ডীর বাহিরে দৈত্য ধরিবে, দৈত্য ইহার চারিদিকে ফিরিতেছে। পৃথিবীর এমনই মোহিনী শক্তি আছে যে ঐ গণ্ডীর বাহিরে পাইলেই, তোমাকে ধরিয়া ফেলিবে। তুমি ধর্ম্ম পালনের জন্য ভিক্ষা দিতে যাইতেছ; তুমি সাধক মধ্যে পরিগণিত, শুদ্ধ দয়াব্রত সাধন করিতে তুমি কেবল ভিখারীকে ভিক্ষা দিতে যাইতেছ; কিন্তু যাই তুমি গণ্ডীর বাহিরে গিয়াছ, তৎক্ষণাৎ তোমাকে পাপ-রাক্ষস ধরিয়া ফেলিল। অতএব বলিতেছি, পরোপকার করিতে গণ্ডীর বাহিরে যাইও না। তুমি মনে করিতেছ, একজন ভিক্ষুক তোমার দয়ার প্রতীক্ষা করিতেছে; কিন্তু সে ভিক্ষুক নহে, সে ভিক্ষুকবেশে দৈত্য রাক্ষস। তুমি উপাসনা ছাড়িয়া দয়া করিতে গেলে, ভিক্ষুককে অন্ন দিতে গেলে, পরোপকার করিতে গেলে, কিন্তু আপনার সর্ব্বনাশ করিলে।

সীতার আখ্যায়িকা পাঠ করিলে আমাদের অনেক শিক্ষা হইবে। গণ্ডীর ভিতরে থাকিয়া ভীরু আত্মা দৈত্যদিগের ভয়ে হয় ত এক একবার প্রাণেশ্বর, বিপদকালে কোথায় রহিলে, প্রাণেশ্বর, বিপদকালে কোথায় রহিলে, এবার বুঝি গেলাম, এইটুকু স্থানের এ দিকে যদি দৈত্যরা হাত বাড়ায় মরিব; কিন্তু ঈশ্বরের আজ্ঞায় দৈত্যরা ঐ গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সাধককে ধরিতে পারিবে না। গণ্ডীর বাহিরে একটা না পাঁচটা দৈত্যও যদি দশ মুণ্ড লইয়া ভয় দেখায়, তথাপি সাধকের ভয় নাই; কিন্তু দেখ রাবণ যখন আপনার মূর্ত্তি ছাড়িয়া দয়া উদ্দীপন করিবার জন্য ভিখারীর বেশ ধারণ করে, যখন ভয়ঙ্কর ভাব পরিত্যাগ করিয়া প্রলোভনমূর্ত্তি গ্রহণ করে, তখনই সর্ব্বনাশ। ছদ্মবেশী রাক্ষসকে যদি ভিখারী মনে করি তাহা হইলেই

আমাদের মৃত্যু। যদি মনে করি কেবল উপাসনার গণ্ডীর মধ্যে থাকিলে চলিবে কেন, স্ত্রী পুত্র, ভাই, ভগ্নী দুঃখ পাইতেছে, তাহাদের দুঃখ মোচন করা আমাদের কর্ত্তব্য; যেমন ঈশ্বরকে পূজা দিব তেমনই তাঁহার এ সকল প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে হইবে। এই প্রিয় কার্য্য সাধনই কারণ। এই আমাদের মরণের কারণ, ইহাতেই আমাদের সর্ব্বনাশ হয়। এই যে লোকে বলে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কতক্ষণ পূজা করিবে? সেবা করিবে কখন? প্রভুর প্রিয় কার্য্য সাধন করিবে কখন? ইহাতেই সীতা হরণ হয়। গণ্ডীর অর্দ্ধ হস্ত বাহিরে গেলে কেবল যে তোমার অনধিকার চর্চ্চা হয় তাহা নহে, কিন্তু তাহাতে নিশ্চয় পতন। সেই গণ্ডীর মধ্যস্থিত এক হস্ত পরিমাণ স্থান ভিন্ন এই বিঘ্নময় জগতে আর তোমার স্থান নাই। অন্য স্থান বিষ, তোমার পক্ষে মৃত্যু, শ্মশান। ঐ গণ্ডীর মধ্যে বসিয়া দয়াল দয়াল বল, প্রভুকে বল, আমি বাহিরে যাইব না, সেখানে রাবণের ভয়।

এইরূপে যতই দয়াল দয়াল বলিয়া তাঁহার চরণতলে পড়িয়া থাকিবে, ততই উপাসনার স্থানের প্রতি অনুরাগ হইবে। যদি কোন আসন শিরোধার্য্য থাকে তাহা উপাসনার স্থান। প্রতিজ্ঞা কর এই তীর্থস্থান হইতে যাইব না, এই তীর্থস্থানে বসিয়া চিরকাল ঈশ্বরের পূজা করিব, ঈশ্বরকে সম্ভোগ করিব। এই স্থানের বাহিরে যাইব না, কেন না বাহিরে গেলেই শত্রুরা আক্রমণ করিবে। তোমরা বলিবে ঈশ্বরের উপাসনা শেষ হইল, এখন চল অমুক দেশের উপকার করিতে যাই; তোমাদের ইচ্ছা হয় যাও, আমি যাইতে পারি না, আমি সেখানে গেলেই মরিব। আমি উপাসনা করিতে আসিয়াছি, উপাসনা করিব। এই উপাসনা-গণ্ডী ছাড়িয়া এক

চুল এদিক ওদিক যাইব না। এখানে বসিয়া থাকিলে আমার নিশ্চিত মঙ্গল হইবেই হইবে। অতএব সাধক! অতি সুন্দর স্থানও যদি দেখিতে পাও, তথাপি এই সঙ্কীর্ণ স্থান ছাড়িয়া যাইও না; আর যদি অতি সুন্দর বেশ ধরিয়া ভিখারী আসে, তথাপি এই গণ্ডী ছাড়িও না। কেমন সুখের স্থান সেইটী যেখানে বসিয়া প্রাণারামের সঙ্গে থাকি। এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে গেলে কল্পনা করিতে পার, একটু স্ফূর্ত্তি হয়, একটু স্বাধীনতা হয়; কিন্তু এই দাগের মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া হস্ত পদ বন্ধ করিয়া রাখিলে আত্মার হস্ত পদ সঞ্চালিত হইবে। চক্ষু, কর্ণ, রসনা, হস্ত পদ সকলই ভিতরে গেলে, ভিতরের রাজ্য খুলিয়া যাইবে। সেই গণ্ডীর ভিতরে সেই এক হাত স্থানে শরীরকে রাখিতে প্রথমতঃ কষ্ট হয়, কিন্তু আত্মা শীঘ্রই ভিতরের দিকে যাইয়া, অন্তরাকাশের নব নব গ্রহ তারা আবিষ্কার করিয়া ধর্ম্মরাজ্যের জ্যোর্তিষ-শাস্ত্র রচনা করে। সেইখানে ক্রমাগত আত্মা নূতন নূতন সত্য লাভ করে, নূতন নূতন শব্দ শুনিতে পায়, এবং ক্রমাগত বিস্তীর্ণ ধর্ম্মরাজ্যে বিচরণ করে। আত্মা এই নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিয়া বাঁচিল, হৃদয়ের ভিতরে হৃদয়নাথকে পাইল, প্রাণের ভিতরে প্রাণারামকে লাভ করিল। প্রভুর কৃপায় অনেক রাজ্য পাইলেন জানিয়া সাধক কৃতার্থ হইলেন। অতএব সেই এক হস্ত পরিমিত নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া, সেই নূতন রাজ্যে প্রবেশ কর, যেখানে নূতন বল নূতন আনন্দ পাইয়া কৃতার্থ হইবে।

উপাসনায় মত্ততা।

সায়ংকাল, রবিবার, ৩১শে শ্রাবণ, ১৭৯৭ শক;
১৫ই আগষ্ট, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

ঈশ্বরের কথা ভক্ত সাধক এই পৃথিবীতে শুনিতে পান কি না যদি এমন কথা জিজ্ঞাসা কর, ইহার উত্তরচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিব, ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের কথোপকথন ফুরায় কি না? ঈশ্বর যে কথা কন তাহার বিরাম আছে কি না? ঈশ্বর কথা কন এ বিষয়ে সন্দেহ করিলে নাস্তিকতার পরিচয় দেওয়া হয়। এখন প্রার্থনাও জানি না, আরাধনা ধ্যানও জানি না, সঙ্গীত জানি না; এখন জানি কেবল ঈশ্বরের কাছে গিয়া তাঁহার রূপ দেখা, তাঁহার কথা শুনা, তাঁহার অমৃত পান করিয়া মত্ত হইয়া আসা। এখন মন আর কিছু চাহিতে ইচ্ছা করে না। একবার যাইব, প্রার্থনা করিব, দুইটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া আসিব। যাহারা কেবল গুরুর কাছে যায়, রাজার কাছে যায়, তাহারা এরূপ করে, ভক্ত এরূপ করেন না। ভক্ত ভাবেন চব্বিশ ঘণ্টা কেমন করিয়া যাইবে। এই যে এতক্ষণ বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা সহ্য করিব ইহার দাম দেয় কে? সমস্ত দিন প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব, আবার চব্বিশ ঘণ্টা পর সকলে মিলিয়া সূর্য্যোদয় হইলে প্রাতঃকালে ঈশ্বরকে দেখিব। ভক্তের প্রাণ এই বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারে না। একবার উপাসনা করিল, উপাসনা করিতে করিতে মন মত্ত হইয়া গেল। প্রথমে সে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আধ ঘণ্টা উপাসনা করিয়া আর সমস্ত সময় সংসারের কর্ম্ম করিত; কিন্তু এখন দেখি সে ব্যক্তি সর্ব্বত্যাগী ভক্ত হইয়াছে,

প্রেমিক হইয়াছে, মাতাল হইয়াছে। অন্য লোক পুস্তক পড়ে পৃথিবীর অজ্ঞানতা দূর করিবার জন্য; কিন্তু সেই লোক কেবলই সুরার দোকানে পড়িয়া আছে। যদি পড়ে, মত্ততার পুস্তক পড়ে। পৃথিবীর লোক কত বিচিত্র সুন্দর সঙ্গীত শুনিতেছে; কিন্তু সে ব্যক্তি মত্ততার রূপ এবং মত্ততার কথা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে শুনিতে পায় না; এ ব্যক্তি মত্ততার মধ্যে পড়িয়াই আছে; একবার নয়, দুইবার নয়, মুসলমানদিগের ন্যায় পাঁচ বারও নয়, কিম্বা দশ বারও নয়; একটা নিয়ম থাকুক, কিন্তু এ পাগল সর্ব্বদাই কেবল এদিক ওদিক তাকাইতেছে, কখন ঈশ্বরের কাছে বসিবে। এর একটা নিয়ম নাই, সময় নাই দিন রাতই মত্ত হইয়া রহিয়াছে।

বাস্তবিক ভক্ত, যিনি ঈশ্বরকে সখা বলিতে শিখিয়াছেন, তিনি ঈশ্বরকে ছাড়িয়া কি সুস্থির হইতে পারেন? যদি ঈশ্বরও ভক্তকে জিজ্ঞাসা করেন, এখন উপাসনার সময় নহে, এখন কেন তুমি আমার কাছে আসিলে? ভক্ত বলেন আমি আর তোমাকে না দেখিয়া বাঁচিতে পারি না। ভক্তের মুখে এই কথা শুনিয়া ভক্তবৎসলও বলেন, বৎস সাধক! তুমি ধন্য আমার প্রতি তোমার এত টান! অন্যান্য সাধকেরা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আধ ঘণ্টা উপাসনা করিয়া মনে করিল, ঈশ্বরের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইল। কিন্তু যথার্থ ভক্ত যে উপাসনা করেন তাহাকে প্রার্থনা আরাধনা বলিতে পারি না, কথোপকথন বলিতে পারি। উপাসনার অতি উচ্চ অবস্থা এই। পৃথিবীতে বাণিজ্য কোলাহলের রোল; ভক্ত বলেন আমি আমার পিতার আনন্দবাজারে গিয়া স্বর্গের সামগ্রী ক্রয় করি। পৃথিবীতে অন্যান্য লোক বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া আমোদ

করিতেছে ; ইহা দেখিয়া ভক্ত বলেন অসার বন্ধুকে ডাকিয়া কি হইবে, আমার ত একজন পরম বন্ধু আছেন তাঁহাকে লইয়া আমি আমোদ করি। তিনি বলেন, প্রেমসুরা পান করিতে মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তাই প্রেমময়, কাছে আসিলাম। ভক্ত দেখিলেন পৃথিবীর কর্ম্মক্ষেত্রে কত লোক উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছে, তিনি মনে মনে বলিলেন আমার প্রভুর মুখের কথা শুনিয়া তাঁহার কাজ না করিলে ত আমার নিস্তার নাই। পৃথিবীতে একজন বহি পড়িতেছে, ভক্ত মনে করিলেন আমারও একখানি শাস্ত্র আছে, একটী পুস্তকালয় আছে, সেই শাস্ত্র স্বয়ং ঈশ্বর, সেই পুস্তকালয় স্বয়ং ঈশ্বর। অন্যকে বহি পড়িতে দেখিয়া তিনি তাঁহার ঈশ্বর-শাস্ত্র পড়িতে লাগিলেন।

এইরূপে ভাব-যোগ-বিধি দ্বারা অন্য লোক যাহা করে ভক্তও তাঁহার প্রাণেশ্বরকে লইয়া তাহার অনুরূপ কার্য্য সম্পন্ন করেন। তিনি দেখেন মানুষ জনসমাজে যায়, তিনি বলিলেন আমি ত অরণ্যবাসী বৈরাগী নহি, এই যে সমস্ত জগৎ আমার প্রাণবিন্দু মধ্যে। এইরূপে কেবলই নানা প্রকার কৌশল এবং উপলক্ষ খুঁজিয়া ভক্ত ঈশ্বরের নিকট যাইতেছেন। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া থাকিবার ভক্তের অবকাশ নাই। পৃথিবী জিজ্ঞাসা করিল, অমুক ভক্ত সেই যে কয়েকদিন হইল ঈশ্বরের সঙ্গে বসিয়া আছেন, কেন ফিরিলেন না? ভক্ত অবশ্য হয় ত পরলোক সম্পর্কে কোন নিগূঢ় তত্ত্ব নতুবা কোন গূঢ় প্রেমতত্ত্ব লইয়া ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথন করিতেছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, এতক্ষণ সে লোকটা কি করে? এত সময় কাটে কিরূপে? আমরা কত কাজ করি, কত

বহি পড়ি, তবু দিন কাটে না, এ ব্যক্তি ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া কি করে? আমাদের প্রাণ দুই ঘণ্টা উপাসনা হইতে না হইতে হাঁপ হাঁপ করে, এবং শেষ গানটী প্রতীক্ষা করে; কিন্তু এ কি আশ্চর্য্য, এ ব্যক্তির শেষ গান প্রথম গান, ইহার নিকট উদ্বোধন আর শেষ হয় না। এ সর্ব্বদাই স্নান করিতে যাইতেছে, ইহার স্নান করা আর ফুরায় না। ব্রহ্মরাজ্যে এমন কি শাস্ত্র আছে, যাহা পাঠ করিতে করিতে ফুরায় না? আমাদের বিশেষ কোন ধর্ম্মশাস্ত্র নাই। যাহাদের ধর্ম্মপুস্তক আছে, তাহা শীঘ্র ফুরাইয়া যায়, মনুষ্যের উপদেশ ফুরাইয়া যায়, তবে ব্রাহ্মদিগের এমন কি শিখিবার আছে যে পাঠ শেষ হয় না? ভক্ত বলেন, শিখিবার নাই কে বলিল? আমরা কি স্বর্গে যাইয়া নিদ্রা যাই? সেই স্বর্গের ঘরে পরম শাস্ত্রী ঈশ্বর স্বয়ং শাস্ত্র পাঠ করিতেছেন, শিষ্য গলবস্ত্র হইয়া ক্রমাগত শুনিতেছেন। এইজন্য ঈশ্বরের কথা ভক্ত এই পৃথিবীতে শুনিতে পান কি না, এই প্রশ্নের উত্তরচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিতেছি, ঈশ্বর যে ভক্তের সঙ্গে কথা কন তাহার সমাপ্তি আছে কি না?

ভক্তবৎসল তাঁহার সাধককে কত নূতন কথা বলিতেছেন, কত নূতন কথা বলিবেন কে তাহা জানে? পনের বৎসর সাধনের পর ভক্ত তাঁহার ঈশ্বরকে বলিলেন, সদানন্দ গুরু! কি দেখাইলে! কি শুনাইলে! পনের বৎসর এই নূতন ঘর ত দেখি নাই, এমন পদ্মফুল্ল শোভিত সরোবর ত আর দেখি নাই! হে দেব! কি নূতন বিধান প্রকাশ করিলে, তোমার দয়ার কি এক নূতন পরিচ্ছেদ শুনাইলে? এই অমৃত বুঝি তুমি নূতন রচনা করিলে? এ সকল দেখিয়া শুনিয়া ভক্ত আর ছুটি চান না। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, যে শাস্ত্র তিনি

পাইয়াছেন ইহার আর শেষ নাই। স্বর্গে তোমার গুরুর কথা বলা ফুরায় না। সুতরাং তোমার শ্রবণ করা ও তাঁহার শুনাইবার ইচ্ছাও ফুরায় না। ভক্ত খুঁজিতেছেন এমন দাতা কোথায় যিনি দিতে ক্লান্ত হন না, যেখানে ভক্ত তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন, ভক্ত সেইখানে। তুমি আমি পৃথিবীর লোক কেবল গোল করিয়া বেড়াই। কিন্তু ঐ সুচতুর ধ্যানশীল ভক্ত বলেন, আমি যখন পৃথিবীর অতি সামান্য কার্য্য করি, তখনও আমার প্রাণনাথকে আমি নিকটে দেখি। যেখানে যাই না কেন, যে কোন কার্য্য করি না কেন, আমার প্রাণ কাড়িয়া লইয়াছেন একজন, যিনি জগতের প্রাণ চুরি করেন। তাঁহার মুখ ভিন্ন আমার আর কাহারও মুখ দেখিয়া তৃপ্তি হয় না। আমি আমার মনকে তিরস্কার করিয়া বলি, তবে মূঢ় মন! তুই সহস্রবার আজ কেন ঈশ্বরকে দেখিলি না? পাগল প্রেমোন্মত্ত ভক্ত এই কথা বলেন। কবে আমরাও উপাসনার স্থান এবং উপাসনার সময় ভুলিয়া গিয়া দেখিব, চক্ষু যে দিকে তাকায় কেবল কৌশল এবং উপলক্ষ করিয়া ব্রহ্মরূপ-সাগর দেখিয়া লয়। উপাসনা মদিরা; যত উপাসনা করিব ততই মত্ত হইব। পরীক্ষা করিয়া দেখ, সুরা পানের আসক্তি কতদূর বৃদ্ধি হইল, মত্ততা কত গাঢ়তর হইল। যদি ভক্ত হইয়া প্রভুর পাদপদ্মে মত্ত হইয়া থাক সকল সন্তাপ চলিয়া যাইবে। পাপভয় আর দেখিতে পাইবে না এবং তখন ঈশ্বরকে ছাড়া অসম্ভব হইবে। যদি একবার প্রভুর প্রেমরসে মজিয়া যাইতে পার, আর সেই প্রেমে অরুচি হইবে না। যতই এই প্রেমরস পান করিবে ততই লোভ বৃদ্ধি হইবে। এই লোভের সাগরে ব্রহ্মযোগী ডুবিয়া যাইবে। যত লোক এখানে যায়,

কেহই ফিরে না। ঈশ্বর করুন, ব্রাহ্মসমাজ যেন এইরূপ যোগীদের স্থান হয়।

হে প্রভো! বাহিরের উপাসনা ফুরাইল; কিন্তু তুমি ফুরাইলে না, আমার মনও ফুরাইল না। এখন তুমি আমি বসে আমোদ করি। এমনই অমৃতাভিষিক্ত কথাগুলি বলিয়া প্রাণ কাড়িয়া লইলে যে, তোমার কথা না শুনিলে আর কিছুই ভাল লাগে না। আগে জানিতাম না যে তুমি মলিন মানবকে একবারও উঠিতে দিবে না। তুমি ছাড়িতে চাও না তোমাকে আমি ছাড়িব, পাপটা যে আমার হইবে। বিচ্ছেদের কারণ আমি হইব। আমি মনে করিতাম উপাসনার সময় আছে, তুমি যে এমন করিয়া ষোল আনা প্রাণ কাড়িয়া লইবে তাহা ত জানিতাম না, দুই আনাও রাখিতে দিবে না। প্রেমময়, লও এই প্রাণ, তুমি প্রেমে সকল সাধককে মত্ত করিয়া ফেল। প্রাণকে একেবারে মোহিত করিয়া ফেল। তোমার শিষ্যদিগকে প্রেমবন্ধনে বাঁধিয়া ফেল; এমন মিষ্ট কথা কেবা শুনাইবে? কেবল কতকগুলি কদাকার মুখ পৃথিবী দেখায়। প্রেমসিন্ধু, তোমার মত রূপ আর কোথায় দেখিব? এমন কথা কোথায় শুনিব? তাই বলি তোমার প্রেমের মধ্যে আমাদিগকে ডুবাইয়া রাখ, আমরা খুব সুখী হইব।